রমাযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল

আবদুল হামীদ ফাইযী

Contents

salimmolla.shibpur@gmail.com

সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

ভূমিকা

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴾ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴾ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١ ﴾

আম্মা বা'দ, সহীহ দলীলকে ভিত্তি করে রমযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল প্রসঙ্গে বহু লিখা পড়ে এবং বক্তৃতা শুনে ও করে মনে মনে নিজে কিছু লিখার প্রেরণা জাগে। হক জেনে তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব প্রত্যেক মুসলিমের। সেই তাকীদেই এবং বিশেষ করে আল-মাজমাআহ দাওয়াত অফিসের বিশেষ উৎসাহে আমি এ বিষয়ে লিখতে শুরু করি আরবীতে। কথা আছে এ বই অনূদিত হবে বিভিন্ন ভাষায়। আল্লাহ যেন সেই তওফীক দেন। আমীন।

দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ আরবীর লেপ মুড়ো দিয়ে ঘুমিয়ে থাকার পর এক্ষণে তাকে জাগিয়ে বাংলার লেবাস পরাই আমার স্বভাষী বাঙালী ভাই-বোনদের জন্য। রোযার ও রমযানের মত একটি মহান উৎসাহ ও উদ্দীপনা তথা আনন্দ-মুখর মৌসমকে ঘিরে যে সকল জানা ও মানার কথা এতে পরিবেশিত হয়েছে, আশা করি তা সকল মুসলিমের জানা প্রয়োজন। হয়তো বা নতুন কথা কিছু নয়, তবে অনেক কথা জানার আছে, মানার আছে। যদিও বইটির কলেবর বৃহৎ, তবুও আমি মনে করি যে, কোন কথা পরিত্যাজ্য নয়, অপ্রাসঙ্গিক নয়। আশা করি পাঠক মাত্র অলসতা কাটিয়ে বারবার পড়ে নেবেন; বিশেষ করে রমযানের মৌসমে।

তদনুরূপ যদি মসজিদের ইমাম সাহেবগণ কোন এক নামাযের পর -বিশেষ করে রমযান মাসে- জামাআতকে পড়ে শোনান, তাহলে বড় উপকার সাধিত হবে বলে আশা করি।

যা কিছু লিখি আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টির জন্যই। তুমি এই বইটিকে কবুল করো এবং এই আমলের অসীলায় লেখক, প্রকাশক, প্রচারক ও পাঠককে আখেরাতে বেহেশ্তের বাসা দিও। আল্লাহুম্মা আমীন।

১০ই মহর্রম, আশূরা ১৪২৪ হিঃ
১৩/৩/২০০৩ খৃঃ

বিনীত ঃ
আব্দুল হামীদ ফাইযী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব

প্রথম অধ্যায়

সিয়াম শব্দের তাৎপর্য

অভিধানে صيام(সিয়াম)এর সাধারণ অর্থ হল, বিরত থাকা। আর এ জন্যই কথা বলা থেকে যে বিরত থাকে -অর্থাৎ চুপ ও নিস্তব্ধ থাকে তাকে صائم(সায়েম) বলা হয়। মহান আল্লাহ হযরত মারয়্যাম (আঃ)এর ইতিহাস উল্লেখ করে বলেন,

﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۝٢٦ ﴾

অর্থাৎ, (সন্তান ভূমিষ্ঠ করার পর) যদি তুমি কাউকে (কোন প্রশ্ন বা কৈফিয়ত করতে) দেখ, তবে তুমি বল, 'আমি দয়াময় (আল্লাহর) জন্য (কথা বলা থেকে) বিরত থাকার নযর মেনেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথাই বলব না।' *(কুঃ ১৯/২৬)* বলা বাহুল্য, এখানে 'সওম'-এর অর্থ হল কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

শরীয়তের পরিভাষায় 'সওম' বা 'সিয়াম'-এর অর্থ হল, ফজর উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী-সঙ্গম ইত্যাদি যাবতীয় রোযা নষ্টকারী কর্ম হতে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা। *(মুমঃ ৬/৩১০, তাযঃ ৯পৃঃ)*

অবশ্য এই সংজ্ঞায় অসারতা ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকাও শামিল রয়েছে। কারণ, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার নামই সিয়াম নয়; বরং অসারতা ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকার নামই হল (আসল) সিয়াম। সুতরাং যদি তোমাকে কেউ গালাগালি করে অথবা তোমার প্রতি মূর্খামি প্রদর্শন করে, তাহলে তুমি (তার প্রতিশোধ না নিয়ে) তাকে বল যে, 'আমি রোযা রেখেছি, আমি রোযা রেখেছি।" *(হাঃ, বাঃ, ইখুঃ, ইহিঃ, সজাঃ ৫৩৭৬নং)*

'রোযা' আভিধানিক অর্থে সিয়ামের সমার্থবোধক না হলেও পারিভাষিক অর্থে ফারসী, উর্দু, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় সিয়ামের জায়গায় 'রোযা' শব্দটি ব্যবহার হয় বলেই সাধারণ জনসাধারণের বুঝার সুবিধার্থে আমিও এই পুস্তিকায় রোযা শব্দই প্রয়োগ করেছি। আর এ ব্যবহারে শরীয়তগত কোন ক্ষতি নেই।

পূর্ববর্তী ধর্মমতে রোযা

মানুষের জন্য রমযানের রোযাই প্রথম রোযা নয়। কারণ, রোযা হল এমন ইবাদত, যা আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টির পর থেকেই নিজের বান্দার জন্য ফরয করেছেন। তিনি কুরআন মাজীদে বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝١٨٣ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার। *(কুঃ ২/১৮৩)*

এ থেকে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী সকল উম্মতের জন্য রোযা ফরয ছিল। অবশ্য ইসলাম, খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদী ধর্মের পূর্বের ধর্মাবলম্বী মানুষরা কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে রোযা পালন

করত, তা নির্দিষ্টরূপে জানা যায় না। তবে ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানরা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জিনিস থেকে বিরত থেকে রোযা পালন করত। তাওরাত ও ইঞ্জীলের বর্তমান সংস্কারগুলো থেকেও জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা রোযাকে তাঁর পূর্ববর্তী বান্দাদের উপর ফরয করেছিলেন।

বুখারী-মুসলিমের একটি হাদীসে পাওয়া যায় যে, মহানবী ﷺ যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন দেখলেন, ইয়াহুদীরা আশূরার দিনে রোযা পালন করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এটা কি এমন দিন যে, তোমরা এ দিনে রোযা রাখছ?” ইয়াহুদীরা বলল, ‘এ এক মহান দিন। এ দিনে আল্লাহ মূসা ও তাঁর কওমকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন এবং ফিরআউন ও তার কওমকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছিলেন। তাই মূসা এরই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই দিনে রোযা পালন করেছিলেন। আর সেই জন্যই আমরাও এ দিনে রোযা রেখে থাকি।’

এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, “মূসার স্মৃতি পালন করার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে আমরা অধিক হকদার।” সুতরাং তিনি ঐ দিনে রোযা রাখলেন এবং সকলকে রোযা রাখতে আদেশ দিলেন। *(বুঃ ২০০৪, মুঃ ১১৩০নং)*

অবশ্য আহলে কিতাব (ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান) ও মুসলিমদের রোযার মাঝে একটি পার্থক্য এই যে, আহলে কিতাবরা সেহরী ([1]) খায় না। কিন্তু মুসলিমরা খায়। *(মুঃ ১০৯৬নং)*

তদনুরূপ আহলে কিতাবরা ইফতার করতে দেরী করে। পক্ষান্তরে মুসলিমরা সূর্য ডোবামাত্র তড়িঘড়ি ইফতার করে থাকে। *(আদাঃ, হাঃ, ইহিঃ, সজাঃ ৭৬৮-৯নং)*

ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকাতে বলা হয়েছে যে, জল, বায়ু, জাতি, ধর্ম ও পারিপার্শ্বিকতা ভেদে রোজার নিয়ম-পদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও এমন কোন ধর্মের নাম উল্লেখ করা কঠিন যাহার ধর্মীয় বিধানে রোযার আবশ্যকতা স্বীকার করা হয় নাই। *(বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া লাইব্রেরী ছাপা ৪/২৬৪ দ্রঃ)*

যাই হোক না কেন, এই খবরের মাঝে মুসলিমদের জন্য রয়েছে সান্ত্বনা ও আশ্বাস। কারণ, শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীর উপরেই নয়; বরং পূর্ববর্তী সকল উম্মতের উপরেই রোযা ফরয ছিল। আর সে মনে করেই মুসলিমদের উপরেও রোযার ভার অনেক হাল্কা হয়ে যায়। কারণ, মুসলিম যখন জানতে পারে যে, এই রোযা রাখার পথ হল পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও তাঁদের অনুগামী নেক লোকদের, তখন সে এই পথ অবলম্বন করে আনন্দবোধ করে এবং রোযার কোন কষ্টকেই সে নিজের জন্য ভারী মনে করে না। *(দুরাঃ ৫পৃঃ)*

([1]) সেহরী কথাটি সাহারীর অপভ্রংশ। এটি [illegible]। সেহরী শব্দটি উর্দু অভিধানে পাওয়া যায়, কিন্তু সাহারী শব্দটি কোন অভিধানে পাওয়া যায় না।

ইসলামী শরীয়তে রোযা ও তার পর্যায়ক্রম

মহাবিজ্ঞান ও হিকমতময় মহান আল্লাহর একটি হিকমত ও অনুগ্রহ এই যে, তিনি বান্দার উপর যে আদেশ-নিষেধ আরোপ করেছেন তার মধ্যে বহু বিষয়কেই পর্যায় অনুক্রমে ধীরে ধীরে ফরয অথবা হারাম করেছেন। অনুরূপ তাঁর এক ফরয হল সিয়াম বা রোযা। যা তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর পর্যায়ক্রমে কিছু কিছু করে ফরয করেছেন। যেমন ঃ-

❖ **প্রথম পর্যায় ঃ-**

প্রিয় নবী ﷺ প্রত্যেক মাসে ৩টি করে রোযা পালন করতেন। আর এ দেখে সাহাবাগণও ﷺ তাঁর অনুসরণে ঐ রোযা রাখতেন। যাতে করে রোযার অভ্যাস তাদের জন্য সহজ হয়ে ওঠে।

❖ **দ্বিতীয় পর্যায় ঃ-**

কুরাইশদল জাহেলী যুগে আশূরার রোযা রাখত। *(বুঃ ১৮৯৩, মুঃ ১১২৫)* অতঃপর তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলে হযরত মূসা ﷺ-এর অনুকরণে তাঁর স্মৃতি পালন করে আশূরার দিনে খুব গুরুত্বের সাথে রোযা রাখলেন এবং সাহাবাদেরকেও এ রোযা রাখতে আদেশ করলেন। তখন এ রোযা রাখা ফরয ছিল।

❖ **তৃতীয় পর্যায় ঃ-**

অতঃপর রোযার বিধান নিয়ে কুরআন কারীমের উপর্যুক্ত আয়াত অবতীর্ণ হল। কিন্তু শুরুতে তখনও রোযা পূর্ণ আকারে ফরয ছিল না। যার ইচ্ছা সে রোযা রাখত এবং যার ইচ্ছা সে না রেখে মিসকীনকে খাদ্য দান করত। তবে রোযা রাখাটাই আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্দেশ ছিল ঃ-

﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٤ ﴾

অর্থাৎ, যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তাহলে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণপ্রসূ; যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পার। *(কুঃ ২/১৮৪)*

❖ **চতুর্থ পর্যায় ঃ-**

অতঃপর সন ২ হিজরীর শা'বান মাসের ২য় তারীখ সোমবারে([2]) প্রত্যেক সামর্থ্যবান ভারপ্রাপ্ত মুসলিমের পক্ষে পূর্ণ রমযান ([3]) মাসের রোযা ফরয করা হল। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن

---

(2) ফিসুঃ ১/৩৮৩ দ্রঃ

(X) রমযান কথাটি আরবী 'রামাযান'-এর অপভ্রংশ ও বাংলায় চলিত রূপ।

شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ ﴾

অর্থাৎ, রমযান মাস; যে মাসে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে। *(কুঃ ২/১৮৫)*

সুতরাং সামর্থ্যবান ভারপ্রাপ্ত (জ্ঞানসম্পন্ন সাবালক) গৃহবাসীর জন্য মিসকীনকে খাদ্যদানের বিধান রহিত হয়ে গেল এবং বৃদ্ধ ও চিররোগীর জন্য তা বহাল রাখা হল। অনুরূপ (কিছু উলামার মতে) এ বিধান গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলার জন্যও বহাল করা হল; যারা গর্ভকালে বা দুগ্ধদান কালে রোযা রাখলে তার সন্তানের বিশেষ ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা করে।

মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত এই ছিল যে, রোযার বহু কষ্টভার তিনি লাঘব করে দিয়েছেন। যেমন; শুরুর দিকে এ রোযা ফরয ছিল এশার নামায বা রাত্রে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর থেকে পর দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অর্থাৎ, রাত্রে একবার ঘুমিয়ে পড়লে পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস হারাম হয়ে যেত। এতে মুসলিমরা বড় কষ্টবোধ করতে লাগলেন। সময় লম্বা থাকার কারণে তাঁরা বড় দুর্বল হয়ে পড়তেন। অতঃপর মহান আল্লাহর তরফ থেকে সে ভার হাল্কা করা হল। পরিশেষে ফজর উদয়কাল থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত কাল পর্যন্ত হল রোযা রাখার সময়।

আনসার গোত্রের সিরমাহ নামক এক ব্যক্তি রোযা রাখা অবস্থায় সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতেন। একদিন তিনি বাড়ি ফিরে এসে এশার নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কোন প্রকার পানাহার না করেই তাঁর ফজর হয়ে গেল। সুতরাং এ অবস্থাতেই পরদিন রোযা রাখলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে সেই কঠিন দুর্বল ও ক্লিষ্ট অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার! আমি তোমাকে বড় দুর্বল দেখছি যে?" তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি গতকাল কাজ করার পর যখন এলাম তখন এলাম। তারপর (পরিশ্রান্ত হয়ে) শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে গেলাম। তারপর ফজর হয়ে গেলে আবার রোযা রেখে নিলাম।' *(বুঃ ১৯১৫, সআদাঃ ২০২৯নং)*

হযরত উমার ﷺ এক রাত্রে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর উঠে স্ত্রী-মিলন করে ফেললেন। তিনি মহানবী ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনা উল্লেখ করলেন। অতঃপর এই সবের পরিপ্রেক্ষীতে আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ হল,

﴿ أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ ﴾

অর্থাৎ, রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা আত্ম-প্রতারণা করছ। তাই তো তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা (সন্তান, শবেকদর, সকল বৈধ বস্তু বা আল্লাহর তরফ থেকে কোন কিছুর ব্যাপারে অব্যাহতি) লিখে রেখেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর; যতক্ষণ রাত্রির কালো রেখা হতে ফজরের সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ না পায়। অতঃপর

রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। *(কুঃ ২/১৮৭) (সআদাঃ ২০২৮নং, তইকাঃ ১/২৯১, আসাইঃ ২৩-২৫পৃঃ দ্রঃ)*

সাধারণভাবে রোযার ফযীলত

সাধারণভাবে রোযার ফযীলত বর্ণনা করে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কতিপয় সহীহ হাদীস প্রণিধানযোগ্য ঃ-

১। হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, ‘আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য; তবে রোযা নয়, যেহেতু তা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।’ রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের কারো রোযার দিন হলে সে যেন অশ্লীল না বকে ও ঝগড়া-হৈচৈ না করে; পরন্তু যদি তাকে কেউ গালাগালি করে অথবা তার সহিত লড়তে চায়, তবে সে যেন বলে, ‘আমি রোযা রেখেছি, আমার রোযা আছে।’ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ আছে! নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুবাস অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধময়। রোযাদারের জন্য রয়েছে দু’টি খুশী, যা সে লাভ করে; যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারী নিয়ে খুশী হয়। আর যখন সে তার প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎ করবে তখন তার রোযা নিয়ে খুশী হবে। *(বুখারী ১৯০৪, মুসলিম ১১৫১ নং)*

২। হযরত হুযাইফা ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, “মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে ঘটিত বিভিন্ন ফিতনা ও গোনাহর কাফ্ফারা হল নামায, রোযা ও সদকাহ।” *(বুঃ ১৮৯৫, মুঃ ১৪৪নং)*

৩। হযরত সাহ্ল বিন সা’দ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, জান্নাতের এক প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার নাম ‘রাইয়ান।’ কিয়ামতের দিন ঐ দ্বার দিয়ে রোযাদারগণ প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া তাদের সাথে আর কেউই ঐ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে না। বলা হবে, ‘কোথায় রোযাদারগণ?’ সুতরাং তারা ঐ দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। অতঃপর যখন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তখন সে দ্বার রুদ্ধ করা হবে। ফলে সে দ্বার দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করতে পারবে না।” *(বুঃ ১৮৯৬ নং, মুঃ ১১৫২ নং, নাঃ, তিঃ)*

৪। হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “--- আর যে ব্যক্তি রোযা রাখায় অভ্যাসী হবে, তাকে (কিয়ামতের দিন) ‘রাইয়ান’ দুয়ার হতে (জান্নাতের দিকে) আহবান করা হবে। ---” *(বুঃ ১৮৯৭, মুঃ ১০২৭নং)*

৫। হযরত আবু সাঈদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, ‘যে বান্দা আল্লাহর রাস্তায় একদিন মাত্র রোযা রাখবে সেই বান্দাকে আল্লাহ ঐ রোযার বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের পথ পরিমাণ দূরত্বে রাখবেন।” *(বুখারী ২৮৪০ নং, মুসলিম ১১৫৩ নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

৬। হযরত আম্র বিন আবাসাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন মাত্র রোযা রাখবে সেই ব্যক্তি থেকে জাহান্নাম

১০০ বছরের পথ পরিমাণ দূরে সরে যাবে।” *(নাঃ, সজাঃ ৬৩৩০নং উকবাহ হতে,ত্বাঃ কাবীর ও আওসাত্ব, সতাঃ৯৭৫ নং)*

৭। হযরত আবু উমামাহ ﵁ হতে বর্ণিত, মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি রোযা রাখবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তি ও দোযখের মাঝে একটি এমন প্রতিরক্ষার খাদ তৈরী করে দেবেন; যা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী জায়গা সমপরিমাণ চওড়া।” *(তিঃ, সজাঃ ৬৩৩৩নং)*

৮। হযরত উসমান বিন আবূল আস কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী ﷺ বলেন, “রোযা হল দোযখ থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ; যেমন যুদ্ধের সময় নিজেকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের ঢাল হয়ে থাকে।” *(আঃ, নাঃ, ইমাঃ, সজাঃ ৩৮৭৯নং)*

৯। হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “রোযা হল জাহান্নাম থেকে রক্ষার জন্য ঢাল ও দুর্ভেদ্য দুর্গস্বরূপ।” *(আঃ, বাঃ শুআবুল ঈমান, সজাঃ ৩৮৮০নং)*

১০। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কিয়ামতের দিন রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি ওকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।’ আর কুরআন বলবে, ‘আমি ওকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।’ নবী ﷺ বলেন, “অতএব ওদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।” *(আঃ, ত্বাবাঃ কাবীর, হাঃ, ইবনে আবিদ্দুনয়্যার ‘কিতাবুল জু’, সতাঃ ৯৬৯ নং)*

১১। হযরত আবু উমামাহ ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কোন আমলের আজ্ঞা করুন; যদ্দ্বারা আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন।’ (অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘যার মাধ্যমে আমি জান্নাত যেতে পারব।’) তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কারণ এর সমতুল কিছু নেই।’ পুনরায় আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কোন আমলের আদেশ করুন।’ তিনিও পুনঃ ঐ কথাই বললেন, “তুমি রোযা রাখ, কারণ এর সমতুল কিছু নেই।’ *(নাঃ, ইখুঃ, হাঃ, সতাঃ ৯৭৩ নং)*

১২। হযরত হুযাইফা ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার বুকে হেলান দিয়ে ছিলেন। সেই সময় তিনি বললেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে একদিন রোযা রাখার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশায় কিছু সাদকাহ করার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সেও জান্নাত প্রবেশ করবে।” *(আঃ, সতাঃ ৯৭২ নং)*

রোযার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, উপকারিতা ও যৌক্তিকতা

মহান আল্লাহর ৯৯ এর অধিক সুন্দর নামাবলীর অন্যতম নাম হল 'আল-হাকীম।' 'আল-হাকীম' অর্থ হিকমত-ওয়ালা, বিজ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়। আর হিকমত ও প্রজ্ঞা হল সর্বকর্ম যথাযোগ্যভাবে নৈপুণ্যের সাথে সম্পাদন করা। মহান আল্লাহর এই নামের দাবী এই যে, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন অথবা মানুষের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তার প্রত্যেকটার পশ্চাতে আছে পরিপূর্ণ যুক্তি ও হিকমত; তা কেউ বুঝতে সক্ষম হোক অথবা অক্ষম।

যে রোযা আল্লাহ তাআলা বান্দার উপর ফরয ও বিধিবদ্ধ করেছেন তার মাঝে রয়েছে অভাবনীয় যৌক্তিকতা ও অচিন্তনীয় উপকারিতা। যেমন ঃ-

১। রোযা হল এক এমন ইবাদত, যার মাধ্যমে বান্দা প্রভুর নৈকট্যলাভ করতে সক্ষম হয়। এতে সে প্রকৃতিগতভাবে যে জিনিস ভালোবাসে তা বর্জন করে; বর্জন করে সকল প্রকার পানাহার ও যৌনক্রিয়া। আর এর মাধ্যমে সে নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনা করে। আশা করে পরকালের সাফল্য ও বেহেশ্তলাভ। এতে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, সে নিজের প্রিয় বস্তুর উপর প্রভুর প্রিয় বস্তুকে প্রাধান্য দেয় এবং ইহকালের জীবনের উপর পরকালের জীবনকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেয়।

২। রোযাদার যথানিয়মে রোযা পালন করলে রোযা তাকে মুত্তাকী ও পরহেযগার বানাতে সহায়ক হয়। তার জীবন পথে তাকওয়া ও পরহেযগারীর আলো বিচ্ছুরিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।" *(কুঃ ২/১৮৩)*

সুতরাং রোযাদার রোযা রেখে তার জীবনের প্রত্যেক চিন্তা, কথা ও কর্মে 'তাকওয়া' আনবে -এটাই বাঞ্ছিত। আর 'তাকওয়া' হল সেই আল্লাহ-ভীতির নাম, যার মাধ্যমে বান্দা তাঁর সকল আদেশ যথাসাধ্য পালন করে চলবে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কর্ম থেকে সুদূরে থাকবে। বলা বাহুল্য, এটাই হল রোযার মহান উদ্দেশ্য ও প্রধান লক্ষ্য। পানাহার ও যৌনক্রিয়া নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে মানুষকে বৃথা কষ্ট দেওয়া রোযার উদ্দেশ্য নয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা ও তার উপর আমল ত্যাগ করতে পারল না, সে ব্যক্তির পানাহার ত্যাগ করার মাঝে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" *(বুঃ ৬০৫৭, ইমাঃ ১৬৮৯, আঃ ২/৪৫২, ৫০৫, ফুসিতাযাঃ ৬-৭পৃঃ)*

৩। রোযা আত্মাকে তরবিয়ত দান করে, চরিত্রকে সভ্য ও আদর্শভিত্তিক করে গড়ে তোলে এবং রোযাদারের আচরণে উৎকৃষ্টতার স্থায়ীত্ব আনয়ন করে। মুসলিমের স্বভাব-প্রকৃতিতে রোযা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। রোযার সংশোধনী বার্তা তার হৃদয়-মনে তাসীর রেখে যায়। রোযাদারের অন্তরে এমন জাগরণ সৃষ্টি করে এবং তার মনের দুয়ারে এমন অতন্দ্র প্রহরী খাড়া করে দেয় যে, সে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয় এবং এই প্রহরীর

চোখে ফাঁকি দিয়ে কোনও নৈতিকতা-বিরোধী কর্ম করতে ইচ্ছা ও চেষ্টাও করতে পারে না।

এটা কি করে হতে পারে যে, রোযাদার তার প্রতিপালকের নিকট সত্যবাদিতার পরিচয় দেবে, অথচ মানুষের সঙ্গে মিথ্যা বলবে? নিজের রোযায় আন্তরিকতা রাখবে, অথচ নিজ সমাজের সঙ্গে ধোকাবাজী ও কপটতা প্রদর্শন করবে? ইখলাস ও আন্তরিকতা একটি সামগ্রিক বস্তু; যা ভাগাভাগি হয় না। যার সর্বোচ্চ পর্যায় ও সারাংশ হল সৃষ্টিকর্তা অন্তর্যামী আল্লাহর সাথে আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধচিত্ততা। সুতরাং যে ব্যক্তির আল্লাহর সাথে আন্তরিকতা থাকবে, সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে অসম্ভব যে, সে মানুষকে ধোকা দেবে, আমানতে খেয়ানত করবে, অপরকে ঠকিয়ে খাবে, চুরি করবে, যুলম করবে অথবা অপরকে কষ্ট দেবে। পক্ষান্তরে যদি কারো চক্রান্তে পড়ে বা ভুলক্রমে এ ধরনের কোন পাপ করেই বসে, তাহলে সাথে সাথে সে সুপথে ফিরে আসে, আল্লাহর নিকট তওবা করে, অনুতপ্ত হয়, লজ্জিত হয় সীমাহীন।

সুতরাং রোযা হল একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুচরিত্র গঠনের উপকরণ এবং তা সমৃদ্ধকরণের জন্য আভ্যন্তরীণ এক মৌলিক উপাদান। আর বিদিত যে, বাহ্যিক সৌন্দর্যের বাহার কোন মূল্য রাখে না; যদি না অভ্যন্তর সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। তাই রোযাদারের জীবনে তার আখলাক-চরিত্র স্থায়ীত্ব, স্থিতিশীলতা, বর্ধনশীলতা ও শ্রীবৃদ্ধিশীলতার গুণাবলী গ্রহণ করে থাকে। কারণ, তার সকল আচরণ ভিতর ও বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত হয়ে যায়। *(ফাইযঃ ২২৪পৃঃ)*

৪। রোযা রোযাদারের আচার-ব্যবহারকে সুন্দর করার কাজে বড় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। পূর্ণ একটি মাস ধরে তাকে পাপ থেকে দূরে রাখে, নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তু থেকে নিরাপদে রাখে। বরং রোযা তাকে এক মহান ইবাদতে মশ্‌গুল রাখে, হীনতা ও নীচতা হতে রক্ষা করে, প্রত্যেক নোংরামীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সুতরাং সে না চুগলী করে, না গীবত। না মিথ্যা বলে, না অশ্লীল। না ফিতনা সৃষ্টি করে, না ফাসাদ। না অসার বকে, না ফালতু। কোন প্রকারের পাপাচরণ তার দ্বারা সংঘটিত হয় না। ফলে প্রকৃত রোযাদার রোযার পরেও একটি নিষ্পাপ ও পবিত্র মানুষের মত যাবতীয় সচ্চরিত্রতার অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে সুখময় জীবন-যাপন করতে পারে। *(সারাঃ ৪০পৃঃ)*

৫। রোযা মন ও প্রবৃত্তিকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করার অনুশীলন দেয়। জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী হতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে রোযাদার তার মন ও প্রবৃত্তিকে সেই কাজে ব্যবহার করতে পারে; যাতে ইহ-পারলৌকিক সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত আছে। আর এমন আচরণ ও কর্ম থেকে তাকে দূরে রাখে; যাতে সে একটি ইন্দ্রিয়সেবী ও পাশবিক গুণসম্পন্ন মানুষ বলে পরিচিত হতে পারে; যেখানে সে কামনা-বাসনা ও লালসার প্রবণতা থেকে তাকে রুখতে সক্ষম হয় না।

সুতরাং রোযা সেই মন্দপ্রবণ আত্মার বিরুদ্ধে লড়ায়ে বিজয়ী হতে মুসলিমকে সার্বিক সহযোগিতা করে, যে আত্মা সর্বদা হারাম কাজে লিপ্ত হতে চায়, অবৈধভাবে কাম-লালসা চরিতার্থ করতে চায়। রোযা রোযাদারের ইচ্ছাশক্তিকে সর্বপ্রকার পাপ ও কুপ্রবৃত্তির স্পর্শ থেকে দূরে থাকার 'ট্রেনিং' দেয়। রোযার মাঝে রয়েছে আত্মসংযম এবং কুপ্রবৃত্তির দমন।

আধুনিক যুগের মানুষ অধিকাংশে নিজ কামনা-বাসনার কাছে বড় দুর্বল, কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ-

প্রবণ খেয়ালখুশীর বশীভূত। আর মনকে সবল ও সুদৃঢ় করতে রোযা ছাড়া আর অন্য কোন উপায়-উপকরণ নেই। কারণ, রোযাদার অত্যন্ত ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর থাকা সত্ত্বেও পানাহার বর্জন করে থাকে। আর নিঃসন্দেহে এ কাজে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা সৃষ্টি হয় এবং সর্বকাজে মনোবল প্রবল ও সুদৃঢ় হয়।

৬। রোযা রোযাদারকে কুঅভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্তিদান করে। এমন বহু মানুষ আছে, যারা এমন বহু নোংরা অভ্যাসে অভ্যাসী হয়ে পড়ে এবং তার ফাঁদ থেকে বের হওয়ার কোন পথ খুঁজে পায় না। কিন্তু রোযা এলে তাদেরকে দেখা যায় যে, তারা তাদের সে সমস্ত কুঅভ্যাসকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করে ফেলেছে।

বলা বাহুল্য, এটাই হয় তাদের জন্য সুবর্ণ-সুযোগ; যার মাঝে তাদের সেই সকল মন্দ অভ্যাসের পঞ্জা থেকে নিজেদেরকে সহজ উপায়ে স্বাধীন করে নিতে পারে, যে সকল অভ্যাস তাদের মানসিক দুশ্চিন্তা ও ব্যাধির একমাত্র কারণ। *(সারাঃ ৪০পৃঃ)*

অতএব সেই সকল রোযাদারগণ যারা ধুমপানে অভ্যাসী; যাদের অবৈধ বিড়ি-সিগারেট বিনা ৩০ মিনিটও অতিবাহত হয় না, অথবা তা পান না পর্যন্ত পায়খানাও হয় না, যাদের দৈনিক ১ প্যাকেট সিগারেট পানে তাদের ৫০ বছর জীবনে প্রায় ১ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা এবং ১৫২০৮ ঘন্টা ২০ মিনিট সময় অপচয় হয়, তাদের উচিত, রোযার এই পবিত্র অবসরে এই শ্রেণীর 'বিষপান' চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করা। কারণ, এ 'সুখটান' এমন 'অগ্নিবাণ' যে, তা মানুষের সুস্বাস্থ্য, দেহ, অর্থ, দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য বড় ক্ষতিকর। যে মানুষ ১২/ ১৩ ঘন্টা আল্লাহর ওয়াস্তে তা বর্জন করে থাকতে পারে, সে মানুষ আল্লাহরই ভয়ে বাকী সময় পান না করলেও থাকতে পারবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কোন জিনিস বর্জন করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছায় তার চাইতে উত্তম জিনিস অর্জন করবে। এটাই হল আল্লাহর রীতি। পরন্তু এ কোনক্রমেই উচিত নয় যে, রোযাদার সারাদিন হালাল জিনিস না খেয়ে রোযা রেখে পরিশেষে হারাম জিনিস দিয়ে রোযা খুলবে! *(ইতহাফ ৪২পৃঃ)*

৭। রোযার মাঝে রয়েছে আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান রাখার সবিশেষ প্রশিক্ষণ। কারণ, রোযা হল গুপ্ত ইবাদত। যেহেতু মানুষ এ ইবাদতে মুনাফেকী রাখতে পারে না। ইচ্ছা করলে সে গোপনে খেতে বা পান করতে পারে, অথবা উপবাস থেকেও নিয়ত ভেঙ্গে ফেলতে পারে। সুতরাং নিছক আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান ও সত্য ভয় না থাকলে প্রকৃতরূপে রোযা রাখা যায় না।

বলা বাহুল্য, রোযা হল এমন একটি আন্তরিক ইবাদত, যা বান্দা ও প্রভুর মাঝে একান্ত গুপ্ত। অতএব গোপনে পানাহার করার সামর্থ্য ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করা এই কথাই প্রমাণ করে যে, সে বান্দা নিঃসন্দেহে এই বলে অটল বিশ্বাস রাখে যে, মহান আল্লাহ তার গোপন সব কিছুই দেখেন ও জানেন। আর এখান থেকেই রোযাদারের মনে ইবাদতে সততা ও আমানতদারী সৃষ্টি হয়। তাইতো আল্লাহ তাআলা রোযাকে পৃথক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন; বান্দার প্রত্যেক আমলের সওয়াবকে ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ; বরং আরো অনেক অনেক গুণ বর্ধিত করে থাকেন। কিন্তু রোযা নয়। রোযাকে তিনি নিজের জন্য খাস করে নিয়েছেন। আর তার সওয়াবের পরিমাণ যে কত, তা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের

জন্য; তাতে তার সওয়াব ১০ থেকে ৭০০ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রোযা নয়। রোযা হল আমার জন্য। আর আমি নিজে তার প্রতিদান দেব।” *(আঃ ২/৫০৩)*

৮। রোযা রোযাদারের মনে পরকালের প্রতি আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করে। কারণ, সে আল্লাহর নিকট আখেরাতে যে সওয়াব ও প্রতিদান আছে তা পাওয়ার আশায় আগ্রহান্বিত হয়ে পার্থিব কিছু সুখ-উপভোগ থেকে বিরত থাকে। সে যে নিক্তিতে লাভ-নোকসান ওজন করে থাকে তা হল পারলৌকিক। রোযার দিনে পানাহার ও যৌনসুখ শুধু এই আশায় পরিহার করে যে, এতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার সাথে সাথে কিয়ামতের দিন উত্তম প্রতিদান পাবে। সুতরাং এইভাবে রোযা রোযাদারের মনে পরকালের প্রতি ঈমান বদ্ধমূল করে, পরলোকের সাথে অন্তরকে জুড়ে রাখে এবং ক্ষণস্থায়ী এই ধরাধামের পার্থিব ভোগ-বিলাসে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে; যে ভোগ-বিলাস অনেক সময় মানুষকে আখেরাতের কথা বিস্মৃত করে এই ধারণা দেয় যে, সে পৃথিবীতে অমর ও চিরকাল থাকবে। *(দুরাঃ ১০পৃঃ)*

৯। রোযা পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ এবং তাঁর পূর্ণ দাসত্ব করার কথা শিক্ষা দেয়। রোযা মুসলিমকে প্রকৃত দাসত্বের অনুশীলন দেয়। তাই তো সে রাতের বেলায় খায়, পান করে। কারণ, তার প্রভু যে বলেছেন,

﴿ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ﴾

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। *(কুঃ ২/১৮৭)*

বলা বাহুল্য, এ জন্যই ইফতার ও সেহরীর সময় খাওয়া হল সুন্নত ও মুস্তাহাব এবং না খেয়ে একটানা পরপর কয়েকদিন রোযা রাখা মকরূহ। অতএব রোযা রাখার জন্য সেহরী খাওয়া এবং রোযার শেষে ইফতারী খাওয়া হল এক প্রকার আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নির্দেশের আনুগত্য।

তদনুরূপ ফজর উদয় হলে মুসলিম পানাহার সহ সেই সকল বস্তু ও বিষয় থেকে দূরে থাকে, যাতে রোযা নষ্ট করে ফেলে। আর এর মাঝেও সে একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব ও আনুগত্য করে। কারণ, তিনি বলেন,

﴿ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। *(কুঃ ২/১৮৭)* সুতরাং এইভাবে মুসলিম মহান আল্লাহর পূর্ণ দাসত্ব ও আনুগত্যের উপর দীর্ঘ প্রশিক্ষণ লাভ করে থাকে। *(দুরাঃ ১০পৃঃ)*

১০। রোযা মুসলিমের জন্য আল্লাহর এক প্রকার রহমত, করুণা ও অনুগ্রহ। মহান আল্লাহ মুসলিম জাতির প্রতি অনুগ্রহ ও করুণা প্রদর্শন করেই রোযা ফরয করেছেন। কারণ, এরই মাধ্যমে তিনি মুসলিমের পাপরাশি মার্জনা করে থাকেন, তার মর্যাদা উন্নীত করে থাকেন এবং বহুগুণ হারে তার সওয়াব বৃদ্ধি করে থাকেন। *(ইতহাফ ৪১পৃঃ)*

১১। রোযা হল গোনাহের কাফ্ফারা। কারণ, নেকীর কাজ গোনাহর কাজের গোনাহ নাশ করে দেয়। আর রোযা হল বড় নেকীর কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় পুণ্যরাশি (সওয়াবের কাজ) পাপরাশিকে দূরীভূত করে। *(কুঃ ১১/১১৪)*

আর প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশী সংক্রান্ত পাপরাশিকে নামায, রোযা এবং সদকাহ মোচন করে দেয়।" *(বুঃ ১৭৯৬, মুঃ ১৪৪নং)* অর্থাৎ, মুসলিম যে গোনাহ তার পরিবারকে অন্যায়ভাবে উচ্চবাচ্য করে, কষ্ট দিয়ে অথবা কোন বিষয়ে তাদের প্রতি ত্রুটি ও অবহেলা প্রদর্শন করে, অথবা প্রতিবেশীকে কোন কথায় বা কাজে কোন প্রকার কষ্ট দিয়ে, অথবা আর্থিক কোন প্রকার ত্রুটি ঘটিয়ে অথবা অনুরূপ অন্যান্য সাগীরা (ছোট) গোনাহ করে থাকে, সে সবকে তার নামায, রোযা এবং দান-খয়রাত মোচন করে দেয়।

পরন্তু প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশা রেখে রমযানের রোযা রাখে, তার পূর্বেকার সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়।" *(বুঃ ৩৮, মুঃ ৭৬০নং)*

হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কাবীরাহ গোনাহ না করলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআহ থেকে অপর জুমআহ এবং এক রমযান থেকে অন্য রমযান -এর মধ্যবর্তীকালে সংঘটিত পাপসমূহের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)।" *(আঃ, মুঃ ২৩৩নং, তিঃ)*

তদনুরূপ রোযা হল কসম ভাঙ্গার কাফ্ফারা (জরিমানা)। *(কুঃ ৫/৮৯)* যিহারের কাফ্ফারা। *(কুঃ ৫৮/৪)* কোন মুসলিমকে বা চুক্তিবদ্ধ কোন যিম্মীকে ভুলবশতঃ হত্যা করে ফেলার কাফ্ফারা। *(কুঃ ৪/৯২)* ইহরামে নিষিদ্ধ কর্ম করে ফেলার কাফ্ফারা। *(কুঃ ২/১৯৬, ৫/৫)* তামাত্তু' হজ্জের কুরবানী দিতে না পারলে তার কাফ্ফারা। *(কুঃ ২/১৯৬)* ইত্যাদি।

১২। রোযা রোযাদারের মনে ধৈর্য ও সহনশীলতা সৃষ্টি করে। কষ্টে ধৈর্য ধারণ ও সহনশীলতা অবলম্বন করতে অভ্যাসী বানায়। রোযা তাকে তার প্রিয় বস্তু ব্যবহার বর্জন করতে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। যেমন শিক্ষা দেয় কাম-দমন ও মনের যথেচ্ছাচার দমন করার; যা নিশ্চয় সহজ কাজ নয়।

বলা বাহুল্য, রোযা পালনে রয়েছে ৩ প্রকার ধৈর্য। মহান আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য, তাঁর হারামকৃত বস্তু পরিহার করার উপর ধৈর্য এবং তাঁর নির্ধারিত তকদীরের বালা-মসীবতের উপর ধৈর্য। এই ৩ প্রকার ধৈর্য যে বান্দার মাঝে একত্রিত হবে, সেই হবে ইহকালে পরম সুখী এবং পরকালে আল্লাহর ইচ্ছায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجۡرَهُم بِغَيۡرِ حِسَابٍ ۝١٠ ﴾

অর্থাৎ, ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার ও সওয়াব দান করা হবে। *(কুঃ ৩৯/১০)*

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ক্ষুৎ-পিপাসা ও যৌনক্ষুধায় ধৈর্যধারণ করাই হল ধৈর্যের শেষ পর্যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি এই শ্রেণীর ধৈর্য ধারণ করতে পারঙ্গম হবে, সে ব্যক্তির জন্য অন্য শ্রেণীর ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করবে, সে ব্যক্তি লাভ করবে শুভপরিণাম।

মহান আল্লাহ বলেন, "যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য ধৈর্যকষ্ট বরণ করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে, আমি যে রুযী তাদেরকে দান করেছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে

Contents

দান করে এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দকে দূর করে -তাদেরই জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম; (আদ্‌ন) স্থায়ী বেহেশ্ত, ওতে ওরা প্রবেশ করবে---।” *(কুঃ ১৩/২২-২৩)*

১৩। রোযা হল ঢালস্বরূপ; দোযখ থেকে রক্ষার ঢালস্বরূপ। *(ত্বাবঃ, সজাঃ ৩৮৬৭নং)* একটি মাত্র রোযা জাহান্নামকে রোযাদার থেকে ৭০ বছরের পথ দূরে সরিয়ে দেয়। *(বুঃ ২৬৮৫, মুঃ ১১৫৩নং)* সুতরাং যে ব্যক্তি পূর্ণ রমযান মাসের রোযা রাখে এবং প্রত্যেক মাসে ৩টি রোযা অথবা আরো অন্যান্য নফল রোযা রাখে, সে ব্যক্তি থেকে দোযখ কত বছরের পথ দূরে সরে যায় তা অনুমেয়।

১৪। রোযা হল চরিত্রহীনতা ও ব্যভিচার ইত্যাদি অশ্লীলতা থেকে ঢালস্বরূপ। রোযা রোযাদারকে অবৈধ যৌনাচার থেকে হিফাযতে রাখে, যেমন ঢাল মুজাহিদ (যোদ্ধা)কে শত্রুপক্ষের তীর ও তরবারির আঘাত থেকে রক্ষা করে থাকে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (বিবাহের অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রতিক্রিয়ার) সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ চক্ষুকে দস্তুরমত সংযত করে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যে ব্যক্তি ঐ সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। কারণ, তা যৌনক্ষুধা উপশমকারী।” *(বুঃ ৪৭৭৯, মুঃ ১৪০০, মিঃ ৩০৮০নং)*

বলা বাহুল্য, যে যুবক বিবাহের খরচাদি বহন করতে সক্ষম নয়, সে যুবককে মহানবী এই নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন তার কামক্ষুধা ও যৌন-উত্তেজনা প্রশমিত করতে রোযার সাহায্য নেয়। কারণ, রোযা উক্ত ক্ষুধা ও উত্তেজনা দমন ও নিবারণ করে। আর অনেকের অভিজ্ঞতা দ্বারা উক্ত নববী চিকিৎসা প্রমাণিত ও পরীক্ষিত যে, কামপীড়িত যুবকের জন্য যে কোনও সেব্য ঔষধ অপেক্ষা রোযাই হল উত্তম ও অব্যর্থ ঔষধ।

১৫। রোযা হল বেহেশ্তগামী পথ। হযরত আবূ উমামাহ ﷺ জান্নাতে প্রবেশ করাবে এমন আমল প্রসঙ্গে যখন আল্লাহর নবী ﷺ-এর নিকট নির্দেশ চাইলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, “তুমি রোযা রাখ। কারণ, তার মত অন্য কোন আমল নেই।” *(নাঃ ২২২১নং)* তাছাড়া মহানবী ﷺ রোযাদারকে বেহেশ্তে ‘রাইয়ান’ নামক এক বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সুসংবাদ দিয়েছেন। *(বুঃ ১৭৯৭, মুঃ ১১৫২নং)* আর ‘রাইয়ান’ (তৃষ্ণাহীন) দ্বার আমল অনুযায়ী রোযাদারের জন্য বড় উপযুক্ত। কারণ, রোযা রাখার ফলে দুনিয়াতে সে পিপাসায় কাতর হয়। তাই তারই বিনিময়ে পরকালে “সেই দ্বারে যে প্রবেশ করবে সে (বেহেশ্তী পানীয়) পান করবে। আর যে ব্যক্তি একবার তা পান করবে, সে ব্যক্তি আর কোন কালেও পিপাসিত হবে না।” *(আঃ, নাঃ, সজাঃ ৫১৮৪নং)*

১৬। রোযা পালনের মাধ্যমে রোযাদার তার মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভ করে থাকে। যার জন্য তার উপবাস-জনিত মুখের দুর্গন্ধও আল্লাহর নিকট কস্তুরী অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময় হয়! *(বুঃ ১৮০৫, মুঃ ১১৫১নং)* অথচ খালি পেটে থাকা অবস্থায় মুখ থেকে বের হওয়া ঐ দুর্গন্ধ কোন মানুষ পছন্দ করে না; বরং ঘৃণাই করে থাকে। কিন্তু তা মহান স্রষ্টার নিকটে অতি পছন্দনীয়। কারণ, এ গন্ধ তাঁরই আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে নির্গত হয়ে থাকে।

১৭। রোযাদার ব্যক্তির দুআ রোযা রাখা অবস্থায় কবুল হয়ে থাকে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

"তিন প্রকার দুআ আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে থাকে; রোযাদারের দুআ, অত্যাচারিতের দুআ এবং মুসাফিরের দুআ।" *(বাঃ শুআবুল ঈমান, ইআঃ, সিসঃ ১৭৯৭নং)*

১৮। রোযা কিয়ামতের ভীষণ বিচার দিনে রোযাদারের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে; বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমি ওকে দিনের বেলায় পানাহার ও যৌনক্রিয়া থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ গ্রহণ করে নাও।' অতঃপর মহান প্রভু তার সে সুপারিশ গ্রহণ করে নেবেন। *(আঃ ২/১৭৪, হাঃ ১/৫৫৪)*

১৯। রোযা রোযাদারের জন্য ইহ-পরকালের খুশী ও সুখের হেতু। যেমন মহানবী ﷺ বলেন, "রোযাদারের জন্য রয়েছে ২টি খুশী; প্রথম খুশী হল ইফতার করার সময় এবং দ্বিতীয় খুশী হল প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাতের সময়।" *(বুঃ ১০৮৫, মুঃ ১১৫১নং)*

রোযাদারের ইফতার করার সময় যে খুশী, তা হল সেই সুখ ও তৃপ্তির একটি নমুনামাত্র; যা মুমিন ব্যক্তি নিজ প্রভুর আনুগত্য ও তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জন করে থাকে। আর প্রকৃতপ্রস্তাবে এটাই হল আসল সুখ। এই সুখ ও তৃপ্তি দুইভাবে অনুভূত হয়ে থাকে ঃ-

(ক) আল্লাহ তাআলা ঐ ইফতারের সময় রোযাদারের জন্য পানাহার বৈধ করে দিয়েছেন। আর নিঃসন্দেহে মানুষের প্রকৃতি এই যে, (বিশেষ করে খিদে থাকা অবস্থায়) খাবার দেখলে মন আনন্দে নেচে ওঠে। আর এ জন্যই তা বর্জন করা হল আল্লাহর ইবাদত।

(খ) সে মুহূর্তে রোযাদার তার একটি রোযা সম্পন্ন করে থাকে। সুতরাং আল্লাহর তওফীক অনুযায়ী সে সেদিনকার রোযা ও ইবাদত যে পালন ও পূর্ণ করতে পারল, তারই খুশী তার মনকে আন্দোলিত করে তোলে। *(দুরাঃ ১৭পৃঃ)*

পক্ষান্তরে সবচেয়ে বড় খুশী যা, তা রয়েছে পরকালে; যখন তাঁর সহিত সাক্ষাৎ হবে যাঁর জন্য রোযাদার রোযা রেখে থাকে।

২০। রোযা হল পরহেযগার ও নেক লোকদের ট্রেনিং-ময়দান; যার মাঝে আল্লাহর দেওয়া পৃথিবীর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার উপর নিজেদের কর্তব্যের বিভিন্ন ট্রেনিং নিয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, রোযা দেহ-মনের জন্য একটি বড় রহমত। রোযার মাঝেই হৃদয় ও সকল চিন্তা-ভাবনা আল্লাহ তাআলার সাথে যুক্ত থাকে। সকল মনোবল তাঁর ভালোবাসা, আনুগত্য ও তাঁর পথে জিহাদের কাজে বর্ধিত ও সংবদ্ধ হয়ে থাকে। যার পশ্চাতে উদ্দেশ্য থাকে এই যে, আল্লাহর বাণীই সমুন্নত হোক এবং কাফেরদের বাণী হোক অবনত; সে কাফের যেমনই হোক, তার যে নাম বা উপাধি হোক অথবা যে প্রতীকই হোক। *(ফাইযঃ ১০৭পৃঃ)*

২১। রোযা হল কচি-কাঁচা শিশুর মনের মাটিতে 'আমানতদারী'র বীজ রোপণ করার এক বাস্তবভিত্তিক ইতিবাচক ও কার্যকর প্রক্রিয়া। শিশু-কিশোরকে রোযা রাখতে অভ্যাসী করার সময় যখন তাকে পানাহার করতে নিষেধ করা হয় এবং খাবার ও পানি হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও সে শুধু এই বিশ্বাসে তা খেতে পারে না যে, এ নিষেধ হল আল্লাহর এবং তিনি তাকে দেখছেন। অথচ এ ব্যাপারে কেবল তার মন ও বিবেক ছাড়া অন্য কেউ পর্যবেক্ষক নেই। সুতরাং কাঁচা মনে আমানতদারী বদ্ধমূল করতে এই অনুভূতি অপেক্ষা অধিক প্রতিক্রিয়াশীল আর অন্য কি হতে পারে?

যার ফলে শৈশব থেকেই শিশু আমানতদারীর মত এক নৈতিকতাপূর্ণ কর্মে অভ্যাসী হয়ে

গড়ে ওঠে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরেও তার যথার্থ হিফাযত করতে ও তার মনে তা আজীবন বহাল রাখতে কোন প্রকার কষ্টবোধ করে না। *(সারাঃ ৩৯পৃঃ)*

২২। রোযা মানুষের হৃদয়কে নরম করে, আল্লাহ-প্রেমী করে এবং সর্বদা তাঁর যিক্র ও শুক্র করতে অভ্যাসী করে।

২৩। রোযা মানুষের মাঝে শয়তানের প্রবেশ ও প্রবাহ-পথ রুদ্ধ করে। এর ফলে তার দেহ-মনে শয়তানের আধিপত্য কমে যায়। পক্ষান্তরে যখনই মানুষ নিজ প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দেয়, তখনই শয়তান তা লুফে নিয়ে তাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে পরিচালিত করতে থাকে। *(ফাইযঃ ১০৮পৃঃ)*

২৪। রোযা হল আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করার অন্যতম মাধ্যম। কারণ, রোযা হল পানাহার ও যৌনমিলন থেকে বিরত থাকার নাম। আর মানুষের উপর আল্লাহর যে সকল বড় বড় নেয়ামত রয়েছে তার মধ্যে পানাহার ও যৌনমিলন হল অন্যতম। সুতরাং মানুষ এ নেয়ামতের কদর তখনই বুঝবে, যখন সে এ নেয়ামত থেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বঞ্চিত থাকবে। কারণ, হারিয়ে না গেলে কোন নেয়ামতের কদর বুঝা যায় না। আর যখনই উক্ত নেয়ামতের কদর সে বুঝবে, তখনই তার অবশিষ্ট অধিকার আদায়ের জন্য শুক্রিয়া জ্ঞাপন করবে। পক্ষান্তরে নেয়ামতের শুক্র আদায় করা ফরয; শরীয়তে এবং বিবেক মতেও। রোযার আয়াতে মহান আল্লাহ ঐ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেন,

(([illegible])) অর্থাৎ, যাতে তোমরা শুক্র আদায় কর। *(কুঃ ২/ ১৮৫)*

রোযাদার যখন ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করে, তখন সে সেই গরীব-নিঃস্বদের কষ্টের কথাও উপলব্ধি করে; যারা ক্ষুধার সময় পেটে এক মুঠো অন্নও যোগাড় করতে সমর্থ নয়। এর ফলে ঐ উপলব্ধি তাকে তাদের জন্য দান-খয়রাত করে সহানুভূতি প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, নিজের দেখা বিষয় শোনা বিষয়ের মত নয়। নিজের দেখা ও পরীক্ষা করা বিষয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতীতি জন্মে অধিক। যেমন একজন ঘোড়সওয়ার লোক পথ চলার কষ্ট ততক্ষণ অনুভব করতে সক্ষম নয়; যতক্ষণ না সে নিজে পায়ে হেঁটে পথ চলে দেখেছে। *(ফাইযঃ ১৪পৃঃ, ৭০ঃ ৪নং)*

২৫। রোযার মাধ্যমে রোযাদার ক্ষুধা-জনিত দুর্বলতার ফলে সে আল্লাহর কতটা মুখাপেক্ষী তা আন্দাজ করতে পারে। আর যে ব্যক্তি নিজের মাঝে নিজের দুর্বলতা চিনতে পারে, সে ব্যক্তির মিথ্যা অহংকার দূরীভূত হয়ে যায়। পরন্তু আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করেন, যে নিজের কদর নিজে জেনেছে। *(ইতহাফ ৪৫পৃঃ)*

২৬। রোযাতে রোযাদার ফিরিশ্তামন্ডলীর অনুরূপ কর্মে শামিল হতে পারে; যে ফিরিশ্তামন্ডলী আল্লাহর কোন প্রকার অবাধ্যাচরণ করেন না। তাঁরা তাই করেন, যা করতে তাঁদের প্রতিপালক তাঁদেরকে আদেশ করেন। দিবারাত্র তসবীহ পাঠ করতে থাকেন এবং কোন প্রকার ক্লান্তিবোধ করেন না। যাঁরা খান না এবং পানও করেন না। *(ঐ ৪৫পৃঃ)*

২৭। রোযা রোযাদারের ঈমান বৃদ্ধি করে। এই রোযাতে মানুষ অধিকাধিক নামায পড়ে, কুরআন তেলাঅত ও যিক্র করে, দান-খয়রাত করে, দুআ ও ইস্তিগফার তথা তওবা করে, ওয়ায-নসীহত শোনে। রোযা তাকে মন্দ কাজ করতে বাধা দেয়। বলা বাহুল্য, এ সবে পাপ

বন্ধ থাকে এবং ঈমান বর্ধিত হয়। *(ঐ ৪৫পৃঃ)*

২৮। রোযার মাসে রোযাদারের দ্বীনী জ্ঞান বর্ধিত হয়ে থাকে। কারণ, রমযান হল ইবাদতের মাস, আল্লাহর আয়াত নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ও গবেষণা করার মাস। কুরআন মাজীদ তেলাঅত করা ও শোনার মাস। *(সারাঃ ৪১পৃঃ)*

২৯। এ মাসে দ্বীনের আহবায়কদের জন্য রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। এ মাসে অধিকাংশ মুসলিম জনসাধারণ মসজিদের দিকে ধাবিত হয়। এদের মধ্যে কেউ বা তার জীবনে প্রথমবার প্রবেশ করে, কেউ বা অনেক দিন হল মসজিদ ত্যাগ করেছিল। এ সময় তাদের হৃদয় এক প্রকার দুর্লভ নম্রতা ও তরঙ্গায়িত ভক্তিতে গদ্‌গদ্‌ করে।

সুতরাং এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মন-গলানো উপদেশমালা এবং উপযুক্ত ওয়ায ও দর্স প্রয়োগ করে তাদের ঈমান বাড়াতে সাহায্য করা উচিত। আর এ কাজে অবশ্যই সৎ ও আল্লাহভীতির কাজে সহায়তা হয়ে থাকে। *(সারাঃ ৪১পৃঃ)*

পরন্তু রমযানের রোযা বছরান্তে একবার ফরযরূপে এসে থাকে। যা হজ্জের মত জীবনে একবার নয়। যাতে প্রত্যেক বছর ঈমানী দর্সের পুনরাবৃত্তি হয় এবং রোপিত ঈমানী বৃক্ষ সহসায় বেড়ে ওঠে।

৩০। রোযার মাধ্যমে মুসলিমদের সামাজিক উপকারিতা সাধন হয়ে থাকে। রোযা হল মুসলিম জাতির ঐক্যের নিদর্শন, সারা উম্মাহর মাঝে সংহতির প্রতীক, গরীব-ধনীর মাঝে সাম্য ও সম্প্রীতির চিহ্ন। এতে আম-খাস, আতরাফ-আশরাফ, আমীর-ফকীরের ভেদাভেদ চূর্ণ হয়ে যায়। সকলের মনে একটাই বোধ জাগে যে, মুসলিম জাতি হল এক জাতি। সকলে একই সময়ে পানাহার করে, একই সময়ে রোযা রাখে। একই জামাআতে মসজিদে তারাবীহর নামায পড়ে। যেন সকলের হৃদয় এক, মাস এক, কর্মও এক, যাদেরকে তাদের নবী ﷺ বলেছেন, তারা হল একটি দেহের মত।

৩১। রোযার উপবাস স্বাস্থ্যের জন্য বড় উপকারী। রোযাতে তুলনামূলকভাবে কম খাওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময় ধরে পাকস্থলীকে বিরতি দেওয়া হয়। এর ফলে শরীরের মেদ, ক্লেদ ও আর্দ্রতা ইত্যাদি দূরীভূত হয়ে যায়। *(ফসূলঃ ৮পৃঃ)* আর একথা বিদিত ও স্বীকৃত যে, শরীরের মধ্যে পেট হল রোগের বাসা এবং ব্যবস্থাপিত ও নিয়ন্ত্রিত খাদ্য আহার করা হল শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। বলা বাহুল্য, এ কথা বহু চিকিৎসকই স্বীকার করেছেন যে, রোযাতে রয়েছে বহু দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি থেকে নিরাপত্তা, বিশেষ করে যক্ষ্মা, ক্যানসার ইত্যাদি।

রোযায় রয়েছে শরীরের ওজন বৃদ্ধি, হ্যাপাটাইটিস, জন্ডিস, প্লীহা, যকৃৎ, বদহজম, প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা।

রোযা ফরয হয়েছে সুস্থ মানুষের উপর। যাতে আক্রমণের পূর্বেই ঐ সকল বা আরো অজানা বহু রোগের হাত থেকে বাঁচার উপায় পাওয়া যায়। তাছাড়া বহু গবেষণা এ কথা প্রমাণ করেছে যে, পানাহার থেকে বিরত থাকা একটি প্রকৃতিগত ব্যাপার; যা মহান সৃষ্টিকর্তা নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময় ব্যাপী জীবজগতের জন্য অনিবার্য করেছেন। আর তা শুধু এই জন্য যে, যাতে করে প্রাণীজগৎ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়, বাঁচার জন্য শক্তি পায় এবং নিজ নিজ বংশবিস্তারে যথানিয়মে সক্রিয় থাকতে পারে।

জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গের উপবাস করার কথা অনেকের অজানা নয়। কোন কোন জন্তু লম্বা সময় ধরে প্রায় কয়েক মাস যাবৎ উপবাস করে। কোন কোন জন্তু কয়েক দিন ধরে উপবাস করে। বরং উদ্ভিদজগৎও উপবাস পালন করে থাকে। যার ফলে নতুন, সুন্দর ও লকলকে পাতা বের হয়ে আসে এবং শান্ত শীতে নিদ্রার পর ফুল-ফলে সুশোভিত হয়ে শক্তিশালী ও সজীবরূপে শুরু হয় বৃক্ষ-তরুলতার আনন্দময় বসন্তকাল।

ডাঃ সলোমন মানব-দেহকে ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করে বলেন, 'ইঞ্জিন রক্ষাকল্পে মধ্যে মধ্যে ডকে নিয়া চুল্লি হইতে ছাই ও অঙ্গার সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করা যেমনটা আবশ্যক - উপবাস দ্বারা মধ্যে মধ্যে পাকস্থলী হইতে অজীর্ণ খাদ্যটি নিষ্কাশিত করাও তেমনটা দরকার।' *(বাংলা মিশকাত ৪/২৬৩)*

৩২। রোযা মানুষের চিন্তাশক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি করে। কারণ, পেট খালি থাকলে চিন্তা-গবেষণা নির্মল হয় এবং মন-মগজের কর্ম সুন্দর হয়।

পক্ষান্তরে যারা ধারণা করে যে, রোযা মানুষের খরচ বাড়ায় এবং অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয় এই রোযার মাসে, তাদের ধারণা সঠিক নয়। কেননা, খাবারের নানান ভ্যারাইটিজ তৈরী করা এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশী খাবার প্রস্তুত করা, রমযানের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরন ও বরনের খাদ্যপণ্যের বিপণন ঘটানোতে ইসলামের অনুমোদন নেই। বরং তা হল অপচয়। আর অপচয় ইসলামে নিষিদ্ধ; রমযানে এবং অন্য মাসেও।

বলাই বাহুল্য যে, রোযাতে রয়েছে মঙ্গলই মঙ্গল। ব্যক্তি ও সমাজের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সেই মঙ্গল অনস্বীকার্য। আর মহান আল্লাহর এই বাণীর মধ্যে সেই মঙ্গলের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, তোমাদের রোযা রাখাটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর; যদি তোমরা উপলব্ধি কর। *(কুঃ ২/১৮৪)*

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোযার প্রকারভেদ

রোযা হল দুই প্রকার; ফরয (বাধ্যতামূলক) ও নফল (অতিরিক্ত)। ফরয রোযা আবার ৩ প্রকার; রমযানের রোযা, কাফ্ফারার রোযা এবং নযর মানা রোযা।

এক্ষণে রমযানের রোযা সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসায়েল আলোচনা করব।

রমযানের রোযার মান

রমযানের রোযা আল্লাহর কিতাব, তাঁর রসূল ﷺ-এর হাদীস ও মুসলিম উম্মাহর ইজমা' (সর্বসম্মতি) মতে চিরকালের জন্য ফরয।

কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা

পরহেযগার হতে পার। তা নির্ধারিত কয়েক দিন---।” *(কুঃ ২/১৮৩-১৮৪)*

তিনি আরো বলেন, “রমযান মাস; যে মাসে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে।” *(কুঃ ২/১৮৫)*

হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, “ইসলামের ভিত্তি হল ৫টি কর্ম; আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্যিকারে উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রসূল (দূত) -এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাৎ প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা এবং সামর্থ্য থাকলে কা'বাগৃহের হজ্জ করা।” *(বুঃ ৮, মুঃ ১৬নং, তিঃ, নাঃ)*

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার উপর আল্লাহ কি কি রোযা ফরয করেছেন তা আমাকে বলে দিন।' উত্তরে তিনি বললেন, “রমযান মাসের রোযা।” লোকটি বলল, 'এ ছাড়া অন্য কিছু কি আমার কর্তব্য আছে?' তিনি বললেন, “না, তবে যদি তুমি নফল রোযা রাখ, তাহলে ভিন্ন কথা।” *(বুঃ, ১৮৯১, মুঃ)*

আর মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে একমত যে, রমযানের রোযা ফরয। তা ইসলামের অন্যতম রুক্ন, খুঁটি বা ভিত্তি। এ ফরয হওয়ার কথা সহজ উপায়ে সকলের জানা। সুতরাং যে কেউ তা অস্বীকার করবে সে মুরতাদ্দ্ কাফের। তাকে তওবা করার জন্য আহবান করা হবে। তাতে সে তওবা করলে এবং রোযা ফরয বলে মেনে নিলে উত্তম। নচেৎ, (সরকার) তাকে কাফের অবস্থায় হত্যা করবে। *(ফিসুঃ ১/৩৮৩, ফুসূল ৪-৫পৃঃ)*

রমযান মাসের বৈশিষ্ট্য ও তার রোযার মাহাত্ম্য

রমযান শব্দটি 'রম্য' ধাতু থেকে উৎপত্তি। এর মানে হল কঠিন গরম, জ্বালিয়ে দেওয়া। চান্দ্র মাসগুলোর যখন প্রাচীন নাম বাদ দিয়ে আরবী ভাষায় নতুন নাম দেওয়া হয়, তখন রমযান মাসটি পরে কঠিন গরমের সময়। আর তাকেই ভিত্তি করে তার 'রামাযান' নামকরণ করা হয়। অবশ্য রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পর তার নাম সার্থক হয়। যেহেতু উক্ত মাসে ক্ষুৎপিপাসায় রোযাদারের পেট জ্বলে থাকে।

রমযানের মাসের একাধিক এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যান্য মাসে নেই। যেমন ঃ-

১। এই মাসের নাম কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে। *(দ্রষ্টব্য কুঃ ২/১৮৫)* পক্ষান্তরে অন্য মাসের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

২। এই মাস আসার সময় মহানবী ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে সুসংবাদ দিতেন।

৩। রমযান হল বর্কতময় পবিত্র মাস। এ মাসে বর্কত অবতীর্ণ হয়।

৪। মহান আল্লাহ এই মাসের রোযা ফরয করেছেন।

৫। এই মাসে জান্নাতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হয় এবং একটা দ্বারও বন্ধ থাকে না।

৬। এই মাসে রহমতের সকল দরজা খুলে দেওয়া হয়। *(সিসঃ ১৩০৭, সজাঃ ৪৭১নং)*

৭। এই মাসে জাহান্নামের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করা হয় এবং একটা দ্বারও খোলা থাকে না।

উল্লেখ্য যে, বেহেশ্তের সকল দরজা খুলে দেওয়ার কারণ হল, যাতে করে আমলকারী তা শুনে আমলে আগ্রহ ও উৎসাহ পায় এবং তাতে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর দোযখের সকল দরজা বন্ধ করার কারণ হল, যাতে আমলকারী এই মাসে পাপে লিপ্ত না হয় এবং তাতে প্রবেশ না করে বসে। এর অর্থ এই নয় যে, যে ব্যক্তি রমযান মাসে মারা যাবে সে বিনা হিসাবে সোজা বেহেশ্তে যাবে। *(ফাসিঃ ২২পৃঃ)*

৮। উচ্ছৃঙ্খল শয়তান দলকে এই মাসে বন্দী করে রাখা হয়। *(বুঃ ১৮০, মুঃ ১০৭৯নং)* অর্থাৎ, তাদেরকে শিকল ও বেড়ি দিয়ে বেঁধে আটকে রাখা হয়। ফলে তারা রমযানে সেই পাপাচরণ ঘটাতে সক্ষম হয় না, যতটা অন্য মাসে সক্ষম হয়। এ জন্য দেখা যায় যে, অন্যান্য মাসের তুলনায় এই মাসে শয়তানের কুমন্ত্রণা, চক্রান্ত এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার কাজ কম ঘটে থাকে। বরং শয়তান রমযান মাসকে ভয় করে, যেমন ভয় করে আযান ও ইকামতকে এবং তার শব্দ শুনে পাদতে পাদতে পলায়ন করে।

কিন্তু আমরা এ মাসেও যে পাপাচরণ ও শয়তানী কর্মকান্ড ঘটতে দেখে থাকি তা উক্ত কথার বিরোধী নয়। কারণ, পাপ কেবল শয়তানই ঘটায় না। বরং মন্দপ্রবণ মানুষের মনও এমনিতেই পাপ করে থাকে। যে মন শয়তানের কুমন্ত্রণা সত্বর গ্রহণ করে থাকে এবং শয়তানের তাসীর কম বা বন্ধ হয়ে গেলেও সেই মন নিজেই পাপ সৃষ্টি করে। এটি হল মানুষের 'নাফ্সে আম্মারাহ।' যে নাফ্স বা মন শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেই পাপাচরণ ঘটিয়ে থাকে। নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক। *(দুরঃ ২১পৃঃ)*

৯। রমযান মাসে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। *(বুঃ ১৮৯৯, আঃ, নাঃ, সিসঃ ১৮৬৮নং)*

১০। এই মাসে দুআ কবুল হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "(রমযান মাসের) প্রত্যেক রাতে ও দিনে প্রত্যেক মুসলিমের দুআ কবুল করা হয়।" *(বাযযার, সতাঃ ৯৮৮নং)*

১১। এই মাসে রয়েছে এমন একটি রাত্রি, যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এই রাতের মঙ্গল থেকে বঞ্চিত হয়, সে আসলে সকল মঙ্গল থেকে বঞ্চিত। আর একান্ত বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া সে মঙ্গল থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না। *(সইমাঃ ১৩৩৩, সজাঃ ৩৫১৯নং)*

১২। এই মাসের প্রত্যেক রাত্রে একজন আহবানকারী (ফিরিশ্তা) আহবান করে বলেন, 'ওহে কল্যাণকামী! তুমি অগ্রসর হও। আর ওহে মন্দকামী! তুমি ক্ষান্ত হও।'

১৩। এই মাসের প্রত্যেক রাত্রে মহান আল্লাহ দোযখ থেকে মুসলিম মুক্ত করে থাকেন। *(আঃ ৪/৩১২, ৫/৪১১, নাঃ, সইমাঃ ১৩৩১নং)*

১৪। রমযান মাস হল সবর ও ধৈর্যের মাস। যেহেতু রোযা ছাড়া অন্য ইবাদতে সেইরূপ ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয় না। মুসলিম এই মাসে পূর্ণ ৩০ বা ২৯টি দিনই পানাহার, স্ত্রী-মিলন এবং অন্যান্য রোযাবিরোধী সকল কর্ম থেকে ধৈর্যের সাথে বিরত থাকে। তাই মহানবী ﷺ এই মাসকে 'ধৈর্যের মাস' বলে অভিহিত করেছেন। *(সজাঃ ৩৮০৩নং)* আর তিনি বলেছেন, "ধৈর্যের (রমযান) মাসে রোযা আর প্রত্যেক মাসের তিনটি রোযা অন্তরের বিদ্বেষ ও খট্কা দূর করে দেয়।" *(বায্যার, ত্বাবঃ, ইহিঃ, সজাঃ ৩৮০৪নং)*

১৫। রমযান হল কুরআনের মাস। কুরআন পঠন-পাঠন ও তেলাঅতের মাস। প্রশংসার অধিকারী বিজ্ঞানময় আল্লাহর তরফ থেকে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাস। এই মাসে

কুরআন 'লাওহে মাহফূয' থেকে দুনিয়ার আসমানের প্রতি অবতীর্ণ হয়, অথবা কুরআন অবতীর্ণ হতে শুরু হয় এই পবিত্র মাসে। মহান আল্লাহ বলেন, "রমযান মাস; যে মাসে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে।" *(কুঃ ২/ ১৮৫)*

আর কেবল কুরআনই নয়; বরং অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহও অবতীর্ণ হয়েছে এই বর্কতময় মাসেই। "ইবরাহীমের সহীফাসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে রমযান মাসের প্রথম রাতে, তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে রমযানের সপ্তম রাতে, ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয়েছে রমযানের ১৪তম রাতে, যাবূর অবতীর্ণ হয়েছে রমযানের ১৯শের রাতে এবং কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে রমযানের ২৫শের রাতে।" *(আঃ, ত্বাবঃ, সজাঃ ১৪৯৭, সিসঃ ১৫৭৫নং)*

১৬। রমযান মাসে বিস্ময়কর বড় বড় বিজয় দানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ইসলামকে সাহায্য করেছেন, মুসলিমদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন। এই মাসেই বদর যুদ্ধে বদর প্রান্তরে মুসলিমদের আধ্যাত্মিক শক্তিমত্তা, ঈমানী ভিত্তির সুদৃঢ়তা এবং প্রতীতির অবিচলতা প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআলা এই দিনে তাঁদেরকে সাহায্য করেন এবং শত্রুর উপর বিজয়ী করেন।

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁদেরকে সাহায্য করেন। যার পর মুসলিমরা স্থিতিশীলতা পেলেন এবং ইসলাম পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। *(সারাঃ ৮- ১৩পৃঃ)*

১৭। রমযান মাসে কোন কোন আমলের বহুগুণ সওয়াব লাভ হয়। এ মাসে উমরাহ আদায় আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে হজ্জ করার সমান। *(বুঃ ১৮৬৩, মুঃ ১২৫৬, আদাঃ, তিঃ, ইমাঃ, দাঃ)*

পক্ষান্তরে এ মাসের রোযা রাখার সওয়াব প্রসঙ্গে মহানবী ﷺ বলেন,

(ক) "যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে এবং সওয়াবের আশা রেখে রমযানের রোযা রাখবে তারও পূর্বেকার পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে।" *(বুঃ ৩৮, ১৯০৮, মুঃ ৭৬০, আদাঃ, নাঃ, ইমাঃ)*

(খ) "পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআহ হতে অপর জুমআহ পর্যন্ত ও এক রমযান অপর রমযান পর্যন্ত উভয়ের মধ্যবর্তীকালের সংঘটিত পাপরাশিকে মোচন করে দেয়; যদি কাবীরা গোনাহ থেকে দূরে থাকা হয় তবে।" *(আঃ ২/৩৫৯, ৪০০, ৪১৪, মুঃ ২৩৩নং)*

(গ) এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর কাছে হাজির হয়ে আরজ করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার অভিমত কি? যদি আমি সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আপনি আল্লাহর রসূল, পাঁচ-ওয়াক্ত নামায পড়ি, যাকাত আদায় করি এবং রমযানের রোযা পালন করি, তাহলে আমি কাদের দলভুক্ত হব?' উত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, "তুমি সিদ্দীক ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে।" *(বাযযার, ইখুঃ, ইহিঃ, সতাঃ ৯৮-৯নং)*

বিনা ওযরে রোযা ত্যাগ করার সাজা

যে ব্যক্তি বিনা ওজরে রমযানের রোযা ত্যাগ করে সে ব্যক্তির দুটি কারণ হতে পারে; হয় সে তা ফরয বলে অস্বীকার করছে এবং তাকে একটি ইবাদত বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে না, (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক।) আর না হয় সে আলসেমি করে তা রাখছে না।

সুতরাং যদি সে রোযা ফরয বলে অস্বীকার করে ও বলে যে, রোযা শরীয়তে ফরয নয়,

তাহলে সে কাফের ও মুরতাদ্দ; যেমন এ কথা পূর্বে বলা হয়েছে। কারণ, সে দ্বীনের সর্ববাদিসম্মত এমন একটি ব্যাপারকে অস্বীকার করে যা আম-খাস সকলের পক্ষে জানা সহজ এবং যা ইসলামের একটি রুক্ন।

আর তার এই মুরতাদ্দ্ হওয়ার ফলে একজন মুরতাদ্দের মাল ও পরিবারের ব্যাপারে যা বিধান আছে তা কার্যকর হবে। সরকারের কাছে সে হত্যাযোগ্য অপরাধী বলে গণ্য হবে। তার গোসল-কাফন ও জানাযা হবে না এবং মুসলিমদের গোরস্থানে তাকে দাফন করাও যাবে না। অবশ্য যদি কেউ নওমুসলিম হওয়ার ফলে অথবা ইসলামী পরিবেশ ও উলামা থেকে দূরে থাকার ফলে এ ধরনের কথা বলে থাকে, তাহলে তার কথা ভিন্ন।

পক্ষান্তরে যদি কেউ আলসেমি করে রোযা না রাখে, তাহলে ভয়ানক কঠিন শাস্তি তার জন্য অপেক্ষা করছে।

হযরত আবূ উমামাহ বাহেলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম; এমন সময় (স্বপ্নে) আমার নিকট দুই ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তাঁরা আমার উভয় বাহুর ঊর্ধ্বাংশে ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের নিকট উপস্থিত করলেন এবং বললেন, 'আপনি এই পাহাড়ে চড়ুন।' আমি বললাম, 'এ পাহাড়ে চড়তে আমি অক্ষম।' তাঁরা বললেন, 'আমরা আপনার জন্য চড়া সহজ করে দেব।' সুতরাং আমি চড়ে গেলাম। অবশেষে যখন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেশ কিছু চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'এ চিৎকার-ধ্বনি কাদের?' তাঁরা বললেন, 'এ হল জাহান্নামবাসীদের চীৎকার-ধ্বনি।' পুনরায় তাঁরা আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলাম একদল লোক তাদের পায়ের গোড়ালির উপর মোটা শিরায় (বাঁধা অবস্থায়) লটকানো আছে, তাদের কশগুলো কেটে ও ছিঁড়ে আছে এবং কশ বেয়ে রক্তও ঝরছে। নবী ﷺ বলেন, আমি বললাম, 'ওরা কারা?' তাঁরা বললেন, 'ওরা হল তারা; যারা সময় হওয়ার পূর্বে-পূর্বেই ইফতার করে নিত---।" *(ইখুঃ, ইহিঃ, বাঃ ৪/২ ১৬, হাঃ ১/৪৩০, সতাঃ ৯৯ ১নং)*

'ওরা হল তারা; যারা সময় হওয়ার পূর্বে-পূর্বেই ইফতার করে নিত---।' রোযা রাখার পরেও তাদের যদি ঐ অবস্থা হয়, তাহলে যারা পূর্ণ দিন মূলেই রোযা রাখে না, তাদের অবস্থা এবং যারা পূর্ণ মাসই রোযা রাখে না, তাদের অবস্থা যে কত করুণ, কত সঙ্গিন তা অনুমেয়!

মুস্তাফা মুহাম্মাদ আম্মারাহ তাঁর তারগীবের টীকায় *(২/১০৯)* বলেন, 'উক্ত হাদীসের ভাবার্থ এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে রোযা ভঙ্গকারীদের আযাব সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল করেছেন। তিনি দেখেছেন, তাদের সেই দুরবস্থা; তাদের আকার-আকৃতি ছিল বড় মর্মান্তিক ও নিকৃষ্ট। কঠিন যন্ত্রণায় তারা কুকুর ও নেকড়ের মত চিৎকার করছে। তারা সাহায্য প্রার্থনা করছে অথচ কোন সাহায্যকারী নেই। তাদের পায়ের শেষ প্রান্তে (গোড়ালির উপর মোটা শিরায়) জাহান্নামের আঁকুশি দিয়ে কসাইখানার যবাই করা ছাগলের মত তাদেরকে নিম্নমুখে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর তাদের কশ বেয়ে মুখভর্তি রক্ত ঝরছে! আশা করি নাফরমান বেরোযাদার মুসলিম সম্প্রদায় এই আযাবের কথা জেনে আল্লাহর নিকট তওবা করবে এবং তাঁর সেই আযাবকে ভয় করে যথানিয়মে রোযা পালন করবে।'

ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেন, 'মুমিনদের নিকটে এ কথা স্থির-সিদ্ধান্ত যে, যে ব্যক্তি কোন

রোগ ও ওজর না থাকা সত্ত্বেও রমযানের রোযা ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি একজন ব্যভিচারী ও মদ্যপায়ী থেকেও নিকৃষ্ট। বরং মুসলিমরা তার ইসলামে সন্দেহ পোষণ করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন নাস্তিক ও নৈতিক শৈথিল্যপূর্ণ মানুষ। *(মাফাঃ ২৫/২২৫, কাঃ ৪৯পৃঃ, ফিসুঃ ১/৩৮৪, ফারারাঃ ২০-২১পৃঃ, তাফাসাসাঃ ৭৪পৃঃ)*

তৃতীয় অধ্যায়

মাস প্রমাণ হবে কিভাবে?

রমযান মাস প্রবেশ হওয়া প্রমাণ হবে দুয়ের মধ্যে একভাবে ঃ-

১। রমযানের চাঁদ দেখে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে। *(কুঃ ২/১৮৫)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর। কিন্তু যদি আকাশে মেঘ থাকে, তাহলে গণনায় ৩০ পুরা করে নাও।” *(বুঃ ১৯০০, মুঃ ১০৮০নং)*

তিনি আরো বলেন, “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর। কিন্তু যদি আকাশে মেঘ থাকে, তাহলে শা’বানের গুনতি ৩০ পূর্ণ করে নাও।”

বলা বাহুল্য, হাদীসে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, রমযানের রোযা ফরয হওয়া তথা তা শুরু করার ব্যাপারটা চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। আর এর মানেই হল, চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখা নিষিদ্ধ।

❖ **সাক্ষ্য দ্বারা মাস প্রমাণ ঃ**

মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, ওরা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, তা হল মানুষ ও হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক। *(কুঃ ২/১৮৯)*

মহান আল্লাহ চাঁদকে মানুষের জন্য সময়-নির্দেশক হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। এর দ্বারা মানুষ নিজেদের ইবাদত ও পার্থিব জীবনের সময় ও তারীখ নির্ধারণ করতে পারে। সুতরাং বান্দার প্রতি তাঁর খাস রহমত এই যে, তিনি ফরয রোযা শুরু হওয়ার বিষয়টা একটি এমন স্পষ্ট জিনিস ও প্রকট চিহ্নের উপর নির্ভরশীল করেছেন, যা সকল মানুষই জানে।

অবশ্য রোযা ওয়াজেব হওয়ার জন্য এ শর্ত নয় যে, প্রত্যেক মুসলিমকেই চাঁদ দেখতে হবে। বরং কিছু সংখ্যক লোক দেখলে, বরং - সঠিক মতে - একজন দেখলেই; যদি সে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হয়, তাহলে তার দেখা মতে সকলের জন্য রোযা রাখা জরুরী হয়ে যাবে। অবশ্য তাদের সকলের চন্দ্রের উদয়-স্থল এক হয় তবে। *(ফারারাঃ ২৮পৃঃ)*

ইবনে উমার ؓ বলেন, একদা লোকেরা নতুন চাঁদ দেখতে জমায়েত হল। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে খবর দিলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। তিনি আমার এ খবরে রোযা রাখলেন এবং

লোকেদেরকে রোযা রাখতে আদেশ করলেন। *(আদাঃ ২৩৪২, দাঃ ২/৪, ইহিঃ ৮৭১নং, হাঃ ১/৪২৩, দারাঃ, বাঃ ৪/২১২, ইগঃ ৪/১৬)*

২। রমযান প্রবেশ হওয়ার কথা প্রমাণ করার দ্বিতীয় উপায় হল, (চাঁদ দেখা না গেলে) শা'বান মাসকে ৩০ দিন পূর্ণ করে নেওয়া। (অবশ্য এর জন্য শর্ত হল শা'বান মাসের শুরুর হিসাব রাখা।) এ ব্যাপারে পূর্বে উল্লেখিত দুটি হাদীস আমাদেরকে পথনির্দেশ করে। যাতে বলা হয়েছে, "যদি আকাশে মেঘ থাকে, তাহলে শা'বানের গুনতি ৩০ পূর্ণ করে নাও।"

❖ জ্যোতিষ-গণনার উপর নির্ভর করা যাবে নাঃ

উপর্যুক্ত দুটি উপায় ছাড়া অন্য উপায়ে মাস প্রবেশ হওয়ার কথা প্রমাণ করা যাবে না। সুতরাং জ্যোতিষ-গণনা বা পঞ্জিকা মতে রমযান মাস ধরে নিয়ে রোযা ফরয হবে না। বলা বাহুল্য, যদি জ্যোতিষীদের হিসাব মতে আজকের রাত রমযানের প্রথম তারীখ হয়, কিন্তু সন্ধ্যায় কেউই চাঁদ না দেখে থাকে, তাহলে রোযা রাখা যাবে না। যেহেতু শরীয়ত রোযা রাখার বিধানকে একটি বাহ্যিকভাবে উপলব্ধ জিনিসের উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছে। আর তা হল চাঁদ দেখা। *(মুমঃ ৬/৩১৪)* তা ছাড়া পঞ্জিকার হিসাব নির্ভুল নয়। এক এলাকায় সচল হলেও অন্য এলাকায় অচল। অতএব তার উপর ভরসা করে চোখ বুজে রোযা রাখা বৈধ নয়।

পঞ্জিকার হিসাবের উপর নির্ভর করার কথা শরীয়ত ও বিবেকে স্বীকৃত নয়। কেননা, মুসলিম উম্মাহ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুঅত কাল থেকে নিয়ে আজও পর্যন্ত চাঁদ দেখার উপরই নির্ভর করে; হিসাবের উপর ভরসা না করে, কেবল মহানবী ﷺ-এর অনুসরণে রোযা রেখে আসছে। যে সম্মানিত নবী ﷺ বলেন, "আমরা হলাম নিরক্ষর জাতি। আমরা লিখাপড়া জানি না এবং হিসাবও জানি না। মাস কখনো এই রকম হয়, কখনো এই রকম হয়। অর্থাৎ, কখনো ২৯ দিনে হয় এবং কখনো ৩০ দিনে।" *(বুঃ ১৯১৩নং)*

হাফেয ইবনে হাজার উক্ত হাদীসের টীকায় বলেন, এখানে 'হিসাব' বলতে 'জ্যোতিষী হিসাব'কে বুঝানো হয়েছে। আর তখন এ হিসাব খুবই কম সংখ্যক লোক ছাড়া কেউই জানত না। তাই রোযা রাখা এবং অন্যান্য ব্যাপার চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল করে দেওয়া হয়েছে। যাতে এ বিষয়ে লোকেরা অসুবিধা তথা জ্যেতিষী গণনার কষ্ট থেকে রেহাই পায়।

পরবর্তীকালে কিছু লোক এ হিসাব শিখলেও রোযা রাখা-না রাখার বিষয়টা এইভাবেই চলতে থাকল। বরং হাদীসের প্রকাশ্য উক্তি মূলতঃ হিসাবের উপর নির্ভর না করতেই ইঙ্গিত করে। আর এ কথা আরো স্পষ্ট করে দেয় পূর্বোক্ত হাদীস। যাতে বলা হয়েছে, "যদি আকাশে মেঘ থাকে, তাহলে শা'বানের গুনতি ৩০ পূর্ণ করে নাও।" এখানে এ কথা বলা হয়নি যে, যদি আকাশে মেঘ থাকে, তাহলে জ্যোতিষীদেরকে জিজ্ঞাসা করে নাও।"

এই বিধানের পশ্চাতে যুক্তি এই যে, আকাশ অপরিষ্কার থাকার সময় সংখ্যা পূরণ করে নিলে তাতে সকল আজ্ঞাপ্রাপ্ত মুসলিম সমান হয়ে যাবে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ ও ঝগড়া অবশিষ্ট থাকবে না। *(ফবাঃ ৪/১৫১)*

❖ চাঁদ দেখার জন্য দূরবীন ব্যবহারঃ

চাঁদ দেখার জন্য দূরের জিনিস কাছের করে দেখার যন্ত্র দূরবীন ব্যবহার করা দোষাবহ নয়। অবশ্য দূরবীন ব্যবহার করা বা চাঁদ দেখার জন্য তা ক্রয় করা ওয়াজেব নয়। কারণ, বাহ্যিকভাবে সুন্নাহ এ কথাই নির্দেশ করে যে, এর জন্য স্বাভাবিক দর্শনের উপর নির্ভর হবে, অস্বাভাবিক কোন দর্শনের উপর নয়। তবুও যদি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি ঐ যন্ত্রের মাধ্যমে চাঁদ দেখে থাকে, তাহলে তার ঐ দেখার উপর আমল করা যাবে। বহু পূর্ব যুগেও লোকেরা ২৯শে শা'বান বা ২৯শে রমযান উঁচু উঁচু মিনারে চড়ে ঐ শ্রেণীর যন্ত্রের মাধ্যমে চাঁদ দেখত। যাই বা হোক, যে কোন মাধ্যম ও উপায়ে, যে কোন প্রকারে চাঁদ দেখা গেলে সেই দেখার উপর আমল করা জরুরী হবে। কেননা, মহানবী ﷺ-এর বাণী এ ব্যাপারে সাধারণ। তিনি বলেন, "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর।" *(৪৮ঃ ৩১পৃঃ)*

❖ উদয়স্থলের বিভিন্নতাঃ

অভিজ্ঞদের ঐক্যমতে চাঁদের উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন এবং উদয়কালও অনুরূপ। আর এই ভিন্ন উদয়কালের ফলেই কোথাও চাঁদ দেখা যায়, কোথাও যায় না। সুতরাং উদয়-স্থল ভিন্ন হলে প্রত্যেক এলাকার জন্য পৃথক দর্শন জরুরী। পক্ষান্তরে উদয়স্থল বা উদয়কাল একই হলে একই এলাকাভুক্ত লোকেদের জন্য ২/১ জনের দর্শন অনুযায়ী আমল করা ওয়াজেব হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, "অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে।" *(কুঃ ২/১৮৫)*

আর যাদের উদয়স্থল ওদের মত নয়, তাদের জন্য বলা যাবে না যে, ওরা চাঁদ দেখেছে; না প্রকৃতপক্ষে, আর না-ই আপাতদৃষ্টে। অথচ মহান আল্লাহ তাদের জন্য রোযা ফরয করেছেন, যারা চাঁদ দেখেছে। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর।" এই আজ্ঞায় রোযা রাখার আদেশকে চাঁদ দেখার শর্ত-সাপেক্ষ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি এমন জায়গায় বাস করে, যে জায়গার উদয়স্থল যে চাঁদ দেখেছে তার উদয়স্থলের অনুরূপ নয়, সে ব্যক্তি (যেহেতু তার নিজের এলাকায় কেউ চাঁদ দেখেনি সেহেতু) আসলে চাঁদ দেখেনি; না প্রকৃতপক্ষে, আর না-ই আপাতদৃষ্টে।

পরন্তু মাসিক সময়কাল প্রাত্যহিক সময়কালের মতই। সুতরাং যেমন প্রত্যেক দেশ প্রাত্যহিক সেহরীর ও ইফতারের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন সময় ব্যবহার করে থাকে, ঠিক তেমনিই মাসিক রোযা শুরু ও শেষ হওয়ার সময় ভিন্ন ভিন্ন হওয়া জরুরী। আর এ কথা বিদিত যে, মুসলিমদের ঐক্যমতে দৈনিক সময়ের স্বতন্ত্র প্রভাব আছে। তাই যারা প্রাচ্যে বাস করে তারা তাদের আগে সেহরী খাওয়া বন্ধ করবে; যারা প্রতীচ্যে বাস করে। অনুরূপ প্রাচ্যের লোক প্রতীচ্যের লোকদের পূর্বে ইফতার করবে।

সুতরাং যখন দৈনিক সময়ে সূর্যের উদয়াস্ত কালের ভিন্নতা মেনে নিতে বাধ্য, তখন তারই সম্পূর্ণ অনুরূপ মাসের ব্যাপারেও চন্দ্রের উদয়কালের ভিন্নতাকে মেনে নিতে আমরা বাধ্য।

আর এ কথা বলা কারো জন্য যুক্তি সঙ্গত হবে না যে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা

তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে।” *(কুঃ ২/১৮৭)* এবং মহানবী ﷺ বলেন, “রাত যখন এদিক (পূর্ব গগণ) থেকে আগত হবে, দিন যখন এদিক (পশ্চিম গগণ) থেকে বিদায় নেবে এবং সূর্য যখন অস্ত যাবে, তখন রোযাদার ইফতার করবে।” *(বুঃ ১৯৪১, মুঃ ১১০০, ১১০১, আদাঃ ২৩৫১, ২৩৫২, তিঃ, দাঃ)*

আর এ কথা কেউ বলতে পারে না যে, উক্ত নির্দেশ সারা বিশ্বের সকল দেশের মুসলিমদের জন্য ব্যাপক।

কুরাইব বলেন, একদা উম্মুল ফায্ল বিন্তুল হারেষ আমাকে শাম দেশে মুআবিয়ার নিকট পাঠালেন। আমি শাম (সিরিয়া) পৌঁছে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করলাম। অতঃপর আমার শামে থাকা কালেই রমযান শুরু হল। (বৃহস্পতিবার দিবাগত) জুমআর রাত্রে চাঁদ দেখলাম। অতঃপর মাসের শেষ দিকে মদীনায় এলাম। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ আমাকে চাঁদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ?’ আমি বললাম, ‘আমরা জুমআর রাত্রে দেখেছি।’ তিনি বললেন, ‘তুমি নিজে দেখেছ?’ আমি বললাম, ‘জী হ্যাঁ। আর লোকেরাও দেখে রোযা রেখেছে এবং মুআবিয়াও রোযা রেখেছেন।’ ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, ‘কিন্তু আমরা তো (শুক্রবার দিবাগত) শনিবার রাত্রে চাঁদ দেখেছি। অতএব আমরা ৩০ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখতে থাকব।’ আমি বললাম, ‘মুআবিয়ার দর্শন ও তাঁর রোযার খবর কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়?’ তিনি বললেন, ‘না। আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এ রকমই আদেশ দিয়েছেন।’ *(মুঃ ১০৮৭ নং)*

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) এই কথাকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন যে, যে দেশের লোক চাঁদ দেখেছে তাদের এবং তাদের সামনের (পশ্চিম) দেশের লোকেদের জন্য রোযা রাখা ওয়াজেব। আর এ কথা গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, যখনই কোন দেশে চাঁদ দেখা যাবে, তখনই তার পরবর্তী (পশ্চিমী) দেশে চাঁদ অবশ্য অবশ্যই দেখা যাবে। কেননা, সে দেশের সূর্য দেরীতে অস্ত যায়। এইভাবে যত দেরীতে সূর্য ডুববে, চাঁদ সূর্য থেকে তত দূর হবে এবং তত উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হবে। উদাহরণস্বরূপ যদি বাহরাইনে চাঁদ দেখা যায়, তাহলে তার পশ্চাতের দেশ নজ্দ (রিয়ায), হিজায (মক্কা-মদীনা), মিসর ও মরক্কোতেও রোযা ওয়াজেব হবে। পক্ষান্তরে তার পূর্ব দিকের দেশ হিন্দ, সিন্দ্ ও মা অরাআন নাহার (ইরান, পাকিস্তান ও ভারতের) লোকদের জন্য রোযা রাখা ওয়াজেব হবে না। *(মুমঃ ৬/৩২১-৩২২, ইবনে ইসাইমীন, ফাসিঃ মুসনিদ ১৫পৃঃ, ইবনে জিবরীন, ফাসিঃ জিরাইসী ১০পৃঃ)*

তদনুরূপই বাংলাদেশে চাঁদ হয়েছে বলে পাকা খবর পাওয়া গেলে পশ্চিমবাংলার লোকেদের জন্য রোযা রাখা ওয়াজেব হবে; যদিও মেঘের কারণে সেখানে (পশ্চিম বাংলায়) চাঁদ না দেখা যায়।

কেউ একা চাঁদ দেখলে কি করবে?

যে ব্যক্তি কোন দূরবর্তী জায়গায় থেকে একাকী চাঁদ দেখে; দেখাতে তার কোন সাথী না থাকে অথবা সে ছাড়া অন্য কেউ না দেখে এবং এ দেখার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়, তাহলে তার জন্য রোযা রাখা ওয়াজেব। কারণ, এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর সাধারণ বাণী হল,

([illegible])

অর্থাৎ, অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে। *(কুঃ ২/১৮৫)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ।”

কিন্তু সে যদি শহর বা গ্রামে থাকে এবং শরয়ী আদালত বা হিলাল-কমিটির সামনে তার সাক্ষ্য পেশ করে এবং তার সে সাক্ষ্য রদ্দ্ করে দেওয়া হয়, তাহলে এ অবস্থায় সে গোপনে রোযা রাখবে। যাতে প্রকাশ্যে সমাজের বিরোধিতা প্রকাশ না হয়। *(মুমঃ ৬/৩২৯, ৪৮ঃ ৩৬পৃঃ, আসাইঃ ৪১-৪২পৃঃ)*

কাফের দেশে বসবাসকারী কি করবে?

যে মুসলিমরা কাফের দেশে বাস করে, যেখানে তাদের চাঁদ দেখার শরয়ী ব্যবস্থা নেই, সেখানে তারা নিজেরা চাঁদ দেখা শরয়ীভাবে প্রমাণ করতে পারে। তারা নিজেরাই চাঁদ দেখার দায়িত্ব বহন করবে। কিছু উলামা ও গণ্যমান্য লোক মিলে হিলাল-কমিটি গঠন করবে। অতঃপর তাঁদের কাছে চাঁদ দেখা প্রমাণ হলে প্রচার-মাধ্যমে প্রচার করবে অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে এক এক এলাকার নেতৃস্থানীয় লোক বা ইমামদেরকে জানিয়ে দেবে।

পক্ষান্তরে এ কাজ তাদের দ্বারা সম্ভব না হলে; সে দেশে নিজে নিজে চাঁদ দেখা সম্ভব না হলে, নিকটবর্তী মুসলিম দেশের খবর অনুযায়ী রোযা-ঈদ করবে। *(৪৮ঃ ৩৫পৃঃ, সারাঃ ১৮পৃঃ)* বিশেষ করে ঐ দেশ পূর্বে অবস্থিত হলে এবং শরয়ীভাবে চাঁদ দেখার কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হলে তা গ্রহণযোগ্য। এ ক্ষেত্রে আগামী কাল রোযা বা ঈদ বললে, সে খবরে আস্থা রাখা বা চাঁদ দেখা প্রমাণ হওয়ার কথা ধরা যায় না। অতএব তখন মাস ৩০ পূর্ণ করেই রোযা-ঈদ করা জরুরী হবে।

সঊদিয়ার চাঁদ অনুসারে রোযা-ঈদ চলবে না

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, মুসলিম যে দেশে বাস করবে, সেই দেশেরই চাঁদ দেখা অনুযায়ী রোযা-ঈদ করবে। কেননা, মহানবী ﷺ বলেন, “যেদিন তোমরা রোযা রাখ, সেদিন রোযার দিন, যেদিন তোমরা ঈদ কর, সেদিন ঈদের দিন এবং যেদিন তোমরা কুরবানী কর সেদিন কুরবানীর দিন।” *(তিঃ, সিসঃ ২২৪নং)* সুতরাং সঊদী আরবে চাঁদ দেখার কথা প্রমাণ ও ঘোষণা করা হলে এবং যে দেশে ঐ মুসলিম বাস করে সে দেশ পূর্বে হলে ও সেখানে চাঁদ দেখার কথা প্রমাণ ও ঘোষণা না হলে সে সঊদিয়ার ঘোষণা মতে রোযা-ঈদ করতে পারে না। যেমন সঊদিয়ার ইফতারীর সময় অনুসারে অন্য দেশের কেউ ইফতারী করতে পারে না। *(ফাসিঃ, মুসনিদ ২০পৃঃ)*

ফজরের পর চাঁদ হওয়ার খবর পেলে

যে ব্যক্তি রমযান মাস প্রবেশ (চাঁদ) হওয়ার কথা ফজরের পর দিনের কোন অংশে জানতে

পারে তার উচিত, (আগে কিছু খেয়ে থাকলেও) বাকী দিন পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা। কারণ, সে দিন হল রমযানের পহেলা তারীখ। আর রমযানের কোন দিনে কোন গৃহবাসী (অমুসাফির) সুস্থ মানুষের জন্য রোযা ভঙ্গকারী কোন জিনিস ব্যবহার করা বৈধ নয়।

কিন্তু তাকে কি ঐ দিনটি কাযা করতে হবে? এ ব্যাপারে উলামাদের মাঝে মতভেদ আছে। অধিকাংশ উলামা মনে করেন যে, তাকে ঐ দিনটি কাযা করতে হবে। কারণ, সে (পানাহার করেছে, তা না করলেও) (ফজরের আগে রাত্রি বা) দিনের শুরু থেকে রোযার নিয়ত করেনি। বরং দিনের কিছু অংশ তার বিনা নিয়তে অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর নিয়ত ছাড়া কিছু শুদ্ধ হয় না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক মানুষের তাই প্রাপ্য হয়, যার সে নিয়ত করে থাকে।" *(বুঃ ১, মুঃ ১৯০৭নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রাত্রি থেকে নিয়ত না করে থাকে, তার রোযা হয় না।" *(নাঃ, দারাঃ, বাঃ, ইগঃ ৯১৪, সজাঃ ৬৫৩৪, ৬৫৩৫নং)*

বলা বাহুল্য, এখানে রোযা বলতে ফরয রোযাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, নফল রোযার নিয়ত দিনের বেলায় করলেও হয়ে যায়। তবে শর্ত হল, ইতিপূর্বে সে যেন রোযা নষ্টকারী কোন জিনিস ব্যবহার না করে থাকে। (এ কথা নফল রোযার অধ্যায়ে বলা হবে ইন শাআল্লাহ।)

পক্ষান্তরে কিছু উলামা মনে করেন যে, ঐ দিন কাযা করা জরুরী নয়। কারণ, (যদি সে কোন রোযা নষ্টকারী জিনিস ব্যবহার করেই ফেলেছে, তাহলে) সে তো না জেনেই করেছে। আর যে না জেনে কিছু করে, তার না জানাটা একটা গ্রহণযোগ্য ওজর। *(যামাঃ ২/৭৪, সিসঃ ৬/২৫১)*

তবুও বলা যায় যে, কাযা করে নেওয়াটাই পূর্ব সতর্কতামূলক পদক্ষেপ এবং দায়মুক্ত হওয়ার শ্রেষ্ঠ পথ। যেহেতু মানুষের একটি দিন কাযা করে নেওয়া এবং নিঃসন্দেহে নিজের দায়িত্ব পালন করে নেওয়া সন্দেহে পড়া থেকে উত্তম। আর মহানবী ﷺ তো বলেছেনই, "যে জিনিস তোমাকে সন্দেহে ফেলে সে জিনিসকে বর্জন করে তুমি সেই জিনিস গ্রহণ কর, যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না।" *(আঃ, তিঃ, নাঃ, ইহিঃ, ত্বাবঃ, সজাঃ ৩৩৭৭-৩৩৭৮নং)* একটাই তো দিন; যা কাযা করা অতি সহজ এবং কোন কষ্ট নেই তাতে। বিশেষ করে তাতে রয়েছে সন্দেহের নিরসন, মনের শান্তি এবং হৃদয়ের সান্ত্বনা। *(মুমঃ ৬/৩৪৩, ৪৮ঃ ৩৭পৃঃ, ইবনে বায, ফাসিঃ মুসনিদ ১৯পৃঃ, মবঃ ৩০/১১৬)*

আমরা রমযান মাসকে কি দিয়ে স্বাগত জানাব?

রমযান এমন একটি মাস, যার রয়েছে এত এত বৈশিষ্ট্য, এত এত মাহাত্ম্য। এই মাসকে আমরা কি দিয়ে বরণ করব? কোন্ জিনিস দিয়ে তাকে 'খোশ আমদেদ' জানাব?

এই পবিত্র মাসকে স্বাগত জানাতে দুই রকম দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে;

প্রথম প্রকার মানুষ হল তারা; যারা এ মাস নিয়ে খুশী হয়, এর আগমনে আনন্দবোধ করে। তার কারণ, তারা এ মাসে রোযা রাখতে অভ্যাসী। এ মাসের সকল কষ্ট বরণ করতে প্রয়াসী। কারণ, তারা জানে যে, ইহকালের সুখ-সম্ভোগ বর্জন করলে, তা পরকালে পাওয়া যায়। কারণ, তারা উপলব্ধি করে যে, এ মাস হল আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের এবং তাঁর

নৈকট্যদাতা আমলে প্রতিযোগিতা করার বিশাল মৌসম। তারা জানে যে, আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ এ মাসে যে সওয়াব বান্দাকে প্রদান করবেন, তা আর অন্য কোন মাসে করবেন না। সুতরাং প্রিয় যেমন তার প্রবাসী প্রিয়তম বা তদপেক্ষা প্রিয়তর কিছুর আগমনে আনন্দ পায়, ঠিক তারই মত রমযানের আগমনে তাদের আনন্দিত হওয়াতে আশ্চর্যের কিছু নয়। এই হল প্রথম শ্রেণীর মানুষ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হল তারা, যারা এই পবিত্র মাসকে ভারী মনে করে, রোযার কষ্টকে বড় মনে করে। সুতরাং যখনই এ মাসের আগমন ঘটে, তখনই সে মনে করে তার ঘরে যেন এক অবাঞ্ছিত মেহেমান এল। ফলে শুরু থেকেই সে তার ঘন্টা, দিন ও রাত গুনতে থাকে। অধৈর্য হয়ে তার বিদায় মুহূর্তের অপেক্ষা করতে থাকে। এক একটা দিন পার হতেই তার আনন্দ হয়। পরিশেষে যখন ঈদ আসার সময় হয়, তখন এই মাস অতিবাহিত হওয়া নিকটবর্তী জেনে বড্ড খুশী হয়!

এই শ্রেণীর মানুষরা এই মহতিপূর্ণ মাসকে এই জন্য ভারী মনে করে এবং তাড়াতাড়ি অতিবাহিত হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে যে, তারা তাদের অবৈধ ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়া ছাড়াও পানাহার ও যৌনাচার ইত্যাদি সুখ-সম্ভোগে অধিকাধিক অভ্যাসী থাকে। আর সেই ভোগ-বিলাস ব্যবহার করার পথে এই মাস তাদের জন্য বাধা ও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এ মাস তাদের সুখ-উপভোগের প্রতিবন্ধক হিসাবে আগমন করে। যার ফলে তারা এই মাসকে প্রচন্ড ভারী বোধ করে থাকে।

আরো একটা কারণ এই যে, তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে বড় অমনোযোগী। এমন কি তাদের মধ্যে অনেকে ফরয ও ওয়াজেব আমলেও ঔদাস্য প্রদর্শন করে থাকে; যেমন তারা নামায পড়ে না। অতঃপর এই মাস প্রবেশ করলে কোন কোন আমল তারা করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু আসলে তারা ঐ আমলে অভ্যাসী নয়। যার ফলে রমযান মাসটিকেই ভারী মনে করে থাকে। *(দুরাঃ ৬-৮পৃঃ)*

বলা বাহুল্য, আল্লাহর নেক বান্দার জন্য উচিত, এই পবিত্র মাসকে সত্য ও খাঁটি তওবা দিয়ে; পাপ বর্জন করে এবং পুনরায় সে পাপ না করার পাক্কা সংকল্প নিয়ে খোশ-আমদেদ জানানো।

এই মাসকে আমরা স্বাগত জানাব, সর্বপ্রকার মন্দ কাজ থেকে বিরত হয়ে; মিথ্যাবাদিতা, গীবত, অশ্লীলতা, গান-বাজনা প্রভৃতি বর্জন করে।

এই মাসকে আমরা স্বাগত জানাব, কুরআন তেলাঅত, দুআ ও যিক্রের মাধ্যমে। আর কোন গাফলতির মাধ্যমে তাকে স্বাগত জানাব না।

একজন নেককার বলেছেন, 'আয়ু তো স্বল্প। সুতরাং গাফলতি দিয়ে তাকে আরো অল্প করে দিও না।' *(তাফাসাসাঃ ৬৫পৃঃ)*

এই মাসকে আমরা স্বাগত জানাব, অকৃত্রিম ও সুদৃঢ় সংকল্প, সুউচ্চ হিম্মত ও মনোবল দ্বারা, তার দিনগুলিকে সুবর্ণ সুযোগরূপে নেক কাজে ব্যবহার করার মাধ্যমে এবং তার পবিত্র সময়গুলিকে অযথা ব্যয় না করার মাধ্যমে।

এই মাসকে আমরা স্বাগত জানাব, আগ্রহ, স্ফূর্তি, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে, নির্মল

হৃদয়ে সুসংবাদ গ্রহণের সাথে এবং বেশী বেশী করে আমল ও ইবাদত করার প্রস্তুতি নিয়ে। সকল প্রকার আলস্য কাটিয়ে, অতিনিদ্রার অতি পরিহার করে এবং তার আগমনে বিরক্তিবোধ প্রদর্শন না করে।

আর এই মাসকে আমরা স্বাগত জানাব না, খেল-তামাশার মাধ্যমে; পার্ক, ময়দান বা রাস্তার ধারে বসে হাওয়া খেয়ে রাত্রি জাগরণ করে, অথবা তাস, কেরাম বা অন্য কোন খেলা খেলে, অথবা টিভি, ভিডিও, রেডিও বা অন্য কোন যন্ত্রের মাধ্যমে নোংরা ছবি দেখে ও গান-বাজনা শুনে, অথবা গাড়ি নিয়ে ফূর্তিবাজি করে, নাটক-যাত্রা বা ফিল্ম্ দেখে।

ভাই মুসলিম! এই পবিত্র মাসকে; এর দিন ও রাত্রির প্রতিটি মুহূর্তকে আপনার এক একটি সুবর্ণ সুযোগরূপে জ্ঞান করা উচিত। সুতরাং পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করতে, কল্যাণের ভান্ডার পরিপূর্ণ করতে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে কোন প্রকারের অবজ্ঞা প্রদর্শন করা উচিত নয়। অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী মানুষ কল্যাণের মৌসমসমূহকে হেলায় হারাতে চায় না। বরং সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং মহান প্রতিপালকের করুণা লাভের সকল কাজ করার চেষ্টায় থাকে। বিদায় দিনের জন্য পথের সম্বল সাথে করে নেয়। আর কে জানে ভাইজান! হয়তো বা এই বছরের মৃত মানুষদের রেজিষ্টারে আপনার নামটিও লিখা আছে! সুতরাং জলদি করুন, শীঘ্র করুন। এখনও সময় আছে, রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আমল শুরু করে দিন। *(দুরাঃ ১০৮পৃঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, রমযান মাস আগত হওয়ার সময় এক অপরকে মোবারকবাদ জানানো দোষাবহ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ সাহাবাগণকে রমযান মাস আগমনের সুসংবাদ দিতেন এবং তার প্রতি যত্ন নিতে অনুপ্রাণিত করতেন। *(৭০ঃ ১১নং)*

শা'বানের শেষ দুই বা একদিন রোযা রেখে রমযান বরণ করা

পূর্বসতর্কতামূলকভাবে রমযানের এক দিন আগে থেকে রোযা রাখা বৈধ নয়। কারণ, রমযানের রোযা চাঁদ দেখার সাপেক্ষে। সুতরাং এ ব্যাপারে নিজেকে ভারগ্রস্ত করা উচিত নয়।

হযরত আবূ হুরাইরা ؓ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যেন রমযানের আগে আগে একটি বা দুটি রোযা না রাখে। অবশ্য এমন ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যে সেই দিনের রোযা রাখায় অভ্যাসী। তার উচিত, সেদিনে রোযা রাখা।" *(আঃ, বুঃ ১৯১৪, মুঃ ১০৮২, সুআঃ)*

চতুর্থ অধ্যায়

রমযানের রোযায় মানুষের শ্রেণীভেদ

রমযানের রোযা প্রত্যেক সাবালক, জ্ঞানসম্পন্ন, সামর্থ্যবান, গৃহবাসী (অমুসাফির), সুস্থ ও সকল বাধা থেকে মুক্ত মুসলিম নরনারীর উপর ফরয। এই কথাকে ভিত্তি করে রমযানের রোযায় পৃথিবীর সকল মানুষ কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আর প্রত্যেক ভাগের রয়েছে

পৃথক পৃথক আহকাম ও মাসায়েল। আগামী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা সেই সব কথাই আলোচনা করব - ইন শাআল্লাহ।

(1) কাফের

কাফের বা অমুসলিমের জন্য রোযা এ দুনিয়ায় আদায়যোগ্য ওয়াজেব নয়। কেননা, সে রোযা রাখলেও তা শুদ্ধ হবে না এবং আল্লাহর দরবারে কবুলও হবে না। যেহেতু রোযা (অনুরূপ যে কোন ইবাদত) শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হল ইসলাম। (যেমন শর্ত হল ইখলাস ও মুহাম্মাদী তরীকা।) মহান আল্লাহ বলেন,

[illegible]

অর্থাৎ, ওদের অর্থ সাহায্য গ্রহণে বাধা কেবল এই ছিল যে, ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করে, নামাযে শৈথিল্যের সাথে হাজির হয় এবং একান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবেই দান করে। *(কুঃ ৯/৫৪)*

বলা বাহুল্য, দানের মত জিনিস; যার উপকার অপরের উপর বর্তে -তা যদি কবুল না হয়, তাহলে অন্যান্য ইবাদত বেশী কবুল না হওয়ার কথা।

কোন কাফের যদি রমযানের দিনে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে দিনের অবশিষ্টাংশ রোযা নষ্টকারী জিনিস হতে তাকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, মুসলিম হওয়ার সাথে সাথে রোযা তারও উপর ওয়াজেব হয়ে যায়। অবশ্য ইসলাম কবুল করার পূর্বে যে রোযা অতিবাহিত হয়ে গেছে তা আর কাযা করতে হবে না। কারণ, সে সময় তার উপর রোযা ওয়াজেব ছিল না। মহান আল্লাহ বলেন,

[illegible]

অর্থাৎ, কাফেরদেরকে বল, যদি তারা (কুফরী থেকে) বিরত হয়, তাহলে তাদের অতীতের পাপ মাফ করে দেওয়া হবে। *(কুঃ ৮/৩৮)*

আর যেহেতু লোকেরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে মুসলমান হত, অথচ তিনি তাঁদেরকে তাদের (ইসলামের পূর্বে) ছুটে যাওয়া নামায, যাকাত বা রোযা কাযা করতে আদেশ করতেন না।

কিন্তু মহান আল্লাহ কাল কিয়ামতে তা ত্যাগ করার জন্য এবং অনুরূপ দ্বীনের সকল ওয়াজেব কর্ম ত্যাগ করার জন্য কাফেরদেরকেও শাস্তি দেবেন। সেদিন মুমিনরা কাফেরদেরকে দোযখে যাওয়ার কারণ প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন করবে, সেই কথা মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে উল্লেখ করে বলেন,

[illegible]

অর্থাৎ, কিসে তোমাদেরকে সাকার (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা নামাযী ছিলাম না, মিসকীনকে আহার্য দান করতাম না, অন্যায় আলোচনাকারীদের সাথে

আলোচনায় যোগ দিতাম এবং কিয়ামতের দিনকে মিথ্যা মনে করতাম। *(কুঃ ৭৪/৪২-৪৬)* *(মুমঃ ৬/৩৩১-৩৩২, ফারারাঃ ৮৬পৃঃ, ইবনে উষাইমীন ফাসিঃ মুসনিদ ২৬পৃঃ)*

মুসলিম রোযাদারদের সামনে অমুসলিমদের রমযানের দিনে পানাহার করায় কোন ক্ষতি নেই। কেননা, তাতে রোযাদার মুসলিম আল্লাহ আযযা অজাল্লার প্রশংসা করবে যে, তিনি তাকে ইসলামের প্রতি পথপ্রদর্শন করেছেন; যে ইসলামে রয়েছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ। (তাদেরকে দেখে) আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবে যে, তিনি তাদের ঐ (ভ্রষ্টতার) আপদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন; যারা তাঁর হেদায়াতের আলো গ্রহণ করেনি। আর বিদিত যে, মুসলিমের জন্য যদিও এ দুনিয়াতে রমযানের দিনে শরীয়তের আইন অনুযায়ী পানাহার করা নিষিদ্ধ, কিন্তু কিয়ামতের দিন সে তার উপযুক্ত বিনিময় প্রাপ্ত হবে। সেদিন তাকে বলা হবে,

([illegible])

অর্থাৎ, তোমরা পার্থিব জীবনে ভালো কাজ করেছিলে তারই কারণে (আজ) তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। *(কুঃ ৬৯/২৪)*

অবশ্য সাধারণ স্থানে অমুসলিমদেরকে প্রকাশ্যভাবে পানাহার করতে বারণ করতে হবে। কারণ, তা ইসলামী রাষ্ট্রের পরিবেশের প্রতিকূল। *(৪৮ঃ ৫০-৫১পৃঃ)*

(2) নামায-ত্যাগী

যে ব্যক্তি নামায ফরয হওয়ার কথা অস্বীকার করে এবং ইচ্ছাকৃত তা ত্যাগ করে সে ব্যক্তি উলামাদের সর্বসম্মতভাবে কাফের। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবহেলায় অলসতার দরুন নামায ত্যাগ করে, সে ব্যক্তিও উলামাদের শুদ্ধ মতানুসারে কাফের। মহানবী ﷺ বলেন, “মানুষ এবং কুফর ও শির্কের মাঝে (অন্তরাল) নামায ত্যাগ।” *(মুসলিম ৮২নং)* তিনি আরো বলেন, “আমাদের মাঝে ও ওদের মাঝে চুক্তিই হল নামায। যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করে সে কাফের।” *(আঃ, তিঃ ২৬২১, ইমাঃ ১০৭৯নং, হাঃ, ইহিঃ, সতাঃ ৫৬১নং)*

এখানে কাফের বা কুফ্র বলতে সেই কুফ্রকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। যেহেতু মহানবী ﷺ নামাযকে মুমিন ও কাফেরদের মাঝে অন্তরাল বলে চিহ্নিত করেছেন। আর এ কথা বিদিত যে, কুফ্রীর মিল্লত ইসলামী মিল্লত থেকে ভিন্নতর। সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ চুক্তি পালন না করবে সে কাফেরদের একজন। *(ইবনে উষাইমীন, হুতাসাঃ ৯পৃঃ)*

আব্দুল্লাহ বিন শাক্বীক্ব উকাইলী বলেন, ‘নবী ﷺ -এর সাহাবাবৃন্দ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না।’ *(তিঃ ২৬২২, হাঃ, সতাঃ ৫৬২নং)*

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি কাফের প্রতীয়মান হবে সে ব্যক্তির রোযা ও সকল প্রকার ইবাদত পন্ড হয়ে যাবে। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, তারা যদি শির্ক করত, তাহলে তাদের কৃতকর্ম পন্ড হয়ে যেত। *(কুঃ ৬/৮৮)*

তদনুরূপ সেই সকল রোযাদার যারা কেবল রমযান মাসে নামায পড়ে এবং বাকী ১১ মাস নামায পড়ে না, তারা আসলে আল্লাহকে ধোকা দেয়। কত নিকৃষ্ট সেই জাতি, যে জাতি নিজ

পালনকর্তা আল্লাহকে কেবল রমযান মাসেই চিনে; অন্য মাসে চিনে না। এই শ্রেণীর লোকেদের অরমযানে নামায না পড়ার কারণেই রোযাও শুদ্ধ হবে না।

তবে তারা রোযা ছাড়তে আদিষ্ট বা উপদিষ্ট নয়। কেননা, রোযা রাখলে তাদের জন্য মঙ্গলেরই আশা করা যায়। এতে তারা দ্বীনের নৈকট্য পেতে প্রয়াস পাবে। তাদের হৃদয়ে যে আল্লাহভীতিটুকু আছে তার মাঝেই আশা করা যায় যে, তারা তওবা করে ১২ মাস নামায পড়াও ধরবে। *(স্থায়ী উলামা কমিটি, ফাসিঃ মুসনিদ ২৮-২৯পৃঃ)*

(৩) শিশু

নাবালক ছোট শিশুর জন্য রোযা ফরয নয়। মহানবী ﷺ বলেন, “তিন ব্যক্তি নিকট থেকে (পাপ লিখার) কলম তুলে নেওয়া হয়েছে; জ্ঞানশূন্য পাগলের নিকট থেকে; যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তির নিকট থেকে; যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়েছে। আর শিশুর নিকট থেকে; যতক্ষণ না সে সাবালক হয়েছে।” *(আঃ, আদাঃ, তিঃ, ইমাঃ, হাঃ, সজাঃ ৩৫১২-৩৫১৪নং)*

অবশ্য জ্ঞানবান শিশু রোযা রাখলে শুদ্ধ হবে এবং সওয়াবও পাবে। আর তার পিতা-মাতার জন্যও রয়েছে তরবিয়ত ও ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়ার সওয়াব।

সুতরাং অভিভাবকদের উচিত, রোযা রাখতে সক্ষম ছোট শিশুদেরকে রোযা রাখতে আদেশ করা, উৎসাহ দিয়ে তাদেরকে এই বিরাট ইবাদতে অভ্যাসী করা এবং তার জন্য উদ্বুদ্ধকারী পুরস্কার ও উপহার নির্ধারিত করা। মহানবী ﷺ-এর সাহাবাগণ নিজ নিজ ছোট বাচ্চাদেরকে রোযা রাখতে আদেশ দিতেন। রুবাইয়ে’ বিন্তে মুআওবিয ؓ বলেন, আশূরার সকালে আল্লাহর রসূল ﷺ মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত আনসারদের মহল্লায় বলে পাঠালেন যে, “যে ব্যক্তি ফজরের আগে থেকেই রোযা রেখেছে, সে যেন তার রোযা পূরণ করে। আর যে ব্যক্তির রোযা না রেখে ফজর হয়েছে, সেও যেন বাকী দিন রোযা রাখে।” সুতরাং আমরা তার পর থেকে রোযা রাখতাম। আমাদের ছোট শিশুদেরকে -আল্লাহর ইচ্ছায়- রোযা রাখাতাম এবং তাদেরকে নিয়ে মসজিদে যেতাম। তাদের জন্য তুলো দ্বারা পুতুল গড়তাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদতে লাগলে তাকে ঐ পুতুল দিতাম। আর এইভাবে ইফতারের সময় হয়ে যেত। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমরা তাদেরকে ঐ খেলনা দিতাম, যাতে তারা ভুলে থাকে এবং খেলার ঘোরে তাদের রোযা পূর্ণ করতে পারে। *(মুঃ ১১৩৫নং)*

শিশু (স্বপ্নদোষ হয়ে) দিনের ভিতরে সাবালক হলে দিনের বাকী অংশ রোযা নষ্টকারী জিনিস থেকে বিরত হবে। কারণ, এক্ষণে তার জন্য রোযা ফরয। অবশ্য এর পূর্বের রোযাগুলো কাযা রাখতে হবে না। কেননা, পূর্বে তার উপর রোযা ফরয ছিল না। *(৭০ঃ ১২নং)*

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তিনটির মধ্যে একটি লক্ষণ দেখে সাবালক চেনা যায়; স্বপ্নদোষ বা অন্য প্রকারে সকাম বীর্যপাত হওয়া, নাভির নীচে মোটা লোম গজানো, অথবা ১৫ বছর বয়স হওয়া।

আর বালিকাদের ক্ষেত্রে একটি অধিক লক্ষণ হল, মাসিক শুরু হওয়া। বলা বাহুল্য, বালিকার মাসিকের খুন আসতে শুরু হলেই সে সাবালিকা; যদিও তার বয়স ১০ বছর হয়।

(মুমঃ ৬/৩৩৩, ফারারাঃ ৮৭পৃঃ, ফুসিতাযাঃ ৫পৃঃ)

(৪) পাগল

পাগলের উপর রোযা ফরয নয়। কারণ, তার উপর থেকে কলম তুলে নেওয়া হয়েছে; যেমন পূর্বোক্ত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপ আধ-পাগলা, যার ভালো-মন্দের তমীয নেই এবং অনুরূপ স্থবির বৃদ্ধ, যার তমীয-জ্ঞান নষ্ট হয়ে গেছে। এ সকল জ্ঞানহীন মানুষদের তরফ থেকে খাদ্যদানও ওয়াজেব নয়। *(ইবনে উষাইমীন, ফাসিঃ ৫৯পৃঃ)*

পাগল দিনের ভিতরে সুস্থ হলে তার জন্য দিনের বাকী অংশ রোযা নষ্টকারী জিনিস থেকে বিরত হওয়া জরুরী। কারণ, এক্ষণে তার জন্য রোযা ফরয। অবশ্য এর পূর্বের রোযাগুলো কাযা রাখতে হবে না। কেননা, পূর্বে তার উপর রোযা ফরয ছিল না।

পাগলের উপর থেকে (পাপের) কলম তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাগল যদি এমন হয় যে, ক্ষণে পাগল ক্ষণে ভালো, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য ভালো থাকা অবস্থায় রোযা নষ্টকারী জিনিস থেকে বিরত থাকা জরুরী। আর পাগল থাকা অবস্থায় তা ধর্তব্য নয়। পক্ষান্তরে ভালো থাকা অবস্থায় রোযা রেখে দিনে হঠাৎ পাগল হয়ে গেলে তার রোযা বাতিল নয়। যেমন কেউ যদি কোন রোগ বা আঘাত ইত্যাদির কারণে বেহুঁশ বা অজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে তার রোযাও নষ্ট হয় না। কেননা, সে জ্ঞান থাকা অবস্থায় রোযার নিয়ত করেছে, অতএব অজ্ঞান হলেও সে নিয়ত নষ্ট হবে না। এই বিধান মূর্ছা, হিষ্টিরিয়া বা জিন পাওয়া রোগীরও।

যদি কেউ রোযা রাখার ফলে (ক্ষুধার তাড়নায়) বেহুঁশ হয়ে যায়, তাহলে সে রোযা ভেঙ্গে কাযা করতে পারে। দিনের বেলায় কেউ বেহুঁশ হলে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে কিংবা পরে হুঁশ ফিরে এলে তার রোযা শুদ্ধ। যেহেতু সে ভোরে ভালো অবস্থায় রোযা রেখেছে। অবশ্য যদি কেউ ফজর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বেহুঁশ থাকে, তাহলে অধিকাংশ উলামার মতে তার রোযা শুদ্ধ নয়। কিন্তু অধিকাংশ উলামার মতে সে রোযার কাযা করতে হবে; তাতে বেহুঁশ থাকার সময় যতই বেশী হোক না কেন। *(৭০ঃ ২৬নং, মুমঃ ৬/৩৬৫)*

কোন কোন আহলে ইল্মের ফতোয়া মতে যে ব্যক্তি বেহুঁশ হয়ে থাকে বা (হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হওয়ার ফলে) কিছুকাল নিস্পন্দ থাকে, অথবা নিজের কোন মঙ্গলের জন্য জ্ঞানশূন্যকারী ওষুধ ব্যবহার করে অচেতন থাকে এবং তা যদি ৩ দিনের কম হয় তাহলে সে ঐ বেহুঁশ বা অচেতন থাকার দিনগুলো কাযা করবে; যেমন কেউ ঘুমিয়ে থেকে নামায নষ্ট করলে তাকে কাযা করতে হয়। পক্ষান্তরে ৩ দিনের বেশী হলে কাযা করতে হবে না; যেমন পাগলকে কাযা করতে হয় না। *(৭০ঃ ২৬নং)*

ঘুমন্ত ব্যক্তি যদিও তার উপর থেকে কলম তুলে নেওয়া হয়ে থাকে, তবুও তার রোযা শুদ্ধ, তাকে আর কাযা করতে হবে না; যদিও সে সারাটি দিন ঘুমিয়ে থাকে। কারণ, ঘুম হল স্বাভাবিক কর্ম। আর তাতে সার্বিকভাবে অনুভূতি নষ্ট হয় না। *(মুমঃ ৬/৩৬৬, আসাইঃ ৬৩পৃঃ)*

(৫) অক্ষম ব্যক্তি

১। বৃদ্ধ ও স্থবির বা অথর্ব ব্যক্তি, যার শারীরিক ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং দিনের দিন আরো খারাপের দিকে যেতে যেতে মরণের দিকে অগ্রসর হতে চলেছে, সে ব্যক্তির জন্য রোযা ফরয নয়। কষ্ট হলে সে রোযা রাখবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। *(কুঃ ২/ ১৮৪)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলতেন, এই আয়াত মনসূখ নয়। তারা হল অথর্ব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয়। তারা প্রত্যেক দিনের বদলে একটি করে মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। *(বুঃ ৪৫০৫নং)*

অবশ্য এমন বৃদ্ধ, যার কোন জ্ঞানই নেই, তার জন্য এবং তার পরিবারের জন্য কোন কিছু ফরয নয়। তার তরফ থেকে রোযা রাখতে বা কাযা করতেও হবে না এবং মিসকীনও খাওয়াতে হবে না। কারণ, শরীয়তের সকল ভার তার পক্ষে মাফ হয়ে গেছে। কিন্তু সে যদি এমন বৃদ্ধ হয়, যে কখনো কখনো ভালো-মন্দের তমীয করতে পারে, আবার কখনো কখনো আবোল-তাবোল বকে, তাহলে যে সময় সে ভালো থাকে সেই সময় তার জন্য রোযা বা খাদ্যদান ফরয এবং যে সময় তমীয-জ্ঞান থাকে না সে সময় ফরয নয়। *(৭০ঃ ৩০নং)*

২। এমন চিররোগা, যার রোগ ভালো হওয়ার কোন আশা নেই; যেমন ক্যান্সারের রোগী (পেট খালি রাখলে পেটে যন্ত্রণা হয়) এমন রোগা ব্যক্তির জন্য রোযা ফরয নয়। কারণ, তার এমন কোন সময় নেই, যে সময়ে সে তা রাখতে পারে। অতএব তার তরফ থেকে একটি রোযার পরিবর্তে একটি করে মিসকীন খাওয়াতে হবে। *(ইবনে উষাইমীন, ফুসিতাযাঃ ৯পৃঃ)*

❖ খাদ্যদানের নিয়মঃ

মিসকীনকে খাদ্যদানের ২টি নিয়ম আছেঃ-

প্রথম এই যে, এক দিন খাবার তৈরী করে রোযার সংখ্যা হিসাবে মিসকীন ডেকে খাইয়ে দেবে। (অথবা এক জন মিসকীনকেই ঐ পরিমাণ দিন খাইয়ে দেবে।) হযরত আনাস ﷺ বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাই করতেন। তিনি এক অথবা দুই বছর রোযা রাখতে না পারলে প্রত্যহ মিসকীনকে গোশ্ত-রুটী খাইয়েছেন। *(বুঃ ৯২৮-৯২৯নং)*

দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, অপক্ক খাদ্য দান করবে। অর্থাৎ, দেশের প্রধান খাদ্য থেকে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে প্রত্যেক মিসকীনকে মোটামুটি সওয়া এক কিলো করে খাদ্য (চাল অথবা গম) দান করবে। যেহেতু কা'ব বিন উজরার ইহরাম অবস্থায় মাথায় উকুন হলে মহানবী ﷺ তাঁকে বলেন, "তোমার মাথা মুন্ডন করে ফেল এবং তিন দিন রোযা রাখ, কিংবা প্রত্যেক মিসকীনকে মাথাপিছু অর্ধ সা' (মোটামুটি সওয়া এক কিলো) করে ছয়টি

মিসকীনকে খাদ্য দান কর, কিংবা একটি ছাগ কুরবানী কর।” *(বুখারী ১৮১৬, মুসলিম ১২০১নং)*

অবশ্য সেই সাথে কিছু গোশ্ত্ বা কোন তরকারীও মিসকীনকে দান করা উচিত। যাতে মহান আল্লাহর এই বাণীর পরিপূর্ণ আনুগত্য সম্ভব হয়;

(([illegible]))

অর্থাৎ, যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। *(কুঃ ২/১৮৪)*

খাদ্য দান কখন করবে -সে ব্যাপারে এখতিয়ার আছে। যদি প্রত্যেক দিন একটা করে রোযার ফিদ্য়া দান করে, তাও চলবে। যদি মাসের শেষে সব দিনগুলি হিসাব করে একই দিনে তা দান করে, তাও চলবে। এ ব্যাপারে বাধ্য-বাধকতা কিছু নেই। তবে রোযার আগেই দেওয়া চলবে না। কারণ, তা আগে রোযা রাখার মত হয়ে যাবে। আর রমযানের আগে শা’বানে কি ফরয রোযা রাখা চলবে? *(মুমঃ ৬/৩৩৫)*

সমস্ত খাদ্যকে রোযার সংখ্যা পরিমাণ মিসকীনের মাঝে বন্টন করা যাবে। যেমন সমস্ত খাদ্য কেবল উপযুক্ত একজন মিসকীন অথবা একটি মাত্র মিসকীন পরিবারকেও দেওয়া যাবে। *(ইবনে জিবরীন, ফাসিঃ জিরাইসী ৩২পৃঃ)*

৩। যে ব্যক্তির রোগ সাময়িক, যা সেরে যাওয়ার আশা আছে; যেমন জ্বর ইত্যাদি, এমন ব্যক্তির ৩ অবস্থা হতে পারে ঃ

(ক) রোযা রাখলে তার কষ্ট হবে না বা রোযা তার কোন ক্ষতি করবে না। এমন অবস্থায় তার জন্য রোযা রাখা ওয়াজেব। কারণ, তার কোন ওজর নেই।

(খ) রোযা রাখলে তার কষ্ট হবে, কিন্তু রোযা তার কোন ক্ষতি করবে না। এমন অবস্থায় তার জন্য রোযা রাখা মকরূহ। কারণ, তাতে আল্লাহর দেওয়া অনুমতি ও তার আত্মার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা থেকে ভিন্ন আচরণ হয়ে যায়। অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ বা মুসাফির হলে সে অপর কোন দিন গণনা করবে। *(কুঃ ২/১৮৪)*

(গ) রোযা রাখলে রোযা তার ক্ষতি করবে। (রোগ বৃদ্ধি করবে, অথবা কোন বড় রোগ আনয়ন করবে, অথবা তার অবস্থা মরণাপন্ন হয়ে যাবে।) এমতাবস্থায় তার জন্য রোযা রাখা হারাম। কেননা, নিজের উপর ক্ষতি ডেকে আনা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল। *(কুঃ ৪/২৯)*

তিনি আরো বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। *(কুঃ ২/১৯৫)*

হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, “কেউ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং অপরেরও ক্ষতি করবে না।” *(আঃ, ইমাঃ, হাঃ, বাঃ, দারাঃ, সিসঃ ২৫০নং)*

রোযা রোযাদারকে ক্ষতি করছে কি না তা জানা যাবে, রোযাদারের নিজে নিজে ক্ষতি

অনুভব করার মাধ্যমে অথবা বিশ্বস্ত কোন ডাক্তারের ফায়সালা অনুযায়ী।

এই শ্রেণীর রোগী যে দিনের রোযা ত্যাগ করবে, সেই দিনের রোযা পরবর্তীতে সুস্থ হলে অবশ্যই কাযা করবে। আর এমন রোগীর তরফ থেকে মিসকীনকে খাদ্যদান যথেষ্ট নয়। *(মুমঃ ৬/৩৩৬-৩৩৮, ফুসিতাযাঃ ৯-১০পৃঃ)*

শেষোক্ত প্রকার কোন রোগী যদি কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করেও রোযা রাখে, তাহলেও তার রোযা শুদ্ধ ও যথেষ্ট হবে না। বরং তাকে সুস্থ অবস্থায় কাযা করতে হবে। *(মুহাল্লা ৬/২৫৮)* কারণ, ঐ সময় তার জন্য রোযা রাখা নিষিদ্ধ। যেমন তাশরীক ও ঈদের দিনগুলিতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ; যা রাখা বৈধ নয় এবং রাখলে শুদ্ধও নয়।

এখান থেকে কিছু মুজতাহিদ রোগীদের ভ্রান্ত ফায়সালার কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যারা রোযা তাদের জন্য কষ্টকর ও ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও তা কাযা করতে চায় না। আমরা বলি যে, তারা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। তারা মহান আল্লাহর দান গ্রহণ করে না, তাঁর দেওয়া অনুমতি কবুল করে না এবং নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অথচ তিনি বলেন, "তোমরা আত্মহত্যা করো না।" *(মুমঃ ৬/৩৫৩)*

পক্ষান্তরে রোগ হাল্কা হলে; যেমন সর্দি-কাশি, মাথা ধরা, গা ব্যথা ইত্যাদি হলে তার ফলে রোযা ভাঙ্গা জায়েয নয়। অবশ্য যদি কোন ডাক্তারের মাধ্যমে, অথবা নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, অথবা প্রবল ধারণা মতে জানতে পারে যে, রোযা রাখলে তার রোগ বৃদ্ধি পাবে, অথবা ভালো হতে দেরী হবে, অথবা অন্য রোগ আনয়ন করবে, তাহলে তার জন্য রোযা না রাখা এবং পরে কাযা করে নেওয়া বৈধ। বরং এ ক্ষেত্রে রোযা রাখা মকরূহ।

আর দিবারাত্র লাগাতার রোগ থাকলে রোগীর জন্য রাতে রোযার নিয়ত করা ওয়াজেব নয়; যদিও সকালে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেহেতু সে ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতিই বিচার্য।

(৬) গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলা

গর্ভবতী অথবা দুগ্ধদাত্রী মহিলা রোযা রাখার দরুন যদি নিজেদের কষ্ট হয় অথবা তাদের শিশুর ক্ষতির আশঙ্কা করে, তাহলে উভয়ের জন্য রোযা না রেখে যখন সহজ হবে অথবা ক্ষতির আশঙ্কা দূর হবে তখন রোযা কাযা করে নেওয়া বৈধ। *(ইবনে উষাইমীন, ফাসিঃ ৫৯পৃঃ)*

বলা বাহুল্য, (কিছু উলামার নিকট) গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলাকে রোগীর উপর কিয়াস করাই সঠিক। সুতরাং রোগীর মত তাদের জন্য রোযা না রাখা বৈধ এবং তাদের জন্য সময় মত কাযা ছাড়া অন্য কিছু ওয়াজেব নয়। এতে তারা নিজেদের ক্ষতির আশঙ্কা করুক অথবা তাদের শিশুদের। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে (যথাসময়ে) রোযা এবং অর্ধেক নামায, আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলার উপর থেকে (যথাসময়ে) রোযা লাঘব করেছেন।" *(আঃ ৪/৩৪৭, আদাঃ ২৪০৮, তিঃ ৭১৫, নাঃ ২২৭৬, ইমাঃ ১৬৬৭, সজাঃ ১৮৩৫নং)*

উপরোক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, তারা রমযানে রোযা না রেখে সময় মত কাযা করতে পারে। রোযা একেবারেই মাফ নয়। *(মুমঃ ৬/৩৬২)*

পক্ষান্তরে যাঁরা তাদের জন্য কাযা করার সাথে সাথে মিসকীনকে খাদ্যদানেরও কথা বলে থাকেন, তাঁদের কথার উপর কিতাব ও সুন্নাহর কোন দলীল নেই। আর মূল হল দায়িত্বে কিছু

Contents

না থাকা, যতক্ষণ না দায়িত্ব আসার সপক্ষে কোন দলীল কায়েম হয়েছে। *(ইবনে উষাইমীন, ফাসিঃ মুসনিদ ৬৬পৃঃ)*

কোন কোন আহলে ইল্‌ম এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলার জন্য (চিররোগা ও অক্ষম বৃদ্ধের মত) কেবল খাদ্যদানই ওয়াজেব; কাযা ওয়াজেব নয়। এ মত পোষণ করেছেন ইবনে আব্বাস, ইবনে উমার ও সাঈদ বিন জুবাইর। ইবনে আব্বাস এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলেন, 'ওরা প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একটি করে মিসকীন খাওয়াবে; রোযা কাযা করবে না।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, একদা তিনি তাঁর ক্রীতদাসী স্ত্রীকে গর্ভ বা দুধ দান করা অবস্থায় দেখে বললেন, 'তুমি অক্ষম ব্যক্তির মত। তোমার জন্য প্রত্যেক রোযার বিনিময়ে একটি করে মিসকীন খাওয়ানো ওয়াজেব। তোমার জন্য কাযা ওয়াজেব নয়।' *(ইগঃ ৪/১৭-২৫ দ্রঃ)*

তিনিই মহান আল্লাহর এই বাণী "যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। *(কুঃ ২/১৮৪)* এর তফসীরে বলেছেন, 'আর গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মহিলা রোযা রাখতে ভয় করলে রোযা না রেখে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে একটি করে মিসকীন খাওয়াবে।' সুতরাং স্পষ্ট উক্তির বর্তমানে কিয়াসের কোন প্রয়োজন নেই।

অবশ্য ইবনে আব্বাসের এই মত সেই মহিলার জন্য প্রযোজ্য, যে মহিলা প্রত্যেক দুই-আড়াই বছর পর পর সন্তান ধারণ করে। কারণ, এই শ্রেণীর মহিলা কাযা করার ফুরসতই পাবে না। যে কোন সময়ে হয় সে গর্ভবতী থাকবে, নচেৎ দুগ্ধদায়িনী। আর গর্ভ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তার রোযা রাখার সুযোগই হয়ে উঠবে না। অতএব সে মিসকীনকে খানা খাইয়ে দেবে এবং তার জন্য রোযা মাফ। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

(৭) রোযা ভাঙ্গতে বাধ্য ব্যক্তি

কোন মৃত্যু-কবলিত মানুষকে আগুন, পানি বা ধ্বংসস্তুপ থেকে বাঁচাতে যদি কোন রোযাদারকে রোযা ভাঙ্গতে হয় এবং সে ছাড়া অন্য কোন রোযাহীন লোক না পাওয়া যায়, তাহলে প্রাণ রক্ষার জন্য তার পক্ষে রোযা ভাঙ্গা ওয়াজেব। অবশ্য সে ঐ দিনটিকে পরে কাযা করতে বাধ্য। *(ফাতাওয়া শায়খ ইবনে উষাইমীন ৬০পৃঃ)*

তবে এ ব্যাপারে প্রশস্ততা বৈধ নয়। বরং কেবল অতি প্রয়োজনীয় ও একান্ত নিরুপায়ের ক্ষেত্রে দরকার মোতাবেক এ অনুমোদন প্রয়োগ করা উচিত। বিশেষ করে যাঁরা ফায়ার ব্রিগেডে কাজ করেন, তাঁদের জন্য একান্ত কঠিন কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়া রোযা ভাঙ্গা বৈধ নয়। অন্যথা কোন আগুন নিভাতে যাওয়াই তাঁদের জন্য রোযা ভাঙ্গা বৈধ করতে পারে না। *(ফারারাঃ ১৮৯পৃঃ)*

যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় প্রচন্ড ক্ষুধা অথবা পানি-পিপাসায় কাতর হয়ে প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা করে, অথবা ভুল ধারণায় নয়, বরং প্রবল ধারণায় বেহুশ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে, সে ব্যক্তি রোযা ভেঙ্গে প্রয়োজন মত পানাহার করতে পারে। তবে সে রোযা তাকে পরে কাযা করতে হবে। কারণ, জান বাঁচানো ফরয। আর মহান আল্লাহ বলেন,

Contents

"তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।" *(কুঃ ২/১৯৫)* "তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল।" *(কুঃ ৪/২৯)*

কোন ধারণাপ্রসূত কষ্ট, ক্লান্তি অথবা রোগের আশঙ্কায় রোযা ভাঙ্গা বৈধ নয়।

যারা কঠিন পরিশ্রমের কাজ করে তাদের জন্যও রোযা ছাড়া বৈধ নয়। এ শ্রেণীর লোকেরা রাত্রে রোযার নিয়ত করে রোযা রাখবে। অতঃপর দিনের বেলায় কাজের সময় যদি নিশ্চিত হয় যে, কাজ ছাড়লে তাদের ক্ষতি এবং কাজ করলে তাদের প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তাহলে তাদের জন্য রোযা ভেঙ্গে কেবল ততটুকু পানাহার বৈধ হবে, যতটুকু পানাহার করলে তাদের জান বেঁচে যাবে। অতঃপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর পানাহার করবে না। অবশ্য রমযান পরে তারা ঐ দিনটিকে কাযা করতে বাধ্য হবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর সাধারণ বিধান হল,

([illegible])

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সাধ্যের অতীত ভার অর্পণ করেন না। *(কুঃ ২/২৮৬)*

([illegible]) ([illegible])

অর্থাৎ, আল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। *(কুঃ ৫/৬, ২২/৭৮)*

বলা বাহুল্য, উঁট বা ছাগল-ভেঁড়ার রাখাল রৌদ্রে বা পিপাসায় যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে যতটুকু পরিমাণ পানাহার করা দরকার ততটুকু করে বাকী দিনটুকু সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাকবে। অতঃপর রমযান বিদায় নিলে ঐ দিনটি কাযা করবে। আর এর জন্য কোন কাফ্ফারা নেই। *(মবঃ ২৪/৬৭, ১০০, ফাসিঃ মুসনিদ ১০১-১০২পৃঃ)*

অনুরূপ বিধান হল চাষী ও মজুরদের। *(ফাসিঃ মুসনিদ ৬১পৃঃ)*

পক্ষান্তরে যাদের প্রাত্যহিক ও চিরস্থায়ী পেশাই হল কঠিন কাজ; যেমন পাথর কাটা বা কয়লা ইত্যাদির খনিতে যারা কাজ করে এবং যারা আজীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত, তারা রোযা রাখতে অপারগ হলে তথা অস্বাভাবিক কষ্ট অনুভব করলে রোযা না রাখতে পারে। তবে তাদের জন্য (তাদের পরিবার দ্বারা) ফিদ্য়া আদায় (একটি রোযার বদলে একটি মিসকীনকে খাদ্য দান) করা জরুরী। অবশ্য এ কাজ সম্ভব না হলে তাও তাদের জন্য মাফ। *(আসাইঃ ১২২পৃঃ)*

পরীক্ষার সময় মেহনতী ছাত্রদের জন্য রোযা কাযা করা বৈধ নয়। কারণ, এটা কোন এমন শরয়ী ওযর নয়, যার জন্য রোযা কাযা করা বৈধ হতে পারে। *(ইবনে বায, ফাসিঃ মুসনিদ ৮০পৃঃ, তাইঃ ৪৮পৃঃ)*

❖ দিন যেখানে অস্বাভাবিক লম্বা ঃ

যে দেশে দিন অস্বাভাবিকভাবে ২০/২১ ঘন্টা লম্বা হয়, সে দেশের লোকেদের জন্যও রোযা ত্যাগ করা অথবা সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করা বৈধ নয়। তাদের যখন দিন-রাত হয়, তখন সেই অনুসারে তাদের জন্য আমল জরুরী; তাতে দিন লম্বা হোক অথবা ছোট। কেননা, ইসলামী শরীয়ত সকল দেশের সকল মানুষের জন্য ব্যাপক। আর মহান আল্লাহ ঘোষণা হল,

([illegible])

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। *(কুঃ ২/১৮৭)*

কিন্তু যে ব্যক্তি দিন লম্বা হওয়ার কারণে, অথবা নিদর্শন দেখে, অভিজ্ঞতার ফলে, কোন বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মতে, কিংবা নিজের প্রবল ধারণা মতে এই মনে করে যে, রোযা রাখাতে তার প্রাণ নাশ ঘটবে, অথবা বড় রোগ দেখা দেবে, অথবা রোগ বৃদ্ধি পাবে, অথবা আরোগ্য লাভে বিলম্ব হবে, সে ব্যক্তি ততটুকু পরিমাণ পানাহার করবে যতটুকু পরিমাণ করলে তার জান বেঁচে যাবে অথবা ক্ষতি দূর হয়ে যাবে। অতঃপর রমযান বিদায় নিলে সুবিধা মত যে কোন মাসে ঐ দিনগুলো কাযা করে নেবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

[illegible]

([illegible])

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে। কিন্তু কেউ অসুস্থ বা মুসাফির হলে সে অপর কোন দিন গণনা করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তিনি তোমাদের জন্য কঠিন কিছু চান না। *(কুঃ ২/১৮৫)*

তিনি আরো বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সাধ্যের অতীত ভার অর্পণ করেন না। *(কুঃ ২/২৮৬)*

([illegible])

অর্থাৎ, আল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। *(কুঃ ৫/৬, ২২/৭৮)*

যে ব্যক্তি এমন দেশে বসবাস করে, যেখানে গ্রীষ্মকালে সূর্য অস্তই যায় না এবং শীতকালে উদয়ই হয় না, অথবা যেখানে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি থাকে, সে ব্যক্তির উপরেও রমযানের রোযা ফরয। সে ব্যক্তি নিকটবর্তী এমন কোন দেশের হিসাব অনুযায়ী রমযান মাসের শুরু ও শেষ, প্রাত্যহিক সেহরীর শেষ তথা ফজর উদয় হওয়ার সময় ও ইফতার তথা সূর্যাস্তের সময় নির্ধারণ করবে, যে দেশে রাত দিনের পার্থক্য আছে। অতএব সেখানেও ২৪ ঘন্টায় দিবারাত্রি নির্ণয় করতে হবে। মহানবী ﷺ কর্তৃক এ কথা প্রমাণিত যে, একদা তিনি সাহাবাবর্গকে দাজ্জাল প্রসঙ্গে কিছু কথা বললেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কতদিন পৃথিবীতে অবস্থান করবে?' উত্তরে তিনি বললেন, "চল্লিশ দিন; এক দিন এক বছরের সমান, একদিন এক মাসের সমান এবং একদিন এক সপ্তাহের সমান। বাকী দিনগুলো তোমাদের স্বাভাবিক দিনের মত।" তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! যে দিনটি এক বছরের মত হবে, সে দিনে কি এক দিনের (৫ অক্ত) নামায পড়লে যথেষ্ট হবে?' তিনি বললেন, "না। বরং তোমরা বছর সমান ঐ দিনকে স্বাভাবিক দিনের মত নির্ধারণ করে নিও।" *(মুঃ ২৯৩৭নং)*

বলা বাহুল্য, মহানবী ﷺ ঐ এক বছর সমান দিনকে একটি স্বাভাবিক দিন গণ্য করেন নি;

যাতে কেবল ৫ অক্ত নামায যথেষ্ট হবে। বরং তাতে প্রত্যেক ২৪ ঘন্টায় ৫ অক্ত নামায পড়া ফরয বলে ঘোষণা করেন। আর তাদেরকে তাদের স্বাভাবিক দিনের সময়ের দূরত্ব ও পার্থক্য হিসাব করে ঐ বছর সমান দিনকে ভাগ করতে আদেশ করেন। সুতরাং যে সকল মুসলিম সেই দেশে বাস করেন, যেখানে ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত লম্বা হয়, সেখানে তাঁরা তাঁদের নামাযের সময়ও নির্ধারণ করবেন। আর এ ব্যাপারে নির্ভর করবেন তাঁদের নিকটবর্তী এমন দেশের, যেখানে রাত-দিন স্বাভাবিকরূপে চেনা যায় এবং প্রত্যেক ২৪ ঘন্টায় শরয়ী চিহ্ন মতে ৫ অক্ত নামাযের সময় জানা যায়। আর তদনুরূপই রমযানের রোযা নির্ধারণ করতে হবে। কারণ, এ দিক থেকে রোযা ও নামাযের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। *(মবঃ ১৪/১২৬, ১৬/১১০, ২৫/১১, ২৯, ৩৪, ইবনে উষাইমীন ফাসিঃ মুসনিদ ৯৭-৯৮পৃঃ, ৪৮ঃ ৪৯পৃঃ)*

(৮) মুসাফির

মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে মুসাফিরের জন্য রোযা কাযা করা বৈধ; চাহে সে মুসাফির রোযা রাখতে সক্ষম হোক অথবা অক্ষম, রোযা তার জন্য কষ্টদায়ক হোক অথবা না হোক, অর্থাৎ মুসাফির যদি ছায়া ও পানির সকল সুবিধা নিয়ে সফর করে এবং তার সাথে তার খাদেমও থাকে অথবা না থাকে, (সফর এরোপ্লেনে হোক অথবা পায়ে হেঁটে); যেমনই হোক তার জন্য রোযা কাযা করা ও নামায কসর করা বৈধ। *(৭০ঃ ১৭পৃঃ)* মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ বা মুসাফির হলে সে অপর কোন দিন গণনা করবে। *(কুঃ ২/১৮৪)*

অবশ্য সফরে রোযা কাযা করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত রয়েছে ঃ-

১। সফর পরিমাণ মত দূরত্বের হতে হবে। অর্থাৎ এমন সফর হতে হবে, যাকে পরিভাষায় সফর বলা হয়। আর সঠিক মত এই যে, সফর চিহ্নিত করার জন্য কোন নির্দিষ্ট মাপের দূরত্ব নেই। এ ব্যাপারে প্রচলিত অর্থ ও পরিভাষার সাহায্য নিতে হবে। *(মুমঃ ৪/৪৯৭-৪৯৮)* তদনুরূপ স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্য না হলে নির্দিষ্ট দিন অবস্থান করার ব্যাপারে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। *(ঐ ৪/৫৩২-৫৩৭ দ্রঃ)* ইবনে উমার ﷺ আযারবাইজানে ৬ মাস থাকা কালে কসর করে নামায পড়েছেন। *(বাঃ ৩/১৫২, ইগঃ ৫৭৭, ৩/১৬, ইবনে উষাইমীন ফাসিঃ জিরাইসী ২৫পৃঃ)*

সুতরাং যে ব্যক্তি কোন স্থানে সফর করার পর কিছুকাল বাস করে, কিন্তু সে সেখানে স্থায়ী বসবাসের নিয়ত করে না; বরং যে উদ্দেশ্যে সফর করেছে সে উদ্দেশ্য সফল হলেই স্বগৃহে ফিরে যাওয়ার সংকল্প পোষণ করে, সে ব্যক্তি মুসাফির। সে মুসাফিরের সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন স্থানে সফর করার পর সে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, সে ব্যক্তিকে মুসাফির বলা যাবে না। সে হল প্রবাসী এবং তার জন্য রোযা কাযা করা জায়েয নয়। বরং তার জন্য রোযা রাখা ওয়াজেব। বলা বাহুল্য, যে ছাত্ররা বিদেশে পড়াশোনা করার উদ্দেশ্যে সফর করে নির্দিষ্ট কয়েক মাস বা বছর ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, সে ছাত্ররা

মুসাফির নয়। তাদের জন্য রোযা কাযা করা বৈধ নয়।

২। মুসাফির যেন নিজের গ্রাম বা শহরের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে গ্রাম বা শহরের বাইরে এসে রোযা ভাঙ্গে। হযরত আনাস ﷺ বলেন, 'আমি নবী ﷺ-এর সাথে (মক্কা যাওয়ার পথে) মদীনায় যোহরের ৪ রাকআত এবং (মদীনা থেকে ৬ মাইল দূরে) যুল-হুলাইফায় গিয়ে আসরের ২ রাকআত পড়তাম।' *(বুঃ ১০৮৯নং, মুঃ ৬৯০, আদাঃ, তিঃ, নাঃ)*

বলা বাহুল্য, সফর করতে শহর বা গ্রাম ত্যাগ করার পূর্ব থেকেই নামায কসর করা চলবে না। অনুরূপ রোযাও শহর বা গ্রাম সম্পূর্ণ ত্যাগ করার পূর্বে ভাঙ্গা চলবে না। কারণ, নিজ গ্রাম বা শহরের জনপদে থাকা অবস্থাকে সফর বলা যায় না এবং সফরকারীর জন্য মুসাফির নাম সার্থক হয় না। *(মুমঃ ৬/৩৫৮-৩৫৯)*

বুঝা গেল যে, মুসাফির যখন সফরের উদ্দেশ্যে নিজ গ্রাম বা শহরের আবাসিক এলাকা ত্যাগ করবে, তখনই তার জন্য রোযা ভাঙ্গা বৈধ হবে। তদনুরূপ এয়ারপোর্ট শহরের ভিতরে হলে এরোপ্লেন শহর ছেড়ে আকাশে উড়ে গেলে রোযা ভাঙ্গা বৈধ হবে। অবশ্য এয়ারপোর্ট শহরের বাইরে হলে সেখানে রোযা ভাঙ্গা বৈধ। আর শহরের ভিতরে হলে অথবা শহরের লাগালাগি হলে সেখানে রোযা ভাঙ্গা বৈধ নয়। কারণ, তখনও সফরকারী নিজ শহরের ভিতরেই থাকে।

যারা রমযান মাসে সফর করার ইচ্ছা করে এবং রোযা কাযা করতে চায় তাদের জন্য একটি সতর্কতার বিষয় এই যে, গ্রাম বা শহর ছেড়ে সফর করে না যাওয়া পর্যন্ত যেন তারা রোযা ভাঙ্গার নিয়ত না করে। কারণ, ভাঙ্গার নিয়ত করলে রোযা হবে না। আর নিয়তের পর যদি কোন প্রতিবন্ধকতা বা কারণবশতঃ সফর না করা হয়, তাহলে তার জন্য রোযা ভাঙ্গা বৈধ হবে না। *(৭০ঃ ১৮নং)*

৩। মুসাফিরের সফর যেন কোন অবৈধ কাজের জন্য না হয়। (অধিকাংশ উলামার মত এটাই।) কেননা পাপ-সফরে শরয়ী সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার অধিকার পাপী মুসাফিরের নেই। যেহেতু ঐ সুযোগ-সুবিধা হল ভারপ্রাপ্ত বান্দার উপর কিছু ভার সহজ ও হাল্কা করার নামান্তর। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করে হারাম কাজের জন্য সফর করে সে ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া ঐ সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার পেতে পারে না। *(মুমঃ ৪/৪৯২)*

৪। সফরের উদ্দেশ্য যেন রোযা না রাখার একটা বাহানা না হয়। কারণ, ছল-বাহানা করে আল্লাহর ফরয বাতিল হয় না। *(ফুসিতাযাঃ ১০পৃঃ)*

যে সফরে রোযা কাযা করার অনুমতি আছে সে সফর হজ্জ, উমরাহ, কোন আপনজনকে দেখা করার উদ্দেশ্যে কিংবা ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে সাময়িক হোক, অথবা (ভাড়া গাড়ির ড্রাইভারের মত) সার্বক্ষণিক হোক, তাতে কোন পার্থক্য নেই। বলা বাহুল্য, যে সর্বক্ষণ সফরে থাকে, তার যদি ফিরে এসে আশ্রয় নেওয়ার মত বাসভূমি থাকে, অর্থাৎ, (উড়িয়া যাযাবরদের মত) তার পরিবার-পরিজন তার সাথে না থাকে, যেমন; পিওন, যে মুসলিমদের ডাক বহন করার উদ্দেশ্যে সফর করে। যেমন, ভাড়া গাড়ির ড্রাইভার, ট্রেন বা প্লেনের পাইলট ও খালাসী-হোস্টেস ইত্যাদি - যদিও তাদের সফর প্রাত্যহিক হয়, তবুও তাদের জন্য রোযা কাযা করা বৈধ। অবশ্য এ রোযা তারা সময় মত পরিশোধ করতে বাধ্য হবে। তদনুরূপ পানি-

জাহাজের মাল্লা, যার স্থলে বাসস্থান আছে (অর্থাৎ, জাহাজই তার স্থায়ী বাসস্থান নয়), সেও কাযা করতে পারে।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তি সকলের কাজ যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন ও বিরতিহীন, সেহেতু তারা শীতকালে কাযা করে নিতে পারে। কারণ, শীতের দিন ছোট ও ঠান্ডা। সে সময় কাযা তুলতে কষ্ট হবে না। কিন্তু তারা যদি রমযান মাসে স্বগৃহে ফিরে আসে তাহলে সেখানে থাকা কালে তাদের জন্য রোযা রাখা জরুরী।

পক্ষান্তরে শহরের ভিতরে চলমান ট্রেন, বাস, ট্যাক্সি, অটো-রিক্সা প্রভৃতির ড্রাইভার মুসাফির নয়। কারণ, তারা সফরের দূরত্ব অতিক্রম করে না। তাই তাদের জন্য যথাসময়ে রোযা রাখা ওয়াজেব। *(মুমঃ ৪/৫৩৯-৫৪০, ফইঃ ২/১৪৪, ইবনে উষাইমীন ফাসিঃ মুসনিদ ৭৪পৃঃ)*

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সৈনিক ও মুজাহেদ সফরের সেই পরিমাণ দূরত্ব সফর করলে রোযা কাযা করতে পারে, যে পরিমাণ সফর করলে নামায কসর করা বৈধ। অবশ্য তারাও রমযান পরে কাযা তুলতে বাধ্য হবে। আর যদি তারা মুসাফির না হয়, বরং শত্রু তাদেরকে তাদের অবস্থান ক্ষেত্রে আক্রমণ করে, তাহলে যে জিহাদের সাথে রোযা রাখতে সক্ষম হবে তার জন্য রোযা রাখা ওয়াজেব। কিন্তু যে রোযা রাখার সাথে সাথে জিহাদের 'ফর্যে আইন' আদায় করতে সক্ষম নয়, তার জন্য কাযা করা বৈধ। তবে রমযান শেষ হওয়ার পর ছুটে যাওয়া রোযা অবশ্যই সে রেখে নেবে। *(ফইঃ ২/১৪১, ফাসিঃ মুসনিদ ৭৫পৃঃ, ইআইঃ ২৬পৃঃ)*

মুসাফিরের জন্য রোযা রাখা ভালো, না কাযা করা ভালো?

সফরে মুসাফিরের ৩ অবস্থা হতে পারে ঃ- [4]

১। রোযা তার জন্য কষ্টকর নয়। এমন অবস্থায় রোযা রাখা বা কাযা করার মধ্যে যেটা তার জন্য সহজ ও সুবিধা হবে, সেটাই সে করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তিনি তোমাদের জন্য কঠিন কিছু চান না। *(কুঃ ২/১৮৫)*

হামযাহ বিন আম্র আসলামী মহানবী ﷺ-কে সফরে রোযা রাখা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বললেন, "তোমার ইচ্ছা হলে তুমি রোযা রাখ, আর ইচ্ছা না হলে রেখো না।" *(বুঃ ১৯৪৩, মুঃ ১১২১নং)*

আবূ সাঈদ খুদরী ؓ বলেন, 'আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ১৭ই রমযান এক যুদ্ধ-সফরে ছিলাম। আমাদের মধ্যে কারো রোযা ছিল, কারো ছিল না। কিন্তু যার রোযা ছিল সে তার নিন্দা করেনি যার রোযা ছিল না এবং যার রোযা ছিল না সেও তার নিন্দা করেনি যার রোযা ছিল।' আর এক বর্ণনায় আছে, তাঁরা মনে করতেন যে, যার ক্ষমতা আছে, তার জন্য

(৪) *এই অবস্থাগুলির বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, মুমঃ ৬/৩৩৯, ৩৫৫-৩৫৬, ফুসিতাযাঃ ১০-১১পৃঃ, ফাসিঃ ইবনে উষাইমীন ১৮-২০পৃঃ, ফাসিঃ মুসনিদ ৭০-৭১পৃঃ)*

রোযা রাখা ভাল। আর যার দুর্বলতা আছে তার জন্য রোযা না রাখা ভাল। *(মুঃ ১১১৬নং)*

কিন্তু যদি উভয় এখতিয়ার সমান হয়; অর্থাৎ, রোযা রাখার উপর কাযা করাকে প্রাধান্য দেওয়ার মত কোন বৈশিষ্ট্য না থাকে এবং রোযা কাযা করার উপর রাখাকে প্রাধান্য দেওয়ার মত কোন বৈশিষ্ট্য না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় নিম্নে উল্লেখিত দলীলের ভিত্তিতে তার জন্য রোযা রাখাই উত্তম ঃ-

(ক) এটি হল আল্লাহর রসূল ﷺ-এর আমল। আবূ দারদা ؓ বলেন, 'আমরা এক রমযান মাসের কঠিন গরমের দিন (সফরে) ছিলাম। এমনকি আমাদের কেউ কেউ গরমের কারণে মাথায় হাত রেখেছিল। আর আমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল ﷺ এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ ছাড়া অন্য কারো রোযা ছিল না।' *(বুঃ ১৯৪৫, মুঃ ১১২২নং)*

(খ) রোযা রাখাতে সত্বর দায়িত্ব পালন হয়। কারণ, পরে কাযা করাতে বিলম্ব হয়। আর রমযানে রোযা রেখে নিলে আগে আগে ফরয আদায় হয়ে যায়।

(গ) মুসলিমের জন্য রমযানে রোযা রাখাটাই সাধারণতঃ বেশী সহজ। কেননা, পরে একাকী নতুন করে রোযা রাখার চাইতে লোকেদের সাথে রোযা ও ঈদ করে নেওয়াটাই বেশী সহজ। যেমন এ কথা সকলের নিকট পরীক্ষিত ও বিদিত।

(ঘ) রোযা রাখলে মাহাত্ম্যপূর্ণ সময় পাওয়া যায়; আর তা হল রমযান। পরন্তু রমযান হল অন্যান্য মাসের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। যেহেতু সেটাই হল রোযা ওয়াজেব হওয়ার সময়। *(মুমঃ ৬/৩৫৬)*

২। রোযা তার জন্য কষ্টকর, তবে বেশী নয়। বরং রোযা না রাখাটাই তার জন্য সুবিধা ও আরামদায়ক। এমন অবস্থায় মুসাফিরের রোযা রাখা মকরূহ এবং রোযা না রাখা উত্তম। কারণ, অনুমতি থাকা সত্ত্বেও কষ্ট স্বীকার করার অর্থ হল, মহান আল্লাহর অনুমতিকে উপেক্ষা করা।

আবার সফরে কখনো রোযা না রাখাটা উত্তম ও অধিক সওয়াব লাভের কারণ হতে পারে; যদি মুসাফির কোন কর্ম-দায়িত্ব পালন করে তাহলে। আনাস ؓ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ (সাহাবা সহ) এক সফরে ছিলেন। তাঁদের কিছু লোক রোযা রাখল এবং কিছু রাখল না। যারা রোযা রাখেনি তারা বুদ্ধি করে রোযা ভাঙ্গল এবং কাজ করল। আর যারা রোযা রেখেছিল তারা কিছু কাজ করতে দুর্বল হয়ে পড়ল। তা দেখে তিনি বললেন, "আজ যারা রোযা রাখেনি তারাই সওয়াব কামিয়ে নিল।" *(বুঃ ২৮৯০, মুঃ ১১১৯নং, আর হাদীসের শব্দাবলী তাঁরই, নাঃ)*

৩। অসহ্য গরম, খারাপ বা দূরবর্তী রাস্তা অথবা অবিশ্রাম পথ চলার কারণে রোযা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়। এ অবস্থায় তার জন্য রোযা রাখা হারাম। কারণ, মহানবী ﷺ মক্কা-বিজয় অভিযানে রোযা রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে খবর এল যে, লোকেরাও রোযা রেখেছে, আর এর ফলে তারা কষ্ট ভুগছে এবং তিনি কি করছেন তা জানার অপেক্ষা করছে। সুতরাং আসরের পর তিনি এক পাত্র পানি আনিয়ে পান করলেন। লোকেরা এ দৃশ্য তাকিয়ে দেখতে লাগল। তাঁকে বলা হল, কিছু লোক রোযা অবস্থায় আছে। তিনি বললেন, "তারা নাফরমান, তারা অবাধ্য।" *(মুঃ ১১১৪নং)*

জাবের ؓ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক সফরে ছিলেন। তিনি দেখলেন লোকেরা

একটি লোককে ঘিরে জমা হয়েছে এবং লোকটির উপর ছায়া করা হয়েছে। তিনি বললেন, "কি হয়েছে ওর?" লোকেরা বলল, 'লোকটি রোযা রেখেছে।' তিনি বললেন, "সফরে তোমাদের রোযা রাখা ভাল কাজ নয়।" *(বুঃ ১৯৪৬, মুঃ ১১১৫নং এবং শব্দাবলী তাঁরই)*

কখনো কোন ইমারজেন্সী কারণে রোযা ভাঙ্গা ওয়াজেবও হতে পারে। যেমন আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, আমরা রোযা রাখা অবস্থায় আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে মক্কা সফর করলাম। এক মঞ্জিলে নেমে তিনি বললেন, "তোমরা এখন শত্রুর সম্মুখীন হয়েছ, আর রোযা না রাখাতে তোমাদের শক্তি বেশী হবে।" এ কথার ফলে রোযা না রাখাতে অনুমতি হল। তখন আমাদের মধ্যে কেউ রোযা বাকী রাখল, কেউ ভেঙ্গে ফেলল। অতঃপর আমরা আর এক মঞ্জিলে অবতরণ করলাম। সেখানে তিনি বললেন, "সকালে তোমাদের শত্রুদের সাথে সাক্ষাৎ হবে। আর রোযা না রাখাতে তোমাদের ক্ষমতা বেশী থাকবে। অতএব তোমরা রোযা ভেঙ্গে দাও।" এক্ষণে তা বাধ্যতামূলক ছিল। ফলে আমরা সকলে রোযা ভেঙ্গে দিলাম।

আবূ সাঈদ ﷺ আরো বলেন, কিন্তু এর পরে আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে সফরে রোযা রাখতাম। *(মুঃ ১১২০নং)*

❖ মাসআলা ঃ

রোযা রেখে স্বামী-স্ত্রী এক সাথে সফর করে সফরে দিনের বেলায় সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে পড়লে কোন ক্ষতি নেই। কারণ, মুসাফিরের জন্য রোযা ভাঙ্গা বৈধ। অতএব সে কিছু খেয়ে, অথবা পান করে অথবা সঙ্গম করে রোযা ভাঙ্গতে পারে। এ সব কিছুই তার জন্য হালাল। বলা বাহুল্য, ঐ রোযা কাযা করা ছাড়া তার জন্য অন্য কিছু ওয়াজেব নয়। *(মুমঃ ৬/৩৫৯, ইবনে জিবরীন ফাসিঃ জিরাইসী ১২পৃঃ)*

❖ মাসআলা ঃ

দিন থাকতে মুসাফির ঘরে ফিরে এলে এবং অনুরূপ সেই সকল ওযর-ওয়ালা মানুষ যাদের যে ওযরের কারণে রোযা ভাঙ্গা বৈধ ছিল তাদের সেই ওযর দূর হলে দিনের বাকী অংশটা পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে কি না - এ বিষয়ে উলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

কিছু উলামা মনে করেন, ওয়াজেব হওয়ার কারণ নতুনভাবে দেখা দিলে রোযা ভঙ্গকারী জিনিস থেকে বিরত থাকা ওয়াজেব। আর সেই দিনের রোযা কাযা করা ওয়াজেব নয়। যেমন রোযার দিনে কোন কাফের মুসলিম হলে, নাবালক সাবালক হলে অথবা পাগল সুস্থ হলে, সে বাকী দিন পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে এবং তাকে ঐ দিনটি কাযা করতে হবে না।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন প্রতিবন্ধকতার ফলে রোযা রাখেনি তার সে প্রতিবন্ধকতা দিনের মধ্যে দূর হলে তাকে বাকী দিন পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা ওয়াজেব নয়; অবশ্য ঐ দিনের রোযা কাযা ওয়াজেব। যেমন দিন থাকতে নিফাস বা ঋতুমতী মহিলা পবিত্রা হলে, মুসাফির রোযা না রেখে ঘরে ফিরলে, রোগী সুস্থ হলে এবং নিরপরাধ প্রাণ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে যে রোযা ভেঙ্গেছিল তার সে কাজ শেষ হলে বাকী দিন পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা ওয়াজেব নয়। কিন্তু ঐ দিনের কাযা অবশ্যই ওয়াজেব। *(মুমঃ ৪/৫৪০-৫৪১, ৬/৩৪৭, ৩৬৩, ৪২০)*

Contents

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি দিনের প্রথম ভাগে রোযা রাখেনি, তার উচিত দিনের শেষভাগে রোযা না রাখা। (পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত না হওয়া।)' *(ইআশাঃ ৯৩৪৩নং)*

অন্য দিকে অপর কিছু উলামা মনে করেন, উপর্যুক্ত সকল প্রকার লোকের জন্য বাকী দিন পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা ওয়াজেব। *(ইবনে জিবরীন ফাসিঃ মুসনিদ ৭৪পৃঃ)* অবশ্য উত্তম ও পূর্বসতর্কতামূলক কাজ এই যে, ঐ শ্রেণীর সকল লোকই রমযান মাসের মর্যাদার কথা খেয়াল রেখে এবং উক্ত মতভেদ থেকে দূরে থেকে বাকী দিনটি পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে। *(আসাইঃ ৬৪পৃঃ, ৭০ঃ ২৩নং)*

(৯) নিফাস ও ঋতুমতী

নিফাস ও ঋতুমতী মহিলা খুন থাকা অবস্থায় রোযা রাখবে না। অবশ্য যে কয় দিন তাদের রোযা ছুটে যাবে তা পরে কাযা করে নেবে।

ঋতুমতী যখন মাসিকের খুন বন্ধ হওয়ার পর সাদা স্রাব আসতে দেখবে, তখন রাত থাকলে রোযার নিয়ত করে রোযা রাখবে। কিন্তু সে যদি মাসিক শেষে অভ্যাসগতভাবে সে স্রাব লক্ষ্য না করে থাকে, তাহলে কিছু তুলো বা কাপড় নিয়ে শরমগাহে প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষা করে দেখবে তাতে খুনের চিহ্ন আছে কি না? কোন চিহ্ন না দেখলে, অন্য কথায় তুলো বা কাপড় পরিষ্কার লক্ষ্য করলে রোযা রাখবে। রোযা রাখার পর দিনের বেলায় আবার খুন দেখা দিলে রোযা ভেঙ্গে দেবে। পক্ষান্তরে মাগরেব পর্যন্ত খুন বন্ধ থাকলে এবং ফজরের আগে রোযার নিয়ত করে থাকলে তার রোযা শুদ্ধ হয়ে যাবে।

যে মহিলা মাসিকের খুন সরার কথা অনুভব করে, কিন্তু সূর্য ডোবার পর ছাড়া বের হতে দেখে না, তার রোযা শুদ্ধ এবং ঐ দিন যথেষ্ট।

যে মহিলা তার হিসাব মত জানে যে, তার মাসিক শুরু হবে আগামী কাল, তবুও সে রোযার নিয়ত করে রোযা রাখবে এবং খুন না দেখা পর্যন্ত রোযা ভাঙ্গবে না। *(৭০ঃ ৬৪-৬৫নং)*

যে মহিলার নিফাস বা মাসিক ঠিক ফজর হওয়ার সময় অথবা তার কিছু আগে বন্ধ হয়, তার জন্য রোযা রাখা জরুরী। তার রোযা শুদ্ধ ও ফরয পালন হয়ে যাবে, যদিও সে ফজর হওয়ার পরেই গোসল করে। পক্ষান্তরে যদি ফজর হয়ে যাওয়ার পর খুন বন্ধ দেখে তাহলে সেদিন সে পানাহার থেকে বিরত থাকবে, কিন্তু রোযার নিয়ত করবে না, রোযা হবেও না। বরং তা তাকে রমযান পর কাযা করতে হবে। *(ইবনে জিবরীন ফাসিঃ মুসনিদ ৬২পৃঃ)*

ঋতুমতী মহিলার জন্য এটাই উত্তম যে, সে স্বাভাবিক অবস্থায় থেকে আল্লাহর লিখিত ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে এবং খুন নিবারক কোন ঔষধ ব্যবহার করবে না। মাসিক অবস্থায় মহান আল্লাহ যেমন তার জন্য রোযা কাযা করাকে বৈধ করেছেন, তেমনি তা গ্রহণ করে নেওয়া উচিত। অনুরূপই ছিলেন মহানবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ এবং সাহাবী ও সলফদের মহিলাগণ। তাঁরা কোন খুন-নিবারক ঔষধ ব্যবহার করতঃ মাসিক বন্ধ করে রোযা রাখতেন না। তাছাড়া মহিলাদের এই মাসিক খুন-ক্ষরণের মাঝে মহান আল্লাহর সৃষ্টিগত একটি বড়

হিকমতও রয়েছে। সেই হিকমত ও যুক্তি মহিলার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রাখে। অতএব সেই স্বাভাবিক প্রকৃতিতে বাধা দিলে নিঃসন্দেহে নারী-দেহে তার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। অথচ মহানবী ﷺ বলেন, "কেউ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং অপরেরও ক্ষতি করবে না।" *(আঃ, ইমাঃ, হাঃ, বাঃ, দারাঃ, সিসঃ ২৫০নং)*

এতদ্ব্যতীত মাসিক-নিবারক ট্যাবলেট ব্যবহারে মহিলার গর্ভাশয়েরও নানান ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে; যেমন সে কথা ডাক্তারগণ উল্লেখ করে থাকেন।

কিন্তু যদি মহিলা তা ব্যবহার করে মাসিক বন্ধ করে এবং পবিত্রা থেকে রোযা রাখে, তাহলে সে রোযা শুদ্ধ ও যথেষ্ট। *(ইবনে উষাইমীন, ফাসিঃ মুসনিদ ৬৪পৃঃ, ৭০ঃ ৬৬নং, ফইঃ ১/২৪১)*

নিফাসবতী মহিলা ৪০ দিন পার হওয়ার আগেই যদি পবিত্রা হয়ে যায়, তাহলে সে রোযা রাখবে এবং নামাযের জন্য গোসল করবে। কিন্তু ৪০ দিন পার হওয়ার আগেই পুনরায় খুন আসতে শুরু হলে রোযা-নামায বন্ধ করে দেবে। আর যে রোযা-নামায সে পবিত্রা অবস্থায় করেছিল, তা শুদ্ধ ও যথেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে ৪০ দিন পার হওয়ার পরেও যদি খুন বন্ধ না হয়, তাহলেও তাকে রোযা-গোসল করতে হবে। অতিরিক্ত এই দিনগুলির খুনকে ইস্তিহাযা ধরতে হবে। অবশ্য সেই সময় যদি তার স্বাভাবিক মাসিক আসার সময় হয়, তাহলে সে খুনকে মাসিকের খুন ধরতে হবে। *(ইবনে বায, ফাসিঃ মুসনিদ ৬৩পৃঃ, ৭০ঃ ৬৭নং)*

মানুষের আকৃতি আসার পর ভ্রূণ কোন জরুরী কারণে গর্ভচ্যুত করতে বাধ্য হলে যে খুন আসবে তা নিফাস। অবশ্য এর পূর্বে গর্ভচ্যুত করলে যে খুন আসবে তা নিফাস নয়। বরং সে খুন একটি শিরার খুন। এ খুনের মান ইস্তিহাযার মত। অর্থাৎ, এ খুনে নামায-রোযা বন্ধ করা বৈধ নয়।

প্রকাশ থাকে যে, ভ্রূণে মানুষের আকৃতি আসতে সময় লাগে গর্ভ ধারণের পর থেকে কমসে কম ৮০ দিন। সাধারণভাবে ৯০ দিন ধরা যায়। *(রিদিতাঃ ৪০পৃঃ, ফইঃ ১/২৪৩, ফামাঃ ২৪পৃঃ)*

গর্ভবতী খুন দেখলে তা যদি প্রসবের কিছুকাল (১/২ দিন) পূর্বে হয় এবং তার সাথে প্রসব-বেদনা থাকে, তাহলে সে খুন নিফাস। পক্ষান্তরে যদি সে খুন প্রসবের বহু (৩/৪ দিন বা তারও বেশী) পূর্বে হয় অথবা ক্ষণকাল পূর্বে হয়, কিন্তু তার সাথে প্রসব-যন্ত্রণা না থাকে, তাহলে সে খুন নিফাস নয়। সে খুন মহিলার মাসিক হওয়ার যথাসময়ে হলে তা মাসিকের খুন। কারণ, মহিলার গর্ভাশয় থেকে যে খুন নির্গত হয়, আসলে তা মাসিকের খুন; যদি মাসিকের খুন হওয়াতে কোন বাধা না থাকে তাহলে। আর কিতাব ও সুন্নাহতে এমন কোন দলীল নেই, যাতে বুঝা যায় যে, গর্ভিণী মহিলার মাসিক হতে পারে না। *(রিদিতাঃ ১২পৃঃ)*

ইস্তিহাযার খুন নামায-রোযার শুদ্ধতায় কোন প্রভাব ফেলে না। কারণ, ফাতিমা বিন্তে আবী হুবাইশ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি এক এমন মহিলা, যার সব সময় ইস্তিহাযা (অতিরিক্ত মাসিকের) খুন থাকে এবং পবিত্রাই হয় না। তাহলে আমি কি নামায ত্যাগ করব?' উত্তরে তিনি বললেন, "না। এটা হল একটি শিরার খুন। মাসিক নয়। সুতরাং যখন তোমার (পূর্ব নিয়ম অনুসারে পূর্ব সময়ে) মাসিক আসবে তখন তুমি নামায ত্যাগ কর। অতঃপর যখন সে (নিয়মিত মাসিক আসার সময়) চলে যাবে, তখন খুন ধুয়ে (গোসল করে) নামায পড়তে শুরু কর।" *(বুঃ ৩৩১, মুঃ ৩৩৩নং)*

Contents

পঞ্চম অধ্যায়

রোযার আরকান

রোযার হল দুটি রুক্ন; যদ্দ্বারা তার প্রকৃততত্ত্ব সংগঠিত ঃ-

১। ফজর উদয় হওয়ার পর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময় ধরে যাবতীয় রোযা নষ্টকারী জিনিস থেকে বিরত থাকা। মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না কালো সুতা থেকে ফজরের সাদা সুতা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। *(কুঃ ২/১৮৭)*

উক্ত আয়াতে উল্লেখিত কালো সুতা ও সাদা সুতা বলে রাতের অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতাকে বুঝানো হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে আদী বিন হাতেম কর্তৃক বর্ণিত, উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি (মাথায় রুমালের উপর ব্যবহার্য) একটি সাদা ও একটি কালো মোটা রশি (বালিশের নিচে) রাখলেন। রাত্রি হলে তিনি লক্ষ্য করলেন, কিন্তু (কোন্‌টা সাদা ও কোন্‌টা কালো) তা স্পষ্ট হল না। সকাল হলে তিনি এ কথা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তিনি ﷺ তাঁকে বললেন, "তোমার বালিশ তাহলে খুবই বিশাল! কালো সুতা ও সাদা সুতা তোমার বালিশের নিচে ছিল?!" *(বুঃ ৪৫০৯নং)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তার মানে হল, রাতের অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতা।" *(বুঃ ১৯১৬, মুঃ ১০৯০নং)*

২। নিয়ত ; আর তা হল, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করার উদ্দেশ্যে রোযা রাখার জন্য হৃদয়ের সংকল্প। আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, তারা তো আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছিল। *(কুঃ ৯৮/৫)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "সমস্ত কর্ম নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং মানুষের তাই প্রাপ্য হয় যার সে নিয়ত করে।" *(বুঃ ১, মুঃ ১৩নং)*

সুতরাং যে ব্যক্তি ফরয (যেমন রমযান, কাযা, নযর অথবা কাফ্ফারার) রোযা রাখবে, সে ব্যক্তির জন্য নিয়ত ও সংকল্প করা ওয়াজেব। আর নিয়ত হল, হৃদয়ের কাজ; তার সাথে মুখের কোন সম্পর্ক নেই। তার প্রকৃততত্ত্ব হল, মহান আল্লাহর আদেশ পালন এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে কোন কাজের সংকল্প করা। বলা বাহুল্য, 'নাওয়াইতু আন আসূমা গাদাম মিন শাহরি রামাযান' বলে নিয়ত পড়া বিদআত।

আসলে যে ব্যক্তি মনে মনে এ কথা জানবে যে, আগামী কাল রোযা, অতঃপর রোযা রাখার

উদ্দেশ্যে সে সেহরী খাবে, তার এমনিই নিয়ত হয়ে যাবে। তদনুরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধচিত্তে দিনের বেলায় (ফজর উদয়কাল থেকে সূর্য অস্তকাল পর্যন্ত) সকল প্রকার রোযা নষ্টকারী জিনিস থেকে বিরত থাকার সংকল্প করবে, তার নিয়ত হয়ে যাবে, যদিও সে সেহরী খেতে সুযোগ না পেয়েছে। *(দ্রঃ ফিসুঃ আরাবী ১/৩৮৭, ৭০ঃ ৩৩নং, তাইঃ ১৩পৃঃ)*

অবশ্য নিয়ত ফজরের পূর্বে হওয়া জরুরী। তবে রাত্রের যে কোন অংশে করলে যথেষ্ট ও বৈধ। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রাত থেকে রোযা রাখার সংকল্প না করে, তার রোযা নেই।" *(নাঃ, সজাঃ ৬৫৩৫নং)* তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে রোযা রাখার সংকল্প না করে, তার রোযা নেই।" *(দারাঃ, বাঃ, আয়েশা কর্তৃক এবং আঃ, আদাঃ, তিঃ, নাঃ হাফসা কর্তৃক, ইগঃ ৯১৪নং)*

এই জন্যই যে ব্যক্তি ফজর উদয় হওয়ার পর ছাড়া রমযান মাস আগত হওয়ার কথা তার আগে না জানতে পারে, তার জন্য জরুরী হল, বাকী দিন রোযা নষ্টকারী জিনিস থেকে বিরত থাকা এবং রমযান পরে সেই দিনের রোযা কাযা করা। *(৭০ঃ ৩৬নং)* আর এ হল অধিকাংশ উলামাদের মত - যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে সাধারণ নফল রোযার ক্ষেত্রে রাত থেকে নিয়ত করা শর্ত নয়। বরং ফজর উদয় হওয়ার পর কিছু না খেয়ে থাকলে দিনের বেলায় নিয়ত করলেও তা যথেষ্ট হবে। কেননা, মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক দিন আল্লাহর রসূল ﷺ আমার নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমাদের কিছু আছে কি?" আমরা বললাম, 'না।' তিনি বললেন, "তাহলে আমি রোযা রাখলাম।" *(মুঃ ১১৫৪নং)*

পরন্তু নির্দিষ্ট নফল (যেমন আরাফা ও আশূরার) রোযার ক্ষেত্রে পূর্বসতর্কতামূলক আমল হল, রাত থেকেই তার নিয়ত করে নেওয়া। *(৭০ঃ ৩৪নং)*

রমযানের রোযাদারের জন্য রমযানের প্রত্যেক রাতে নিয়ত নবায়ন করার প্রয়োজন নেই। বরং রমযান আসার শুরুতে সারা মাস রোযা রাখার একবার নিয়ত করে নিলেই যথেষ্ট। সুতরাং যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এক ব্যক্তি রমযানের কোন দিনে সূর্য ডোবার আগে ঘুমিয়ে গেল। অতঃপর পরের দিন ফজর উদয় হওয়ার পর তার চেতন হল। অর্থাৎ, সে রাতে এই দিনের রোযা রাখার নিয়ত করার সুযোগ পেল না। কিন্তু তবুও তার রোযা শুদ্ধ হবে। কারণ, মাসের শুরুতে সারা মাস রোযা রাখার নিয়ত তার ছিল।

হ্যাঁ, তবে যদি কেউ সফর, রোগ অথবা অন্য কোন ওযরের ফলে মাঝে রোযা না রেখে নিয়ত ছিন্ন করে ফেলেছে তার জন্য অবশ্য ওযর দূর হওয়ার পর নতুন করে রোযা রাখার জন্য নিয়ত নবায়ন করা জরুরী। *(মুমঃ ৬/৩৬৯, ৪৮ঃ ৪৬পৃঃ, ৭০ঃ ৩৩নং)*

যে ব্যক্তি খাওয়া অথবা পান করার সংকল্প করার পর পুনরায় স্থির করল যে, সে ধৈর্য ধরবে। অতএব সে পানাহার করল না। এমন ব্যক্তির রোযা কেবলমাত্র পানাহার করার ইচ্ছা ও সংকল্প হওয়ার জন্য নষ্ট হবে না। আর এ কাজ হল সেই ব্যক্তির মত, যে নামাযে কথা বলতে ইচ্ছা করার পর কথা বলে না, অথবা (হাওয়া ছেড়ে) ওযূ নষ্ট করার ইচ্ছা হওয়ার পর ওযূ নষ্ট করে না। যেমন এই নামাযীর ঐ ইচ্ছার ফলে নামায বাতিল হবে না এবং তার ওযূও শুদ্ধ থাকবে, অনুরূপ ঐ রোযাদারের পানাহার করার ইচ্ছা হওয়ার পর পানাহার না করে

তার রোযাও বাতিল না হয়ে শুদ্ধ থাকবে। যেহেতু নীতি হল, যে ব্যক্তি ইবাদতে কোন নিষিদ্ধ (ইবাদত নষ্টকারী) কর্ম করার সংকল্প করে, কিন্তু কার্যতঃ তা করে না, সে ব্যক্তির ইবাদত নষ্ট হয় না। *(ইবনে উযাইমীন, আহকামুন মিনাস সিয়াম, ক্যাসেট)*

পক্ষান্তরে যে (রোযা নেই বা রাখলাম না মনে করে) নিয়ত ছিন্ন করে দেয়, তার রোযা বাতিল। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "সমস্ত কর্ম নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং মানুষের তাই প্রাপ্য হয় যার সে নিয়ত করে।" *(বুঃ ১, মুঃ ১৩নং) (দ্রঃ মুমঃ ৬/৩৭৬, ইবনে জিবরীন ফাসিঃ মুসনিদ ৯৯পৃঃ, সারাঃ ২৪পৃঃ)*

যদি কোন রোযাদার মুরতাদ্ হয়ে যায় তাহলে সাথে সাথে তওবা করলেও তার রোযা নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, মুরতাদ্দের কাজ ইবাদতের নিয়ত বাতিল ও বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আর এতে কারো কোন প্রকারের দ্বিমত নেই। *(৭০ঃ ৩৩নং)*

নিয়ত প্রসঙ্গে আলোচনায় একটি সতর্কতা জরুরী এই যে, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজেব হল, আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর সওয়াবের আশা এবং কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা। কাউকে দেখাবার বা শোনাবার উদ্দেশ্যে, অথবা কেবলমাত্র লোকেদের দেখাদেখি অন্ধ অনুকরণ করে, অথবা দেশ বা পরিবারের পরিবেশের অনুকরণ করে রোযা রাখা উচিত নয়। (যেমন রোযা শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী বলে সেই উপকার লাভের উদ্দেশ্যেই রোযা রাখা।) বরং ওয়াজেব হল, তাকে যেন তার এই ঈমান রোযা রাখতে উদ্বুদ্ধ করে যে, মহান আল্লাহ তার উপর এই রোযা ফরয করেছেন এবং সে তা পালন করে তাঁর কাছে প্রতিদানের আশা করে। আর এ জন্যই মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমান এবং সওয়াবের আশা রেখে রমযানের রোযা রাখে, তার পূর্বেকার সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়।" *(বুঃ ৩৮, মুঃ ৭৬০নং) (রিমুযাসিঃ ২২পৃঃ)*

সুতরাং রোযার উদ্দেশ্য ক্ষুৎ-পিপাসা ও কষ্ট সহ্য করার উপর শরীর-চর্চা বা স্বাস্থ্য-অনুশীলন নয়, বরং তা হল প্রিয়তমের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রিয়তম বস্তু ত্যাগ করার উপর আত্মার অনুশীলন।

রোযায় পরিত্যাজ্য প্রিয়তম বস্তু হল, পানাহার ও স্ত্রী-সঙ্গম। আর তা হল আত্মার কামনা। প্রিয়তমের সন্তুষ্টি হল, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। সুতরাং নিয়তে আমরা যেন এ কথা স্মরণে রাখি যে, আমরা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় উক্ত রোযা নষ্টকারী (কামনার) বস্তু ত্যাগ করব। *(৪৮ঃ ১১পৃঃ)*

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোযার বিভিন্ন আদব

রোযায় রোযাদারের নিম্নলিখিত আদবের খেয়াল রাখা উচিত ঃ-

সেহরী বা সাহারী খাওয়া

মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে রোযার জন্য সেহরী খাওয়া মুস্তাহাব এবং যে ব্যক্তি তা ইচ্ছাকৃত খায় না সে গোনাহগার নয়। আর এ কারণেই যদি কেউ ফজরের পর জাগে এবং সেহরী খাওয়ার সময় না পায়, তাহলে তার জন্য জরুরী রোযা রেখে নেওয়া। এতে তার রোযার কোন ক্ষতি হবে না। বরং ক্ষতি হবে তখন, যখন সে কিছু খেতে হয় মনে করে তখনই (ফজরের পর) কিছু খেয়ে ফেলবে। সে ক্ষেত্রে তাকে সারা দিন পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে এবং রমযান পরে সেই দিন কাযা করতে হবে।

সেহরী খাওয়া যে উত্তম তা প্রকাশ করার জন্য মহানবী ﷺ উম্মতকে বিভিন্ন কথার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি সেহরীকে বর্কতময় খাদ্য বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, “তোমরা সেহরী খাও। কারণ, সেহরীতে বর্কত আছে।” *(বুঃ ১৮২৩, মুঃ ১০৯৫নং)* “তোমরা সেহরী খেতে অভ্যাসী হও। কারণ, সেহরীই হল বর্কতময় খাদ্য।” *(আঃ, নাঃ সজাঃ ৪০৮১নং)*

ইরবায বিন সারিয়াহ বলেন, একদা রমযানে আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে সেহরী খেতে ডাকলেন; বললেন, “বর্কতময় খানার দিকে এস।” *(আঃ, আদাঃ, নাঃ, ইহিঃ, ইখুঃ, সজাঃ ৭০৪৩নং)*

সেহরীতে বর্কত থাকার মানে হল, সেহরী রোযাদারকে সবল রাখে এবং রোযার কষ্ট তার জন্য হাল্কা করে। আর এটা হল শারীরিক বর্কত। পক্ষান্তরে শরয়ী বর্কত হল, রসূল ﷺ-এর আদেশ পালন এবং তাঁর অনুসরণ।

মহানবী ﷺ এই সেহরীর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তা দিয়ে মুসলিম ও আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের) রোযার মাঝে পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন। তিনি অন্যান্য ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করার মত তাতেও বিরোধিতা করতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন, “আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবের রোযার মাঝে পার্থক্য হল সেহরী খাওয়া।” *(মুঃ ১০৯৬, আদাঃ ২৩৪৩, ফাসিঃ মুসনিদ ৯৮পৃঃ)*

❖ কি খেলে সেহরী খাওয়া হবে?

অল্প-বিস্তর যে কোন খাবার খেলেই সেহরী খাওয়ার বিধি পালিত হয়ে যাবে। এমনকি কেউ যদি এক ঢোক দুধ, চা অথবা পানিও খায় অথবা ২/১টি বিস্কুট বা খেজুরও খায়, তাহলে তারও সেহরী খাওয়ার সুন্নত পালন হয়ে যাবে। আর এই সামান্য পরিমাণ খাবারেই রোযাদার এই বিরাট ফরয রোযা পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বল পাবে এবং ফিরিশ্তাবর্গ তার জন্য দুআ করবে।

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “সেহরী খাওয়াতে বর্কত আসে। সুতরাং তোমরা তা খেতে ছেড়ো না; যদিও তাতে তোমরা এক ঢোক পানিও খাও। কেননা, যারা সেহরী খায় তাদের জন্য আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তা দুআ করতে থাকেন।” *(আঃ, সজাঃ ৩৬৮৩নং)*

তিনি আরো বলেন, “তোমরা সেহরী খাও; যদিও এক ঢোক পানি হয়।” *(আঃ, ইহিঃ প্রমুখ, সজাঃ ২৯৪৫নং)*

আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী ﷺ বলেন, "মুমিনের শ্রেষ্ঠ সেহরী হল খেজুর।" *(আদাঃ ২৩৪৫ নং, ইহিং, বাঃ ৪/২৩৬-২৩৭, সিসঃ ৫৬২নং)*

অবশ্য সেহরী খাওয়াতে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। কারণ, বেশী পানাহার করার ফলে ইবাদত ও আনুগত্যে আলস্য সৃষ্টি হয়।

কিছু লোক আছে, যারা গলায় গলায় ভ্যারাইটিজ পানাহার করে এমনভাবে পেট পূর্ণ করে নেয় যে, মনে হয় তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। যার ফলে ফজরের নামাযে বড় আলস্য ও শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং মসজিদে আল্লাহর যিক্রের জন্যও সামান্য ক্ষণ বসতে সক্ষম হয় না। আর দিনের বেলায় পেটের বিভিন্ন প্রকার কমপ্লেনের শিকার হয়। অথচ মহানবী ﷺ বলেন, "উদর অপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোন পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের জন্য ততটুকুই খাদ্য যথেষ্ট, যতটুকুতে তার পিঠ সোজা করে রাখে। আর যদি এর চেয়ে বেশী খেতেই হয় তাহলে যেন সে তার পেটের এক তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানের জন্য এবং অন্য আর এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ব্যবহার করে।" *(আঃ, তিঃ ২৩৮০, ইমাঃ ৩৩৪৯, ইহিং, হাঃ ৪/১২১, সিসঃ ২২৬৫, সজাঃ ৫৬৭৪নং)*

❖ সেহরীর সময়ঃ

সেহরী খাওয়ার সময় হল অর্ধরাত্রির পর থেকে ফজরের আগে পর্যন্ত। আর মুস্তাহাব হল, ফজর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না হলে শেষ সময়ে সেহরী খাওয়া। আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, যায়দ বিন যাবেত তাঁকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা নবী ﷺ-এর সাথে সেহরী খেয়ে (ফজরের) নামায পড়তে উঠে গেছেন। আনাস বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সেহরী খাওয়া ও আযান হওয়ার মধ্যে কতটুকু সময় ছিল?' উত্তরে যায়দ বললেন, 'পঞ্চাশ অথবা ষাটটি আয়াত পড়তে যতটুকু লাগে।' *(বুঃ ৫৭৫, ১৯২১, মুঃ ১০৯৭, তিঃ ৭০৩নং)*

এখানে আয়াত বলতে মধ্যম ধরনের আয়াত গণ্য হবে। আর এই শ্রেণীর ৫০/৬০টি আয়াত পড়তে মোটামুটি ১৫/২০ মিনিট সময় লাগে। অতএব সুন্নত হল, আযানের ১৫/২০ মিনিট আগে সেহরী খাওয়া।

মহানবী ﷺ-এর সাহাবাগণ খুব তাড়াতাড়ি (সময় হওয়া মাত্র) ইফতার করতেন এবং খুব দেরী করে সেহরী খেতেন। *(বাঃ ৪/২৩৮, ইআশাঃ ৮৯৩২নং)*

সুতরাং সেহরী আগে আগে খেয়ে ফেলা উচিত নয়। মধ্য রাতে সেহরী খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া তো মোটেই উচিত নয়। কারণ, তাতে ফজরের নামায ছুটে যায়। ঘুমিয়ে থেকে হয় তার জামাআত ছুটে যায়। নচেৎ, নামাযের সময় চলে গিয়ে সূর্য উঠার পর চেতন হলে নামাযটাই কাযা হয়ে যায়। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক। আর নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় মসীবত; যাতে বহু রোযাদার ফেঁসে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত করুন। আমীন।

❖ ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলেঃ

ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলে রোযাদার ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে। আর সন্দেহের উপর পানাহার বন্ধ করবে না। যেহেতু মহান আল্লাহ পানাহার বন্ধ করার শেষ সময় নির্ধারিত

করেছেন নিশ্চিত ও স্পষ্ট ফজরকে; সন্দিগ্ধ ও অস্পষ্ট ফজরকে নয়। তিনি বলেছেন,

([illegible])

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। *(কুঃ ২/১৮৭)*

এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস ﷺ-কে বলল, 'আমি সেহরী খেতে থাকি। অতঃপর যখন (ফজর হওয়ার) সন্দেহ হয়, তখন (পানাহার) বন্ধ করি।' তিনি বললেন, 'যতক্ষণ সন্দেহ থাকে ততক্ষণ খেতে থাক, সন্দেহ দূর হয়ে গেলে খাওয়া বন্ধ কর।' *(ইআশাঃ ৯০৫৭, ৯০৬৭নং)*

ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন, 'ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলেও যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিত হওয়া গেছে ততক্ষণ রোযাদার পানাহার করতে পারবে।' *(ফিসুঃ ১/৪০৪)*

যদি কোন ব্যক্তি ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রেখে খায়, অথবা ফজর উদয় হয়নি মনে করে খায়, অতঃপর জানতে পারে যে, খাওয়ার আগেই ফজর উদয় হয়ে গেছে, অথবা ফজরের আযান হয়ে গেছে, তাহলে তার রোযা শুদ্ধ এবং তাকে ঐ রোযা কাযা করতে হবে না। যদিও সে আসলে ফজরের পর খেয়েছে। কারণ, সে না জেনে খেয়েছে। আর না জেনে খাওয়া ক্ষমার্হ। অর্থাৎ তা ধর্তব্য নয়। *(মুমঃ ৬/৪০৯-৪১১)* পক্ষান্তরে যদি কেউ ঘুম থেকে জেগে উঠে জানতে পারে যে, ফজর বা ফজরের আযান হয়ে গেছে এবং তা সত্ত্বে পানি বা অন্য কিছু খায়, তাহলে তার রোযা হবে না। তাকে ঐ দিন পানাহার ইত্যাদি রোযার মতই বন্ধ রেখে রমযান পর কাযা রাখতে হবে।

জ্ঞাতব্য যে, সেহরীর শেষ সময় হল পূর্ব আকাশে ছড়িয়ে পড়া সাদা আলোক রেখার উদ্ভব কাল। সামুরাহ বিন জুনদুব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "বিলালের আযান এবং (পূর্বাকাশে) আলম্বিত শুভ্র জ্যোতি যেন তোমাদেরকে সেহরী খাওয়াতে বাধা না দেয়। অবশ্য পূর্বাকাশে ছড়িয়ে পড়া জ্যোতি দেখে খাওয়া বন্ধ করো।" *(আঃ, মুঃ, আদাঃ ২৩৪৬, তিঃ, ইআশাঃ, দারাঃ, বাঃ, ইগঃ ৯১৫নং)*

বলা বাহুল্য, ছড়িয়ে পড়া উক্ত সাদা রেখা পরিদৃষ্ট হলে সাথে সাথে রোযাদারের জন্য পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত হওয়া ওয়াজেব। তাতে সে ফজরের আযান শুনুক, অথবা না শুনুক। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে।" *(কুঃ ২/১৮৭)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কারণ, সে ফজর উদয় না হলে আযান দেয় না।" *(বুঃ ১৯১৮, মুঃ ১০৯২নং)*

লক্ষণীয় যে, ফজর উদয় হয়েছে কি না, তা-ই দেখার বিষয়; আযান হয়েছে কি না, তা নয়। অতএব মুআযযিন যদি নির্ভরযোগ্য হয় এবং জানা যায় যে, সে ফজর উদয় না হলে আযান দেয় না অথবা ফজর উদয় হওয়ার পরে দেরী করে আযান দেয় না, তাহলে তার আযান শোনামাত্র পানাহার থেকে বিরত হওয়া ওয়াজেব। পক্ষান্তরে মুআযযিন যদি (ফজর উদয়ের) সময় হওয়ার পূর্বেই আযান দেয়, তাহলে তার আযান শুনে পানাহার বন্ধ করা ওয়াজেব নয়। তদনরূপ মুআযযিন যদি ঢিলে হয় এবং যথাসময় থেকে দেরী করে আযান দেয়, তাহলে সময় শেষ জানা সত্ত্বেও আযান হয়নি বলে খেয়ে যাওয়া বৈধ নয়। কারণ, এতে রোযা হবে না।

কিন্তু মুআযযেনের অবস্থা না জানা গেলে, অথবা একই শহরে একাধিক মসজিদের একাধিক মুআযযেনের বিভিন্ন সময়ে আযান হলে এবং শহরের ভিতরে ঘর-বাড়ি তথা লাইটের ফলে ফজর উদয় হওয়ার সময় নিজে নির্ধারণ না করতে পারলে নির্ভরযোগ্য সেই ইসলামী পঞ্জিকা অনুযায়ী আমল করা জরুরী, যাতে নিখুঁতভাবে ফজর উদয়ের স্থানীয় সময় ঘন্টা-মিনিট সহ স্পষ্ট লিখা থাকে। অতঃপর নিজের ঘড়ি ঠিক রেখে সেই সময় অনুযায়ী সেহরী-ইফতার করলে মহানবী ﷺ-এর সেই হাদীসের উপর আমল হবে, যাতে তিনি বলেন, "যে বিষয়ে সন্দেহ আছে সে বিষয় বর্জন করে তাই কর যাতে সন্দেহ নেই।" *(আঃ, তিঃ ২৫১৮, নাঃ, ইহিঃ, ত্বাবঃ প্রমুখ, ইগঃ ২০৭৪, সজাঃ ৩৩৭৭, ৩৩৭৮নং)* "সুতরাং যে সন্দিহান বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে নেবে।" *(আঃ ৪/২৬৯, ২৭০, বুঃ ৫২, মুঃ ১৫৯৯নং, আদাঃ, তিঃ, ইমাঃ, দাঃ)*

জ্ঞাতব্য যে, ফজর উদয় হওয়ার ৫/ ১০ মিনিট আগে সতর্কতামূলকভাবে পানাহার থেকে বিরত হওয়া একটি বিদআত। কোন কোন পঞ্জিকা (বা রমযান-সওগাতে) যে একটি ঘর সেহরীর শেষ সময়ের এবং পৃথক আর একটি ঘর ফজরের আযানের লক্ষ্য করা যায়, তা আসলে শরীয়ত-বিরোধী কাজ। *(দ্রঃ তামিঃ ৪১৮-পৃঃ, ৪৮ঃ ৪৮-পৃঃ)* কারণ, সেহরীর শেষ সময় যেটাই, সেটাই ফজরের আযানের সময়। আর ফজরের আযানের সময়ের আগে লোকেদের পানাহার বন্ধ করা অবশ্যই শরীয়ত-বিরোধী কাজ।

বলা বাহুল্য, (বিশেষ করে) রমযান মাসে মুআযযিন-ইমামদের উচিত, যথাসময়ে আযান দেওয়ার ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা রাখা। রাইট-টাইমের ঘড়ি দ্বারা ফজর উদয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আযান দেওয়া মোটেই উচিত নয়। যাতে তাঁরা লোকেদেরকে ধোকা দিয়ে এমন সময় আযান না দিয়ে বসেন, যে সময়ে তাদের জন্য আল্লাহর হালালকৃত খাদ্য তাদের জন্য হারাম করে দেন এবং সময় হওয়ার পূর্বেই ফজরের নামায হালাল করে বসেন। আর এ যে কত বড় বিপজ্জনক, তা অনুমেয়। *(ইবনে উষাইমীন ফাসিঃ মুসনিদ ৩৬পৃঃ)*

হযরত আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ আযান শোনে এবং সেই সময় তার হাতে (পানির) পাত্র থাকে, তখন সে যেন তা থেকে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ না করা পর্যন্ত রেখে না দেয়।" *(আঃ ২/৪৩২, ৫১০, আদাঃ ২৩৫০, দারাঃ ২১৬২, হাঃ ১/২০৩, বাঃ, সিসঃ ১৩৯৪নং)*

অনেক উলামা উক্ত হাদীসটিকে এ কথার দলীল মনে করেন যে, যে ব্যক্তির হাতে খাবারের পাত্র (নিয়ে খেতে) থাকা অবস্থায় ফজর (বা তার আযান) হয়ে যায়, তার জন্য তা থেকে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ না করা পর্যন্ত রেখে দেওয়া (খাওয়া বন্ধ করা) বৈধ নয়। সুতরাং এ ব্যাপারটি আয়াতের সাধারণ নির্দেশ থেকে স্বতন্ত্র। মহান আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে।" *(কুঃ ২/ ১৮৭)*

অতএব উক্ত আয়াত তথা অনুরূপ অর্থের সকল হাদীস উপর্যুক্ত হাদীসের বিরোধী নয়। তাছাড়া ইজমার প্রতিকূলও নয়। বরং সাহাবাদের একটি জামাআত এবং আরো অন্যান্যগণ উক্ত হাদীস অপেক্ষা আরো প্রশস্ততা রেখে মনে করেন যে, ফজর উজ্জ্বল হয়ে গেলে এবং

ভোরের শুভ্র আলো রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লেও সে পর্যন্ত পানাহার করা বৈধ। *(দ্রঃ ফবাঃ ৪/১৬২-১৬৩, সিসঃ ৩/৩৮২-৩৮৪, তামিঃ ৪১৭-৪১৮পৃঃ)*

অনেকে মনে করেন, উক্ত হাদীসে 'আযান' বলতে বিলালের আযানকে বুঝানো হয়েছে; যা প্রথম (সেহরী বা তাহাজ্জুদের) আযান এবং যা ফজরের আগে দেওয়া হত। মহানবী ﷺ বলেন, "বিলাল রাতে আযান দেয়। সুতরাং তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেয়।" *(বুঃ ৬১৭নং, মুঃ)*

অথবা উক্ত হাদীসের অর্থ এই যে, আযান শুনেও যদি ফজর উদয়ে সন্দেহ হয়, যেমন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার ফলে অন্ধকার থাকে, তাহলে সে সময় কেবল আযানে ফজর হওয়ার কথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। কারণ, ফজর জানার যে মাধ্যম তা (ফজরের জ্যোতি) নেই। আর মুআযযিন তা দেখে ফজর উদয়ের কথা জানতে পারলে সেও জানতে পারত। পক্ষান্তরে ফজর উদয় হওয়ার কথা এমনিই বুঝতে পারা গেলে মুআযযেনের আযান শোনার প্রয়োজন নেই। কারণ, সে তো (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা স্পষ্ট হলেই পানাহার থেকে বিরত থাকতে আদিষ্ট। এ কথা বলেছেন খাত্ত্বাবী।

বাইহাক্বী বলেন, 'উক্ত হাদীস সহীহ হলে অধিকাংশ উলামার নিকট তার ব্যাখ্যা এই যে, মহানবী ﷺ জেনেছিলেন, মুআযযিন ফজর হওয়ার আগে আযান দেয়। সুতরাং তখন সে পান করলে ফজর উদয়ের আগেই পান করা হবে।' *(বাঃ ৪/২১৮)*

আলী আল-ক্বারী বলেন, 'উক্ত নির্দেশ তখন প্রযোজ্য, যখন ফজর উদয়ে সন্দেহ হয়।' ইবনুল মালেক বলেন, 'উক্ত নির্দেশ তখন প্রযোজ্য, যখন জানতে পারবে না যে, ফজর উদয় হয়ে গেছে। নচেৎ, যখন ফজর উদয় হওয়ার কথা জানতে পারবে এবং তাতে সন্দেহ করবে তখন নয়।' *(আমাঃ ৬/৩৪১-৩৪২)* এ ছাড়া আরো অন্য ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহই ভালো জানেন।

বলা বাহুল্য, শেষোক্ত উলামাদের মতানুসারে যখন কোন রোযাদার মুখে কোন খাদ্য বা পানীয় থাকা অবস্থায় ফজরের আযান শুনবে, তখনই সে তা মুখ থেকে উগলে ফেলে দেবে। আর এতে তার রোযা শুদ্ধ হয়ে যাবে। *(৭০ঃ ৬১নং)*

প্রকাশ থাকে যে, সেহরী খাওয়ার পর মুআযযিনের আযানের অপেক্ষা করে তার 'আল্লা--' বলার সাথে সাথে তৈরী রাখা পানি শেষ বারের মত পান করা বৈধ নয়। কারণ, আযান হয় ফজর উদয় হওয়ার সাথে সাথে এবং এ কথা জানাবার উদ্দেশ্যে যে সেহরীর সময় শেষ। অতএব খাবার সময় নেই জানার পরেও খাওয়া শরীয়তের বিরোধিতা তথা রোযা নষ্ট করার কাজ। *(তাফাসাসাঃ ৪০পৃঃ দ্রঃ)*

পূর্বের আলোচনায় আমরা জানতে পেরেছি যে, ফজরের আগে একটি আযান আছে, যা তাহাজ্জুদ ও সেহরীর সময় জানাবার জন্য ব্যবহার করা হত মহানবী ﷺ-এর যুগে। অতএব সেহরীর সময় লোকেদেরকে জাগানোর জন্য সেই আযানের বদলে কুরআন বা গজল পড়া, বেল বা ঘন্টা বাজানো, অথবা তোপ দাগা বিদআত। *(মুবিঃ ২৬৮পৃঃ)*

ইফতার

❖ **শীঘ্র ইফতারঃ**

রোযার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে রোযা খোলা বা ইফতার করার জন্য প্রত্যেক রোযাদারের অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করাটাই স্বাভাবিক। আর সেই সময় যে তার রোযা পূর্ণ করতে পারে প্রকৃতিগতভাবে সে খুশী হয়। অতএব ইফতার করতে তাড়াতাড়ি করাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও দয়ার নবী ﷺ আমাদেরকে সত্বর ইফতার করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, তাতে আমাদের মঙ্গল আছে। তিনি বলেন, "লোকেরা ততক্ষণ মঙ্গলে থাকবে, যতক্ষণ তারা ইফতার করতে তাড়াতাড়ি করবে।" *(বুঃ ১৯৫৭, মুঃ ১০৯৮-নং)*

যেহেতু ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানরা রোযা রেখে দেরী করে ইফতার করে, তাই তিনি আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "দ্বীন ততকাল বিজয়ী থাকবে, যতকাল লোকেরা ইফতার করতে তাড়াতাড়ি করবে। কারণ, ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানরা দেরী করে ইফতার করে।" *(আদাঃ, হাঃ, ইহিঃ, সজাঃ ৭৬৮-৯নং)*

খোদ মহানবী ﷺ-এর আমল ছিল জলদি ইফতার করা। আবূ আত্বিয়্যাহ বলেন, আমি ও মাসরূক আয়েশা (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, 'হে উম্মুল মুমেনীন! মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে একজন (সময় হওয়া মাত্র) তাড়াতাড়ি ইফতার করে ও তাড়াতাড়ি নামায পড়ে এবং অপর একজন দেরী করে ইফতার করে ও দেরী করে নামায পড়ে।' তিনি বললেন, 'ওদের মধ্যে কে তাড়াতাড়ি ইফতার করে ও তাড়াতাড়ি নামায পড়ে?' আমরা বললাম, 'আব্দুল্লাহ (অর্থাৎ ইবনে মাসঊদ)।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ এ রকমই (তাড়াতাড়ি ইফতার ও নামায আদায়) করতেন।' *(মুঃ ১০৯৯নং)*

সময় হওয়ার সাথে সাথে শীঘ্র ইফতার করা নবুয়তের একটি আদর্শ। মহানবী ﷺ বলেন, "তিনটি কাজ নবুয়তের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত; জলদি ইফতার করা, দেরী করে (শেষ সময়ে) সেহরী খাওয়া এবং নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা।" *(ত্বাবঃ, মাযাঃ ২/১০৫, সজাঃ ৩০৩৮-নং)*

বলা বাহুল্য, স্থানীয়ভাবে সূর্যের বৃত্তির সমস্ত অংশটা অদৃশ্য হয়ে (অস্ত) গেলে রোযাদারের উচিত, সাথে সাথে সেই সময় ইফতার করা। আর এ সময় নিম্ন আকাশে অবশিষ্ট লাল আভা থাকলেও তা দেখার নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "রাত যখন এদিক (পূর্ব গগণ) থেকে আগত হবে, দিন যখন এদিক (পশ্চিম গগণ) থেকে বিদায় নেবে এবং সূর্য যখন অস্ত যাবে, তখন রোযাদার ইফতার করবে।" *(বুঃ ১৯৪১, ১৯৫৪, মুঃ ১১০০, ১১০১, আদাঃ ২৩৫১, ২৩৫২, তিঃ, দাঃ)*

অতএব দেখার বিষয় হল সূর্যাস্ত; আযান নয়। সুতরাং রোযাদার যদি স্বচক্ষে দেখে যে, সূর্য ডুবে গেছে কিন্তু মুআযযিন এখনো আযান দেয়নি, তাহলেও তার জন্য ইফতার করা বৈধ। *(মুমঃ ৬/৪৩৯)*

পক্ষান্তরে পূর্বসতর্কতামূলকভাবে মুআযযিনদের দেরী করে আযান দেওয়া বিদআত। *(মুবিঃ ২৬৮-পৃঃ)*

❖ সূর্য ডোবার পর আবার সূর্য দেখলে ঃ

সূর্য ডোবার পর কোন মুসাফির বিমান বন্দরে ইফতার করার পর প্লেনে চড়ে আকাশে উঠে যদি সূর্য দেখে, তাহলে তার জন্য পানাহার থেকে বিরত থাকা এবং পুনরায় রোযায় থাকার নিয়ত করা জরুরী নয়। কারণ, সে তার রোযার পূর্ণ একটি দিন অতিবাহিত করে ফেলেছে। অতএব ইবাদত করার উদ্দেশ্যে তা শেষ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় শুরু করার কোন পথ নেই। আর তাকে ঐ দিন কাযাও করতে হবে না। কেননা, তার রোযা শুদ্ধ হয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে প্লেন উড়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করলে এবং মুসাফির ঐ দিনের রোযা পূর্ণ করতে চাইলে সে নিজের দেশের সময় অনুযায়ী ইফতার করতে পারবে না। বরং শূন্যে থাকা অবস্থায় যতক্ষণ না সূর্য অস্তমিত হতে দেখবে, ততক্ষণ সে রোযায় থাকতে বাধ্য; যদিও তাতে দিন অনেক লম্বা হবে।

অনুরূপ ইফতার করার জন্য আকাশের যে লেভেলে এসে সূর্য দেখা যায় না সে লেভেলে প্লেন নামিয়ে আনা পাইলটের জন্য বৈধ নয়। কারণ, তা এক প্রকার ছল-বাহানা। অবশ্য যদি উড্ডয়নের কোন স্বার্থে বিমান নিচের লেভেলে নামাতে হয় এবং সেখানে এসে সূর্য অদৃশ্য হয়, তাহলে ইফতার করা যাবে। *(মবঃ ১৪/১২৫, ১৬/১৩০, ৩০/১২৩, ৭০ঃ ১৯নং)*

❖ সূর্য ডুবে গেছে মনে করে ইফতার করলে ঃ

সূর্য ডুবে গেছে মনে করে রোযাদার ইফতার করে নেওয়ার পর যদি জানা যায় যে, সূর্য এখনও ডুবে নি, তাহলে সঠিক মতে তার রোযা শুদ্ধ; তাকে কাযা করতে হবে না। কারণ, সে না জেনেই ইফতার করে ফেলেছে। আর অবস্থা (সময়) না জেনে রোযা নষ্টকারী জিনিস ব্যবহার করলে তার এ (না জানার) ওযর গ্রহণযোগ্য। তা ছাড়া আসমা বিন্তে আবী বাক্র (রাঃ) বলেন, 'নবী ﷺ-এর যুগে একদা আমরা মেঘলা দিনে ইফতার করলাম। তারপর সূর্য দেখা গেল।' *(বুঃ ১৯৫৯, আদাঃ ২৩৫৯, ইমাঃ ১৬৭৪নং)* সুতরাং তাঁরা সূর্য ডুবে গেছে মনে করেই দিনের বেলায় ইফতার করেছিলেন। অতএব অবস্থা বা সময় তাঁদের অজানা ছিল; শরয়ী নির্দেশ নয়। তাঁদের ধারণায় ছিল না যে, সে সময়টা দিনের বেলা। আর মহানবী ﷺ তাঁদেরকে সে দিনকে কাযা করতেও আদেশ দেননি। পক্ষান্তরে (উক্ত অবস্থায়) কাযা ওয়াজেব হলে তা শরীয়তরূপে পরিগণিত এবং তার বর্ণনা আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত হত। অতএব তা যখন সুরক্ষিত নেই এবং সে ব্যাপারে কোন নির্দেশ মহানবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত নেই, তখন মৌলিক অবস্থা হল, দায়িত্বমুক্ত হওয়া এবং কাযা না করা। *(মুমঃ ৬/৪০২-৪০৩, ৪১০-৪১১)*

❖ কি দিয়ে ইফতারী হবে?

কিছু আধা-পাকা অথবা পূর্ণ পাকা (শুষ্ক) খেজুর দিয়ে এবং তা না পাওয়া গেলে পানি দিয়ে ইফতার করা সুন্নত।

আনাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ নামাযের পূর্বে কিছু আধা-পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তা না পেলে পূর্ণ পাকা (শুকনা) খেজুর দিয়ে এবং তাও না পেলে কয়েক ঢোক পানি খেয়ে নিতেন।' *(আঃ ৩/১৬৪, আদাঃ ২৩৫৬, তিঃ ৬৯৬, ইমাঃ ২০৬৫, দারাঃ ২৪০, হাঃ*

১/৪৩২, বাঃ ৪/২৩৯, ইগঃ ৯২২নং)

তিনি আরো বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি খেজুর পায়, সে যেন তা দিয়ে ইফতার করে। যে ব্যক্তি তা না পায়, সে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কারণ, তা হল পবিত্র।” *(তিঃ, নাঃ, হাঃ, ইখুঃ ২০৬৬, সজাঃ ৬৫৮৩নং)*

তিনি আরো বলেন, ‘নবী ﷺ ৩টি খেজুর দ্বারা অথবা এমন খাবার দ্বারা ইফতার করতে পছন্দ করতেন, যাকে আগুন স্পর্শ করে নি।’ *(আয়াঃ, সতাঃ ১০৬৪নং)*

ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন, ‘নবী ﷺ খেজুর দ্বারা ইফতার করতে এবং তা না পাওয়া গেলে পানি দ্বারা ইফতার করতে উৎসাহিত করতেন। আর এ হল উম্মতের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ দয়া ও হিতাকাঙ্খার নিদর্শন। পেট খালি থাকা অবস্থায় প্রকৃতি (পাকস্থলী)কে মিষ্টি জিনিস দিলে তা অধিকরূপে গ্রহণ করে এবং তদ্দ্বারা বিভিন্ন শক্তিও উপকৃত হয়; বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তি এর দ্বারা বৃদ্ধি পায়। মদীনার মিষ্টি হল খেজুর। খেজুর মদীনাবাসীর মিষ্টান্ন। খেজুরের উপরই তাদের লালন-পালন। খেজুর তাদের প্রধান খাদ্য এবং তা-ই তাদের সহযোগী খাদ্য। আর অর্ধপক্ক খেজুর তাদের ফলস্বরূপ।

পক্ষান্তরে পানিও (এ সময়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস।) রোযার ফলে কলিজায় এক প্রকার শুষ্কতা আসে। সুতরাং তা প্রথমে পানি দিয়ে আর্দ্র করলে তারপর খাদ্য দ্বারা উপকার পরিপূর্ণ হয়। এ জন্য পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য উত্তম হল, প্রথমে একটু পানি পান করে তারপরে খেতে শুরু করা। এ ছাড়া খেজুর ও পানিতে এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, হার্টের উপকারিতায় যার প্রভাবের কথা কেবল ডাক্তারগণই জানেন।’ *(যামাঃ ২/৫০-৫১)*

বলা বাহুল্য, কারো কাছে পানি ও মধু থাকলে, পানিকে প্রাধান্য দিয়ে পানি দ্বারা ইফতার করবে। কেননা রসূল ﷺ বলেন, “--- যে ব্যক্তি তা না পায়, সে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কারণ, তা হল পবিত্র।” অবশ্য পানি পান করার পর মধু খাওয়া দোষাবহ নয়। *(মুমঃ ৬/৪৪২)*

এই ভিত্তিতেই খালি পেটে উপকারী বলে দাবী করে প্রথমে আদা-লবণ অথবা (খেজুর ছাড়া) অন্য কোন জিনিস মুখে নিয়ে ইফতার করা সুন্নতের প্রতিকূল। অবশ্য প্রথমে এক ঢোক পানি খেয়ে তারপর ঐ সব খেতে দোষ নেই।

ইফতার করার সময় খাওয়ার মত কোন জিনিস না পাওয়া গেলে মনে মনে ইফতারের নিয়ত করাই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে আঙ্গুল চোষার প্রয়োজন নেই - যেমন কিছু সাধারণ লোক করে থাকে। যেমন রুমালকে থুথু দিয়ে ভিজিয়ে তা চোষাও বিধেয় নয়। *(ঐ)*

জ্ঞাতব্য যে, অনেক লোকেই এই মাসের ইফতারের সময় বড় লম্বা-চওড়া দস্তরখান বিছিয়ে থাকে। যাতে সাজানো হয় (চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়) নানা রকম পানাহার সামগ্রী। কখনো কখনো সাধ্যের বাইরে নানান ধরনের গোশ্ত, শাক-সব্জি, ফল-মূল, শরবত-জুস ও ক্ষীর-সামাই-পিঠা-পুরি ইত্যাদির সম্ভার প্রস্তুত করা হয়। যার অনেকাংশ প্রয়োজনের অতিরিক্ত; বিধায় তা ফেলে দিতে হয়। যা নিঃসন্দেহে হারাম। রমযান আমাদের কাছে তা চায় না। তাছাড়া অপচয় শরীয়তে নিষিদ্ধ ও নিন্দিত। মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, তোমরা খাও এবং পান কর। আর অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না। *(কুঃ ৭/৩১)*

([illegible])

অর্থাৎ, তোমরা কিছুতেই অপব্যয় করো না। কারণ, অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। *(কুঃ ১৭/২৬-২৭)*

বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে আমাদেরকে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা উচিত। উচিত নয়, নিষিদ্ধ কৃপণদের পথ অবলম্বন করা। যেমন উচিত নয়, অপচয় ও অপব্যয়ের হারাম পথ গ্রহণ করা। *(তাফাসাসাঃ ৩৩-৩৪পৃঃ)*

❖ ইফতারের সময়ঃ

যেমন পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, সূর্যের পুরো বৃত্ত অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে ইফতারের সময় হয়। আর সে সময় হল মাগরেবের নামাযের আগে। ইফতার করে নামায পড়ার পর প্রয়োজনীয় আহার ভক্ষণ করবে রোযাদার। অবশ্য যদি আহার প্রস্তুত থাকে, তাহলে প্রথমে আহার খেয়েই নামায পড়বে। যেহেতু আনাস ﵁ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "রাতের খাবার উপস্থিত হলে মাগরেবের নামায পড়ার আগে তোমরা তা খেয়ে নাও। আর সে খাবার খেতে তাড়াহুড়া করো না।" *(বুঃ ৬৭২, মুঃ ৫৫৭নং)*

কিন্তু সময় হওয়ার পূর্বে ইফতার করা হতে সাবধান! কারণ, মহানবী ﷺ একদল লোককে (স্বপ্নে) দেখলেন যে, তারা তাদের পায়ের গোড়ালির উপর মোটা শিরায় (বাঁধা অবস্থায়) লটকানো আছে, তাদের কশগুলো কেটে ও ছিঁড়ে আছে এবং কশ বেয়ে রক্তও ঝরছে। নবী ﷺ বলেন, আমি বললাম, 'ওরা কারা?' তাঁরা বললেন, 'ওরা হল তারা; যারা সময় হওয়ার পূর্বে-পূর্বেই ইফতার করে নিত---।" *(ইখুঃ, ইহিঃ, বাঃ ৪/২১৬, হাঃ ১/৪৩০, সতাঃ ৯৯১নং)*

রোযা অবস্থায় দুআ

রোযাদারের উচিত, ইফতার করার আগে পর্যন্ত রোযা থাকা অবস্থায় বেশী বেশী করে দুআ করা। কারণ, রোযা থাকা অবস্থায় রোযাদারের দুআ আল্লাহর নিকট মঞ্জুর হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির দুআ অগ্রাহ্য করা হয় না (বরং কবুল করা হয়); পিতার দুআ,

রোযাদারের দুআ এবং মুসাফিরের দুআ।” *(বাঃ ৩/৩৪৫, প্রমুখ, সিসঃ ১৭৯৭নং)*

পক্ষান্তরে ইফতার করার সময় দুআ কবুল হওয়ার কথা বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ ব্যাপারে যা কিছু বর্ণনা করা হয়, তা যয়ীফ। অনুরূপ ইফতারের সময় একাকী বা জামাআতী হাত তুলে দুআও বিধেয় নয়। কারণ, সুন্নাহ (মহানবী ﷺ বা তাঁর সাহাবাগণের তরীকায়) এ আমলের বর্ণনা মিলে না। অতএব রোযাদার সতর্ক হন।

এ স্থলে পানাহার করার সময় যে সব দুআ সাধারণভাবে পঠনীয় তা নিম্নরূপ ঃ-

১। পানাহারের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা। কারণ, মহানবী ﷺ তা বলতে আদেশ করেছেন। *(বুঃ ৫৩৭৬, মুঃ ২০২২নং)* আর তিনি এ কথাও জানিয়েছেন যে, তা না বললে শয়তান ভোজনকারীর সাথে ভোজনে অংশ গ্রহণ করে থাকে। *(মুঃ ২০১৭, আদাঃ ৩৭৬৬নং)* একদা একটি বালিকা এবং একজন বেদুঈন ‘বিসমিল্লাহ’ না বলেই খেতে শুরু করতে চাইলে মহানবী ﷺ তাদের হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন যে, শয়তান তাদেরকে এভাবে খেতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তাদের হাতের সাথে শয়তানের হাত তাঁর হাতে ধরা আছে। আসলে শয়তান তাদের সাথে খেতে চাচ্ছিল। *(ঐ)*

২। খাওয়ার শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে ভুলে গেলে এবং খেতে খেতে মনে পড়লে বলতে হয়,

[illegible]

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহু অ আ-খিরাহ।

অর্থ- শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নাম নিয়ে খাচ্ছি। *(আদাঃ ৩৭৬৭, তিঃ ১৮৫৮, ইমাঃ ৩২৬৪, ইগঃ ১৯৬৫নং)*

৩। খাওয়া শেষ হলে ‘আল-হামদু লিল্লাহ’ বলতে হয়। যেহেতু কিছু খাওয়া অথবা পান করার পরে বান্দা আল্লাহর প্রশংসা করুক এটা তিনি পছন্দ করেন। *(মুঃ ২৭৩৪, আঃ ৩/ ১০০, ১১৭, তিঃ ১৮ ১৬নং)*

আর ইফতার করার সময় যে দুআ প্রমাণিত, তা ইফতার করার পর পঠনীয়। ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ ইফতার করলে এই দুআ বলতেন,

[illegible]

উচ্চারণঃ- যাহাবায যামা-উ অবতাল্লাতিল উরুক্বু অযাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ।

অর্থ- পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হল এবং ইনশা-আল্লাহ সওয়াব সাব্যস্ত হল। *(আদাঃ ২৩৫৭, সআদাঃ ২০৬৬নং)*

ইফতারের সময় এই দুআয় সবচেয়ে সহীহরূপে নবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া ইফতারের অন্যান্য (লাকা সুমতু, ইত্যাদি) দুআ বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত নয়।

রোযার অন্যান্য আদব

‘ভোগে কেবল দুর্ভোগ সার, বাড়ে দুখের বোঝা,
ত্যাগ শিখ্ তুই সংযম শিখ্, সেই তো আসল রোযা।
এই রোযার শেষে ঈদ আসিবে, রইবে না বিষাদ।।’ *-কাজী নজরুল*

Contents

❖ রোযাবিরোধী কর্ম থেকে বিরত থাকা এবং রোযা নির্মল করা ঃ

যে সকল শ্রেষ্ঠ ইবাদত দ্বারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়, তন্মধ্যে রোযা হল অন্যতম। আল্লাহ তা বান্দার জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন, যাতে করে বান্দা তদ্দ্বারা নিজের আত্মা ও মনকে সংশুদ্ধ করতে পারে এবং প্রত্যেক কল্যাণের উপর তাকে অভ্যস্ত করতে পারে। সুতরাং রোযা রাখা অবস্থায় রোযাদারকে এমন সব কর্ম থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়, যা তার রোযাকে দূষিত করে ফেলে। যাতে সে তার রোযা দ্বারা পুরোপুরি উপকৃত হতে পারে। তদ্দ্বারা সেই 'তাকওয়া' ও 'পরহেযগারী' লাভ হয়, যার কথা তিনি কুরআনে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।" *(কুঃ ২/১৮৩)*

কেবলমাত্র পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম রোযা নয়। বরং রোযা পানাহার থেকে এবং অনুরূপ সকল সেই বস্তু থেকে বিরত থাকার নাম, যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। যদিও নিষিদ্ধ কর্ম সকল মাসেই নিষিদ্ধ, তবুও বিশেষ করে রমযান মাসে রোযা অবস্থায় তা বেশী করে নিষিদ্ধ।

রোযা রোযাদারকে যদি পানাহার থেকে বিরত রাখে; যা তার জীবন ধারণের জন্য জরুরী এবং তাকে সকল যৌনাচার থেকে বিরত রাখে; যা তার দৈহিক ক্ষুধার প্রকৃতিগত বাসনা, তাহলে তার জন্য ওয়াজেব ও জরুরী এই যে, সে কোন প্রকারের পাপাচরণে লিপ্ত হবে না; তাতে সে পাপ যেমনই হোক। সে কোন প্রকারের অসার ক্রিয়া-কলাপে লিপ্ত হবে না; তাতে তার ধরন যেমনই হোক। সে তার রোযা অবস্থায় থাকার সময়টুকুতে ইবাদতের অনুকূল আচরণে চরিত্রবাণ থাকবে। কারণ, ইবাদতে সে আল্লাহর সামনে হাযির থাকে। অতএব প্রত্যেক কথা বলার পূর্বে সে চিন্তা করবে, প্রত্যেক কর্ম করার পূর্বে সে ভেবে দেখবে যে, তার সে কথা ও কর্ম তার ইবাদত রোযার অনুকূল কি না? সে কথা বা কর্ম তাঁকে সন্তুষ্ট করবে কি, যাঁর সামনে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সে উপস্থিত? *(দ্রঃ ফিসুঃ ১/৪০৫, সারাঃ ২১-২২পৃঃ)*

আর যদি রোযাদার তা না করতে পারে, তাহলে সে এমন রোযাদারদের দলে শামিল হয়ে যাবে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কিছু রোযাদার আছে, যাদের রোযায় ক্ষুধা ছাড়া অন্য কিছু লাভ হয় না এবং কিছু তাহাজ্জুদগুযার আছে, যাদের তাহাজ্জুদে রাত্রি জাগরণ ছাড়া অন্য কিছু লাভ হয় না।" *(ইমাঃ, আঃ, হাঃ, বাঃ, ত্বাবঃ, সজাঃ ৩৪৮৮, ৩৪৯০নং)*

বলা বাহুল্য, যে রোযাদারের রোযা তার জন্য ঢালস্বরূপ হবে, যে রোযার মাধ্যমে সে 'রাইয়ান' নামক দরজা দিয়ে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, তা হল সেই রোযা, যে রোযা রেখে থাকে রোযাদারের হৃদয় এবং তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

❖ জিভের রোযা ঃ

রোযাদারের উচিত, যেন তার জিভও রোযা রাখে। অর্থাৎ, সে যেন প্রত্যেক নোংরা কথা থেকে; পরচর্চা বা গীবত থেকে, চুগলখোরী বা লাগান-ভাজান থেকে, অশ্লীল ও মিথ্যা কথা থেকে বিরত থাকে। দূরে থাকে মূর্খামি ও বেওকুফি করা থেকে। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রোযা রেখে নোংরা কথা ও তার উপর আমল ত্যাগ করতে পারল না, সে ব্যক্তির পানাহার ত্যাগ করার মাঝে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" *(বুঃ ৬০৫৭, ইমাঃ ১৬৮৯, আঃ*

২/৪৫২, ৫০৫, সুআঃ) অর্থাৎ, তার রোযা কবুল করার ব্যাপারে তাঁর কোন ইচ্ছা নেই। আর তার মানে তার রোযা আল্লাহ কবুল করেন না। *(দ্রঃ ফবাঃ ৪/ ১৪০)*

রোযাদারের উচিত, অশ্লীলতা, হৈ-হট্টগোল ও গালাগালি করা থেকে দূরে থাকা এবং ভদ্রতা, আদব ও গাম্ভির্য অবলম্বন করা। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কারো রোযার দিন হলে সে যেন অশ্লীল না বকে ও ঝগড়া-হৈচৈ না করে; পরন্তু যদি তাকে কেউ গালাগালি করে অথবা তার সহিত লড়তে চায়, তাহলে সে যেন বলে, 'আমি রোযা রেখেছি, আমার রোযা আছে।" *(বুঃ ১৯০৪, মুঃ ১১৫১নং)*

তিনি আরো বলেন, "পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম রোযা নয়। আসলে রোযা হল, অসার ও অশ্লীল কথা ও কর্ম থেকে বিরত থাকার নাম। অতএব যদি তোমাকে কেউ গালাগালি করে অথবা তোমার সহিত কেউ মুর্খামি করে, তাহলে তুমি তাকে বল, 'আমি রোযা রেখেছি, আমার রোযা আছে।" *(ইখুঃ, ইহিঃ, হাঃ, সতাঃ ১০৬৮, সজাঃ ৫৩৭৬নং)*

সুতরাং রোযাদারকে কেউ গালি দিলে তার বিনিময়ে গালিদাতাকে 'আমি রোযা রেখেছি' বলা সুন্নত। আর এই জবাবে রয়েছে দুটি উপকার; একটিতে রয়েছে নিজের জন্য সতর্কতা এবং অপরটিতে রয়েছে তার বিরোধী পক্ষের জন্য সতর্কতা।

প্রথম উপকার এই যে, রোযাদার এই জন্যই গালিদাতার গালির বদলা নিয়ে মুকাবালা করতে চায় না, কারণ সে রোযা রেখেছে। এ জন্য নয় যে, সে মুকাবালা করতে অক্ষম। যেহেতু সে যদি অক্ষমতা প্রকাশ করে মুকাবালা ত্যাগ করে, তাহলে বিরোধী পক্ষের কাছে সে তুচ্ছ হয়ে যায় এবং তাতে রোযাদার লাঞ্ছিত হয়। পক্ষান্তরে ঐ জবাবে বিরোধী পক্ষ লজ্জিত হয় এবং গালাগালি বা লড়াই করা অব্যাহত রাখতে আর সাহস পায় না।

আর দ্বিতীয় উপকার এই যে, উক্ত জবাবের মাধ্যমে রোযাদার বিরোধী পক্ষকে এই সতর্কতা দান করে যে, রোযা অবস্থায় কাউকে গালাগালি করতে হয় না। সে ক্ষেত্রে গালিদাতাও রোযাদার হতে পারে; বিশেষ করে এই গালাগালি যদি রমযান মাসে হয়। আর তা হলে উভয়েই নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং রোযাদারের ঐ উত্তর তাকে গালি দেওয়া থেকে নিষেধ করার পর্যায়ভুক্ত হবে। পরন্তু গালি দেওয়া হল একটি মন্দ কাজ; যাতে বাধা দেওয়া জরুরী। *(দ্রঃ মুমঃ ৬/৪৩৭, ৪৮ঃ ১২পৃঃ)*

কোন কোন বর্ণনাতে আছে যে, "রোযা রেখে তুমি কাউকে গালাগালি করো না। কিন্তু যদি তোমাকে কেউ গালাগালি করে, তাহলে তুমি তাকে বল, 'আমি রোযা রেখেছি। আর সে সময় যদি তুমি দাঁড়িয়ে থাক, তাহলে বসে যাও।" *(ইখুঃ ১৯৯৪, ইহিঃ, মাওয়ারিদ ৮৯৭, সতাঃ ১০৬৮নং)* কারণ, ক্রোধান্বিত অবস্থায় বসে গেলে ক্রোধ প্রশমিত হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ক্রোধান্বিত হয়, তখন সে যেন বসে যায়। তাতে তার ক্রোধ প্রশমিত হলে ভাল, না হলে সে যেন শুয়ে যায়।" *(আঃ ৫/ ১৫২, আদাঃ, ইহিঃ, সজাঃ ৬৯৪নং)*

রোযাদারের জন্য ওয়াজেব, তার জিভও যেন রোযা রাখে; অর্থাৎ, তাতে যেন সে (গীবত ও চুগলখোরী করে) লোকেদের গোশ্ত না খায়, তাদের ইজ্জত বিক্ষত না করে এবং তাদের আপোসে বিবাদ সৃষ্টি না করে।

তার জিভ যেন মুসলিমদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে, তাদের সম্ভ্রম নষ্ট করা থেকে এবং তাদের

মাঝে অশ্লীলতা ছড়ানো থেকে রোযা রাখে।

তার জিভ যেন বাজে কথা থেকে, গুজব রটানো থেকে, নিরপরাধকে অপবাদ ও কলঙ্ক আরোপ করা থেকে এবং দ্বীনদার মানুষদের সুনাম নষ্ট করে বদনাম করা থেকে রোযা রাখে।

তার জিভ যেন ধ্বংসকারী অন্ধ পক্ষপাতিত্ব করা থেকে এবং রাগ ও ক্রোধের সময় নোংরা ও অশ্লীল বলা থেকে রোযা রাখে।

তার জিভ যেন গালাগালি করা থেকে, অপরকে হিট মারা থেকে এবং সমাজ-বিরোধী অপরাধীদেরকে গোপন রাখা এবং তাদের তরফদারী করা থেকে রোযা রাখে।

তার জিভ যেন কানে-কানে অথবা ফোনে-ফোনে অবৈধ মহিলার সাথে প্রেমালাপ করা থেকে রোযা রাখে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষকে তাদের নিজ জিহ্বা-জাত পাপ ছাড়া অন্য কিছু কি তাদের মুখ অথবা নাক ছেঁচড়ে দোজখে নিক্ষেপ করবে?' *(তিঃ ২৬১৫, ইমাঃ ৩৯৭৩, আঃ ৫/২৩১, ইগঃ ৪১৩নং)*

❖ হৃদয়ের রোযা ঃ

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা হল হৃদয়। বলা বাহুল্য, এই হৃদয় যখনই শরয়ী রোযা রাখবে, তখনই সারা অঙ্গে তা কার্যকর হবে। প্রিয়তম মুস্তাফা ﷺ বলেন, "জেনে রাখ, দেহের মধ্যে এমন এক মাংস-পিন্ড আছে যা ভালো হলে সারা দেহ ভালো হবে এবং তা খারাপ হলে সারা দেহ খারাপ হবে। শোন! তা হল হৃৎপিন্ড (অন্তর)।" *(বুঃ ৫২, মুঃ ১৫৯৯নং)*

সুতরাং মুমিনের হৃদয় রমযান মাসে এবং অন্য মাসেও রোযা রাখে। আর তার রোযা হবে তাকে বিধ্বংসী শির্ক, বাতিল বিশ্বাস, নোংরা চিন্তা-ভাবনা, হীন পরিকল্পনা এবং খারাপ কল্পনার মত নিকৃষ্ট উপাদান থেকে খালি করে।

মুমিনের হৃদয় রোযা রাখে অহংকার থেকে। কারণ, বিনয়ই মুমিনকে শ্রদ্ধার পাত্র করে এবং তার সচ্চরিত্রই তাকে পূর্ণ মানবতার রূপদান করে। পক্ষান্তরে অহংকার হল, ন্যায়, হক ও সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করার নাম। আর মহানবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক দাম্ভিক অহংকারী জাহান্নামবাসী হবে।" *(বুঃ ৪৯১৮, মুঃ ২৮৫৩নং)*

মুমিনের হৃদয় রোযা রাখে গর্ব করা থেকে। কারণ, "যে ব্যক্তি মনে মনে গর্বিত হয় এবং চলনে অহংকার প্রদর্শন করে, সে ব্যক্তি যখন আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে তখন তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন।" *(আঃ, বুঃ আল-আদাবুল মুফরাদ, হাঃ ১/৬০, সজাঃ ৬১৫৭নং)*

মুমিনের হৃদয় রোযা রাখে অপরের প্রতি হিংসা করা থেকে। কারণ, "কোন বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও হিংসা একত্রে জমা হতে পারে না।" *(আঃ ২/৩৪০, নাঃ, ইহিঃ, বাঃ শুআবুল ঈমান, হাঃ, সজাঃ ৭৬২০নং)*

মুমিনের হৃদয় রোযা রাখে কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে। কারণ, "বিদ্বেষ হল মুন্ডনকারী। তা দ্বীন মুন্ডন (ধ্বংস) করে ফেলে।" *(তিঃ, বাযঃ, বাঃ, সতিঃ ২০৩৮নং)*

মুমিনের হৃদয় রোযা রাখে কৃপণতা থেকে। কারণ, "কোন বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও কৃপণতা কখনই একত্রে জমা হতে পারে না।" *(আঃ ২/৩৪২, নাঃ, হাঃ ২/৭২, সজাঃ ৭৬১৬নং)*

মুমিনের হৃদয় রোযা রাখে পাপ চিন্তা করা থেকে এবং প্রত্যেক সেই পরিকল্পনা থেকে, যা ঈমানের প্রতিকূল। *(দ্রঃ ফারারাঃ ১৭৬পৃঃ, তাসাসাঃ ২০-২১পৃঃ, আসাঃ ১৯পৃঃ)*

❖ চোখের রোযা ঃ

মহান আল্লাহর হারামকৃত জিনিস দেখা হতে বিরত থেকে রোযাদারের চোখ রোযা রাখে। হারাম কিছু চোখে পড়লে সে তার চক্ষুকে অবনত করে নেয়, অশ্লীল কিছু দেখা হতে দৃষ্টিকে ঝুঁকিয়ে রাখে। যেমন, সে নোংরা ফিল্ম্ এবং শ্লীলতাহীন টিভি সিরিজ ইত্যাদি দেখা হতে বিরত থাকে। যেহেতু মহান আল্লাহ মুমিন পুরুষদেরকে সম্বোধন করে বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং নিজ নিজ যৌনাঙ্গের হিফাযত করে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। *(কুঃ ২৪/৩০)*

আর মুমিন নারীদেরকে সম্বোধন করে তিনি বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং নিজ নিজ যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। *(কুঃ ২৪/৩১)*

❖ কানের রোযা ঃ

রোযাদারের কানও রোযা রাখে; রোযা রাখে নোংরা ও অশ্লীল কথা শোনা থেকে।

রোযা রাখে অবৈধ প্রেম ও ব্যভিচারের দিকে আহবানকারী গান-বাজনা শোনা থেকে।

রোযা রাখে আল্লাহর হারামকৃত এবং যে কথা তাঁকে ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট করে সে কথা শোনা থেকে।

মুমিনের কান রোযা রাখে শয়তানের সুর শোনা থেকে এবং ইফতার করে রহমানের বাণী শ্রবণ করে।

আর তিনি তার কান সম্পর্কে সেদিন কৈফিয়ত নেবেন, যেদিন মানব-দানবকে একত্রিত করবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় -ওদের প্রত্যেকের বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করা হবে।” *(সূরা বানী ইসরাঈল ৩৬ আয়াত)*

❖ পেটের রোযা ঃ

রোযাদারের পেটও রোযা রাখে; রোযা রাখে হারাম খাদ্য দ্বারা তা পরিপূর্ণ করা থেকে। সুতরাং সে হারাম খাবার সেহরীতে খায় না এবং ইফতারীতেও না। সে (ব্যাংকের বা অন্য কোন প্রকার) সূদ খায় না। খায় না ঘুস, এতীমের মাল এবং হারাম উপায়ে উপার্জিত কোন অর্থ।

কেননা, যে ব্যক্তি নিজ উদরে হারাম মাল প্রবেশ করায়; অর্থাৎ, তার খাদ্য ও পানীয় হারাম হয়, তার দুআ কবুল হয় না। আর মহান আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করে বলেন,

[illegible]

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে সব রুজী দান করেছি তা থেকে হালাল বস্তু আহার কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা কর; যদি তোমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব করে থাক তাহলে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত)*

❖ উভয় হাত ও পায়ের রোযা ঃ

রোযাদারের উচিত, তার হাতও যেন হারাম নেওয়া, ধরা ও স্পর্শ করা থেকে রোযা রাখে। সুতরাং যে মহিলাকে স্পর্শ করা তার জন্য হালাল নয়, তাকে যেন স্পর্শ না করে। *(ফইঃ ২/১২০)*

তার হাত যেন রোযা রাখে মানুষের উপর অত্যাচার করা থেকে, কাউকে ধোকা দেওয়া থেকে, কাউকে অন্যায়ভাবে মারা থেকে, সূদ, ঘুস, চুরি, ভেজাল বা অন্য হারাম কারবারের মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করা থেকে।

যেমন তার পাও যেন রোযা রাখে। আর তার রোযা হবে যে পথে গেলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সে পথে তথা সকল প্রকার পাপাচরণের পথে চলা হতে বিরত থেকে। *(অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোযা প্রসঙ্গে দ্রঃ ফারারাঃ ১৮৪- ১৮৬পৃঃ, তাসাসাঃ ২১-২৯পৃঃ)*

আর প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি রোযা রেখে হারাম কথা ও তার উপর আমল ত্যাগ করতে পারল না, সে ব্যক্তির পানাহার ত্যাগ করার মাঝে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।” *(বুঃ ৬০৫৭, ইমাঃ ১৬৮৯, আঃ ২/৪৫২, ৫০৫)* হারাম কথার উপর আমল করার মানে হল, প্রত্যেক হারাম কাজ করা।

মোট কথা হল, রোযাদারের উচিত, যাবতীয় পাপাচার, সমস্ত রকম হারাম কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকা। তবেই তার রোযা তার জন্য উপকারী হবে; নচেৎ না।

সপ্তম অধ্যায়

রোযা অবস্থায় যা বৈধ

কিছু কাজ আছে, যা রোযা অবস্থায় করা বৈধ নয় বলে অনেকের মনে হতে পারে, অথচ তা রোযাদারের জন্য করা বৈধ। সেই ধরনের কিছু কাজের কথা নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ-

1। পানিতে নামা, ডুব দেওয়া ও সাঁতার কাটা ঃ

রোযাদারের জন্য পানিতে নামা, ডুব দেওয়া ও সাঁতার কাটা, একাধিক বার গোসল করা, এসির হাওয়াতে বসা এবং কাপড় ভিজিয়ে গায়ে-মাথায় জড়ানো বৈধ। যেমন পিপাসা ও গরমের তাড়নায় মাথায় পানি ঢালা, বরফ বা আইসক্রিম চাপানো দোষাবহ নয়। *(ফুসিতাযাঃ ১৬পৃঃ, তাইরাঃ ৪৬পৃঃ, ফইঃ ২/১৩০, ফাসিঃ ৪৭পৃঃ, ৭০ঃ ৫৮-নং)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রোযা রেখে নবী ﷺ-এর অপবিত্র অবস্থায় ফজর হত। অতঃপর তিনি গোসল করতেন। *(বুঃ ১৯২৫, মুঃ ১১০৯নং)*

আবূ বাক্র বিন আব্দুর রহমান নবী ﷺ-এর কিছু সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সাহাবী) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দেখেছি, তিনি রোযা রেখে পিপাসা অথবা গরমের কারণে নিজ মাথায় পানি ঢেলেছেন। *(আঃ ৩/৪৭৫, আদাঃ ২৩৬৫নং, মাঃ)*

রোযা রাখা অবস্থায় ইবনে উমার একটি কাপড় ভিজিয়ে নিজের দেহের উপর রেখেছেন। *(ইআশাঃ ৯২১২নং)*

অবশ্য সাঁতার কেটে খেলা করা মকরূহ। কারণ, তাতে রোযা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই। কিন্তু যার কাজই হল ডুবরীর অথবা প্রয়োজনের তাকীদে পানিতে বারবার ডুব দিতে হয়, সে ব্যক্তি পেটে পানি পৌঁছনো থেকে সাবধান থাকতে পারলে তার রোযার কোন ক্ষতি হবে না। *(৭০ঃ ৫৮-নং)*

2। মিসওয়াক বা দাঁতন করা।

দাঁতন করা রোযাদার-অরোযাদার সকলের জন্য এবং দিনের শুরু ও শেষ ভাগে সব সময়কার জন্য সুন্নত। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ-এর নির্দেশ ব্যাপক; তিনি বলেন, "দাঁতন করায় রয়েছে মুখের পবিত্রতা এবং প্রতিপালক আল্লাহর সন্তুষ্টি। *(আঃ ৬/৪৭, দাঃ, নাঃ ৫নং, ইখুঃ, বাঃ ১/৩৪, ইহিঃ, বুঃ (বিনা সনদে), মিঃ ৩৮১, ইগঃ ৬৬নং)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "আমি উম্মতের জন্য কষ্টকর না জানলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় দাঁতন করতে আদেশ দিতাম।" *(বুঃ ৮৮৭, মুঃ ২৫২, সুআঃ)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "---তাদেরকে প্রত্যেক ওযূর সময় দাঁতন করতে আদেশ দিতাম।" *(আঃ ২/৪৬০, ৫১৭, প্রমুখ)*

ইমাম ত্বাবারানী উত্তম সনদ দ্বারা বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুর রহমান বিন গুনম্ বলেন, আমি মুআয বিন জাবাল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি কি রোযা অবস্থায় দাঁতন করব?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' আমি বললাম, 'দিনের কোন্ ভাগে?' তিনি বললেন, 'সকাল অথবা বিকালে।' আমি বললাম, 'লোকে তো রোযার বিকালে দাঁতন করাকে অপছন্দনীয় মনে করে। তারা বলে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুবাস অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধময়।" মুআয ﷺ বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! তিনি তাদেরকে দাঁতন করতে আদেশ দিয়েছেন। আর যে জিনিস তিনি পরিষ্কার করতে আদেশ দিয়েছেন, সে জিনিসকে ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্গন্ধময় করা উত্তম হতে পারে না। তাতে কোন প্রকারের মঙ্গল নেই; বরং তাতে অমঙ্গলই আছে।' *(দ্রঃ ইগঃ ১/১০৬)*

কিন্তু যদি কোন দাঁতনে বিশেষ স্বাদ থাকে এবং তা তার থুথুকে প্রভাবান্বিত করে, তাহলে তার স্বাদ বা থুথু গিলে নেওয়া উচিত নয়। *(ইবনে উষাইমীন, ফাসিঃ মুসনিদ ৩৯পৃঃ)* পরন্তু সেই

দাঁতন করা থেকে দূরে থাকা উচিত, যার দ্রবণশীল উপাদান (ও রস) আছে। যেমন কাঁচা (গাছের ডালের বা শিকড়ের) দাঁতন। তদনুরূপ সেই দাঁতন, যাতে তার নিজস্ব স্বাদ ছাড়া ভিন্ন স্বাদ; যেমন লেবু বা পুদীনা (পেপারমেন্ট, মেনথল) ইত্যাদির স্বাদ অতিরিক্ত করা হয়েছে এবং যা মুখের ভিতরে গিয়ে দ্রবীভূত হয়ে মুখগহ্বরে ছড়িয়ে পড়ে। আর ইচ্ছা করে তা গিলে ফেলা বৈধ নয়। তবে যদি অনিচ্ছাকৃত কারো গিলা যায়, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি হয় না। *(৭০ঃ ৫৪নং)*

পক্ষান্তরে রোযার দিনে দাঁতের মাজন (টুথ পেষ্ট্ বা পাওডার) ব্যবহার না করাই উত্তম। বরং তা রাত্রে এবং ফজরের আগে ব্যবহার করা উচিত। কারণ, মাজনের এমন প্রতিক্রিয়া ও সঞ্চার ক্ষমতা আছে, যার ফলে তা গলা ও পাকস্থলীতে নেমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অনুরূপ আশঙ্কার ফলেই মহানবী ﷺ লাকীত্ব বিন সাবরাহকে বলেছিলেন, "(ওযূ করার সময়) তুমি নাকে খুব অতিরঞ্জিতভাবে পানি টেনে নিও। কিন্তু তোমার রোযা থাকলে নয়।" *(আঃ ৪/৩৩, আদাঃ ১৪২, তিঃ, নাঃ, সইমাঃ ৩২৮নং)*

বলা বাহুল্য, রোযাদারের জন্য মাজন ব্যবহার না করাই উত্তম। আর এ ব্যাপারে সংকীর্ণতা নেই। কারণ, সে ইফতার করে নেওয়া পর্যন্ত সময় অপেক্ষা করে যদি তা ব্যবহার করে, তাহলে সে এমন এক জিনিস থেকে দূরে থাকতে পারবে, যার দ্বারা তার রোযা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। *(মুমঃ ৬/৪০৭, ৪৩২, ৪৮ঃ ৬৩পৃঃ)*

পক্ষান্তরে নেশাদার ও দেহে অবসন্ন আনয়নকারী মাজন; যেমন, গুল-গুরাকু প্রভৃতি; যা ব্যবহারের ফলে মাথা ঘোরে অথবা ব্যবহারকারী জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, তা ব্যবহার করা বৈধ নয়; না রোযা অবস্থায় এবং না অন্য সময়। কারণ, তা মহানবী ﷺ-এর এই বাণীর আওতাভুক্ত হতে পারে, যাতে তিনি বলেন, "প্রত্যেক মাদকতা আনয়নকারী দ্রব্য হারাম।" *(বুঃ, মুঃ, সুআঃ, সজাঃ ৪৫৫০নং)*

জ্ঞাতব্য যে, দাঁতের মাড়িতে ক্ষত থাকার ফলে অথবা দাঁতন করতে গিয়ে রক্ত বের হলে তা গিলে ফেলা বৈধ নয়; বরং তা বের করে ফেলা জরুরী। অবশ্য যদি তা নিজের ইচ্ছা ও এখতিয়ার ছাড়াই গলায় নেমে যায়, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি হবে না। *(ইবনে উষাইমীন, ফাসিঃ ৩৯পৃঃ, ৭০ঃ ৫৩নং)*

3। সুরমা লাগানো এবং চোখে ও কানে ওষুধ ব্যবহার ঃ

রোযা অবস্থায় সুরমা লাগানো এবং চোখে ও কানে ওষুধ ব্যবহার বৈধ। কিন্তু ব্যবহার করার পর যদি গলায় সুরমা বা ওষুধের স্বাদ অনুভূত হয়, তাহলে (কিছু উলামার নিকট রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং সে রোযা) কাযা রেখে নেওয়াই হল পূর্বসতর্কতামূলক কর্ম। *(ইবনে বায, ফামুতাসিঃ ২৮পৃঃ)* কারণ, চোখ ও কান খাদ্য ও পানীয় পেটে যাওয়ার পথ নয় এবং সুরমা বা ওষুধ লাগানোকে খাওয়া বা পান করাও বলা যায় না; না সাধারণ প্রচলিত কথায় এবং না-ই শরয়ী পরিভাষায়। অবশ্য রোযাদার যদি চোখে বা কানে ওষুধ দিনে ব্যবহার না করে রাতে করে, তাহলে সেটাই হবে পূর্বসাবধানতামূলক কর্ম। *(মুমঃ ৬/৩৮২, সঊদী স্থায়ী উলামা কমিটি, ফাসিঃ মুসনিদ ৪৪পৃঃ, ফইঃ ২/১২৯)*

হযরত আনাস ﷺ রোযা থাকা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন। *(সআদাঃ ২০৮২নং)*

পক্ষান্তরে রোযা থাকা অবস্থায় নাকে ওষুধ ব্যবহার বৈধ নয়। কারণ, নাকের মাধ্যমে পানাহার পেটে পৌঁছে থাকে। আর এ জন্যই মহানবী ﷺ বলেছেন, "(ওযূ করার সময়) তুমি নাকে খুব অতিরঞ্জিতভাবে পানি টেনে নিও। কিন্তু তোমার রোযা থাকলে নয়।" *(আঃ ৪/৩৩, আদাঃ ১৪২, তিঃ, নাঃ, সইমাঃ ৩২৮নং)*

বলা বাহুল্য উক্ত হাদীস এবং অনুরূপ অর্থের অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতেই নাকে ওষুধ ব্যবহার করার পর যদি গলাতে তার স্বাদ অনুভূত হয়, তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে রোযা কাযা করতে হবে। *(ইবনে বায, ফামুতাসিঃ ২৮পৃঃ)*

4। পায়খানা-দ্বারে ওষুধ ব্যবহারঃ

রোযাদারের জ্বর হলে তার জন্য পায়খানা-দ্বারে ওষুধ (সাপোজিটরি) রাখা যায়। তদনুরূপ জ্বর মাপা বা অন্য কোন পরীক্ষার জন্য মল-দ্বারে কোন যন্ত্র ব্যবহার করা দোষাবহ বা রোযার পক্ষে ক্ষতিকর নয়। কারণ, এ কাজকে খাওয়া বা পান করা কিছুই বলা হয় না। (এবং পায়খানা-দ্বার পানাহারের পথও নয়।) *(মুমঃ ৬/৩৮১)*

5। পেটে (এন্ডোসকপি মেশিন) নল সঞ্চালনঃ

পেটের ভিতর কোন পরীক্ষার জন্য (এন্ডোসকপি মেশিন) নল বা স্টমাক টিউব সঞ্চালন করার ফলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। তবে হ্যাঁ, যদি পাইপের সাথে কোন (তৈলাক্ত) পদার্থ থাকে এবং তা তার সাথে পেটে গিয়ে পৌঁছে, তাহলে তাতে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এ কাজ ফরয বা ওয়াজেব রোযায় করা বৈধ নয়। *(মুমঃ ৬/৩৮৩-৩৮৪)*

6। বাহ্যিক শরীরে তেল, মলম, পাওডার বা ক্রিম ব্যবহারঃ

বাহ্যিক শরীরের চামড়ায় পাওডার বা মলম ব্যবহার করা রোযাদারের জন্য বৈধ। কারণ, তা পেটে পৌঁছে না।

তদনুরূপ প্রয়োজনে ত্বককে নরম রাখার জন্য কোন তেল, ভ্যাসলিন বা ক্রিম ব্যবহার করাও রোযা অবস্থায় অবৈধ নয়। কারণ, এ সব কিছু কেবল চামড়ার বাহিরের অংশ নরম করে থাকে এবং শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে না। পরন্তু যদিও লোমকূপে তা প্রবেশ হওয়ার কথা ধরেই নেওয়া যায়, তবুও তাতে রোযা নষ্ট হবে না। *(ইবনে জিবরীন, ফইঃ ২/১২৭, ফাসিঃ মুসনিদ ৪১পৃঃ)*

তদনুরূপ রোযা অবস্থায় মহিলাদের জন্য হাতে মেহেন্দী, পায়ে আলতা অথবা চুলে (কালো ছাড়া অন্য রঙের) কলফ ব্যবহার বৈধ। এ সবে রোযা বা রোযাদারের উপর কোন (মন্দ) প্রভাব ফেলে না। *(ফাসিঃ মুসনিদ ৪৫পৃঃ, ফইঃ ২/১২৭)*

7। স্বামী-স্ত্রীর আপোষের চুম্বন ও প্রেমকেলিঃ

যে রোযাদার স্বামী-স্ত্রী মিলনে ধৈর্য রাখতে পারে; অর্থাৎ সঙ্গম বা বীর্যপাত ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা না করে, তাদের জন্য আপোসে চুম্বন ও প্রেমকেলি বা কোলাকুলি করা বৈধ এবং তা তাদের জন্য মকরূহ নয়। কারণ, মহানবী ﷺ রোযা রাখা অবস্থায় স্ত্রী-চুম্বন করতেন এবং রোযা অবস্থায় প্রেমকেলিও করতেন। আর তিনি ছিলেন যৌন ব্যাপারে বড় সংযমী। *(বুঃ*

১৯২৭, মুঃ ১১০৬, আদাঃ ২৩৮২, তিঃ ৭২৯, ইআশাঃ ৯৩৯২নং) অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ স্ত্রী-চুম্বন করতেন রমযানে রোযা রাখা অবস্থায়; *(মুঃ ১১০৬নং)* রোযার মাসে। *(আদাঃ ২৩৮৩, ইআশাঃ ৯৩৯০নং)*

আর এক বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে চুম্বন দিতেন। আর সে সময় আমরা উভয়ে রোযা অবস্থায় থাকতাম।' *(আদাঃ ২৩৮৪, ইআশাঃ ৯৩৯৭নং)*

হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, তিনি তাঁর সাথেও অনুরূপ করতেন। *(মুঃ ১১০৮নং)* আর তদ্রূপ বলেন হযরত হাফসা (রাঃ)ও। *(মুঃ ১১০৭নং)*

হযরত উমার ﷺ বলেন, একদা স্ত্রীকে খুশী করতে গিয়ে রোযা অবস্থায় আমি তাকে চুম্বন দিয়ে ফেললাম। অতঃপর নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, 'আজ আমি একটি বিরাট ভুল করে ফেলেছি; রোযা অবস্থায় স্ত্রী-চুম্বন করে ফেলেছি।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যদি রোযা রেখে পানি দ্বারা কুল্লি করতে, তাহলে তাতে তোমার অভিমত কি?" আমি বললাম, 'তাতে কোন ক্ষতি নেই।' মহানবী ﷺ বললেন, "তাহলে ভুল কিসের?" *(আঃ ১/২১, ৫২, সআদাঃ ২০৮৯, দাঃ ১৬৭৫, ইআশাঃ ৯৪০৬নং)*

পক্ষান্তরে রোযাদার যদি আশঙ্কা করে যে, প্রেমকেলি বা চুম্বনের ফলে তার বীর্যপাত ঘটে যেতে পারে অথবা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের উত্তেজনার ফলে সহসায় মিলন ঘটে যেতে পারে, কারণ সে সময় সে হয়তো তাদের উদগ্র কাম-লালসাকে সংযত করতে পারবে না, তাহলে সে কাজ তাদের জন্য হারাম। আর তা হারাম এই জন্য যে, যাতে পাপের ছিদ্রপথ বন্ধ থাকে এবং তাদের রোযা নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধ ও যুবকের মাঝে কোন পার্থক্য নেই; যদি উভয়ের কামশক্তি এক পর্যায়ের হয়। সুতরাং দেখার বিষয় হল, কাম উত্তেজনা সৃষ্টি এবং বীর্যস্খলনের আশঙ্কা। অতএব সে কাজ যদি যুবক বা কামশক্তিসম্পন্ন বৃদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তাহলে তা উভয়ের জন্য মকরূহ। আর যদি তা না করে তাহলে তা বৃদ্ধ, যৌন-দুর্বল এবং সংযমী যুবকের জন্য মকরূহ নয়। পক্ষান্তরে উভয়ের মাঝে পার্থক্য করার ব্যাপারে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে *(সআদাঃ ২০৯০নং)* তা আসলে কামশক্তি বেশী থাকা ও না থাকার কারণে। যেহেতু সাধারণতঃ বৃদ্ধ যৌন ব্যাপারে শান্ত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যুবক তার বিপরীত।

ফলকথা, সকল শ্রেণীর দম্পতির জন্য উত্তম হল রোযা রেখে প্রেমকেলি, কোলাকুলি ও চুম্বন বিনিময় প্রভৃতি যৌনাচারের ভূমিকা পরিহার করা। কারণ, যে গরু সবুজ ফসল-জমির আশেপাশে চরে, আশঙ্কা থাকে যে, সে কিছু পরে ফসল খেতে শুরু করে দেবে। সুতরাং স্বামী যদি ইফতার করা অবধি ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে সেটাই হল সর্বোত্তম। আর রাত্রি তো অতি নিকটে এবং তাতো যথেষ্ট লম্বা। অল্-হামদু লিল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন, "রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ হালাল করা হয়েছে।" *(কুঃ ২/১৮৭)*

চুম্বনের ক্ষেত্রে চুম্বন গালে হোক অথবা ঠোঁটে উভয় অবস্থাই সমান। তদনুরূপ সঙ্গমের সকল প্রকার ভূমিকা ও শৃঙ্গারাচার; সকাম স্পর্শ, ঘর্ষণ, দংশন, মর্দন, প্রচাপন, আলিঙ্গন প্রভৃতির মানও চুম্বনের মতই। এ সবের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আর এ সব করতে গিয়ে যদি কারো মযী (বা উত্তেজনার সময় আঠালো তরল পানি) নিঃসৃত হয়, তাহলে তাতে

রোযার কোন ক্ষতি হয় না। *(মুমঃ ৬/৩৯০, ৪৩২-৪৩৩, ফাসিঃ ৪৮পৃঃ, তাসিঃ ৪৩-৪৪পৃঃ)*

জ্ঞাতব্য যে, জিভ চোষার ফলে একে অন্যের জিহ্বারস গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে। যেমন স্তনবৃন্ত চোষণের ফলে মুখে দুগ্ধ এসে গলায় নেমে গেলেও রোযা ভেঙ্গে যাবে।

স্ত্রীর দেহাঙ্গের যে কোন অংশ দেখা রোযাদার স্বামীর জন্যও বৈধ। অবশ্য একবার দেখার ফলেই চরম উত্তেজিত হয়ে কারো মযী বা বীর্যপাত ঘটলে কোন ক্ষতি হবে না। *(বুঃ ১৯২৭নং দ্রঃ)* কারণ, অবৈধ নজরবাজীর ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন, "প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি বৈধ নয়।" *(আদাঃ ২১৪৯, তিঃ ২৭৭৮, সআদাঃ ১৮৮১নং)* তাছাড়া দ্রুতপতনগ্রস্ত এমন দুর্বল স্বামীর এমন ওযর গ্রহণযোগ্য।

পক্ষান্তরে কেউ বারবার দেখার ফলে মযী নির্গত করলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু বারবার দেখার ফলে বীর্যপাত করে ফেললে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

অবশ্য স্ত্রী-দেহ নিয়ে কল্পনা করার ফলে কারো মযী বা বীর্যপাত হলে রোযা নষ্ট হয় না। যেহেতু মহানবী ﷺ-এর ব্যাপক নির্দেশ এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে। তিনি বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের মনের কল্পনা উপেক্ষা করেন, যতক্ষণ কেউ তা কাজে পরিণত অথবা কথায় প্রকাশ না করে।" *(বুঃ ২৫২৮, মুঃ ১২৭, দ্রঃ মুমঃ ৬/৩৯০-৩৯১)*

৪। দেহের দূষিত রক্ত বহিষ্করণঃ

রোযা অবস্থায় কোন যন্ত্র দ্বারা অথবা যন্ত্র ছাড়াই, পা থেকে অথবা মাথার কোন শিরা থেকে, মুখে করে চুষে অথবা যে কোন প্রকারে দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করলে রোযা নষ্ট হবে কি না, সে নিয়ে উলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেহেতু মহানবী ﷺ কর্তৃক উভয় শ্রেণীর বর্ণনা মজুদ রয়েছে। তিনি বলেন, "দেহ থেকে দূষিত রক্ত যে বের করে তার এবং যার বের করা হয় তারও রোযা নষ্ট হয়ে যায়।" *(আঃ, আদাঃ ২৩৬৭, ইমাঃ ১৬৮০, দাঃ ১৬৮১-১৬৮২, ইখুঃ ১৯৬২-১৯৬৩নং, ইহিঃ, হাঃ ১/৪২৭, বাঃ ৪/২৬৫, প্রমুখ)* এ কথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি রোযা অবস্থায় নিজ দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করেছেন। *(বুঃ ১৯৩৮-১৯৩৯, আদাঃ ২৩৭২, তিঃ, ইআশাঃ, বাঃ ৪/২৬৩)* আর তিনি বলেছেন, "যে (অনিচ্ছাকৃত) বমি করে, যার স্বপ্নদোষ হয় এবং যে দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করে, তার রোযা নষ্ট হয় না।" *(আদাঃ, সজাঃ ৭৭৪২নং)*

পরস্পর বিরোধী উক্ত সকল বর্ণনা দেখে কিছু উলামা মনে করেন যে, দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাওয়ার হাদীস আজও নাসেখ (কার্যকর) এবং এর বিরোধী সকল হাদীস মনসূখ (রহিত)। পক্ষান্তরে অন্যান্য কিছু সত্য-সন্ধানী গবেষক উলামা মনে করেন যে, বরং প্রথম হাদীসটাই মনসূখ।

দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাওয়ার হাদীস যে মনসূখ (রহিত) সে ব্যাপারে সাক্ষ্য বহন করে হযরত আনাস ﵁-এর হাদীস। তিনি বলেন, 'শুরু শুরু রোযাদারের জন্য দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করা মকরূহ ছিল। একদা জা'ফর বিন আবী তালেব রোযা অবস্থায় দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করলেন। তা দেখে তিনি বললেন, "এদের উভয়ের রোযা নষ্ট।" অতঃপর পরবর্তীকালে তিনি রোযাদারের জন্য দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করার অনুমতি দিলেন।' আর স্বয়ং হযরত আনাস রোযা অবস্থায় দেহ

থেকে দূষিত রক্ত বের করতেন। *(দারাঃ ২৩৯নং, বাঃ ৪/২৬৮)*

একদা তাঁকে প্রশ্ন করা হল, 'আপনারা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে কি রোযা অবস্থায় দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করাকে মকরূহ মনে করতেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'না। অবশ্য দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা করলে মকরূহ মনে করা হত।' *(বুঃ ১৯৪০নং)*

তদনুরূপ আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ রোযাদারকে স্ত্রী-চুম্বন ও দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।' *(ত্বাবঃ, দারাঃ, ইগঃ ৪/৭৪)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, '(পেটের ভিতরে) কিছু প্রবেশ করলে রোযা ভাঙ্গে, কিছু বাহির হলে নয়।' *(ইআশাঃ ৯৩১৯নং, ইগঃ ৪/৭৫)*

উপরোক্ত কিছু বর্ণনায় 'অনুমতি' দেওয়ার অর্থই হল যে, প্রথমে সে কাজ অবৈধ ছিল এবং পরে তা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব সঠিক মত এই যে, দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করলে কারো রোযা নষ্ট হবে না; যে বের করাবে তার এবং যে বের করে দেবে তারও নয়। *(দ্রঃ মুহাল্লা ৬/২০৪-২০৫, ইগঃ ৪/৭৪)*

বলা বাহুল্য, যদিও সঠিক মত এই যে, রোযা অবস্থায় দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করলে রোযা নষ্ট হবে না, তবুও উত্তম ও পূর্বসতর্কতামূলক আমল এই যে, রোযাদার তা বর্জন করবে। এর ফলে সে মতভেদের বেড়াজাল থেকে নিষ্কৃতি পাবে, খুন বের করার পর সে দৈহিক দুর্বলতার শিকার হবে না এবং যে ব্যক্তি মুখে টেনে খুন বের করে সে ব্যক্তির গলায় কিছু রক্ত চলে গিয়ে তারও রোযা নষ্ট না হয়ে যায়। অবশ্য একান্ত তা করার দরকার হলে দিনে না করে রাত্রে করবে। আর সেটাই হবে উভয়ের জন্য উত্তম। *(দ্রঃ আসাইঃ ১৩৬পৃঃ, ৭০ঃ ৫৬নং)*

9। নাক অথবা কোন কাটা-ফাটা থেকে রক্ত বের হওয়াঃ

দেহের কোন কাটা-ফাটা অঙ্গ থেকে রক্ত পড়লে রোযা নষ্ট হয় না। বরং তা দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করার মতই। অনুরূপ নাক থেকে রক্ত পড়লেও রোযা নষ্ট নয়। কারণ, তাতে মানুষের কোন এখতিয়ার থাকে না। আর ইচ্ছা করে বের করলে তাও দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করার মত। *(দ্রঃ আসাঃ ১৩৬-১৩৮পৃঃ)* তদনুরূপ মাথায় বা দেহের অন্য কোন জায়গায় পাথর বা অন্য কিছুর আঘাত লেগে রক্ত ঝরলে রোযা নষ্ট হয় না। *(মবঃ ৩০/১২৬)*

10। রক্তদান করাঃ

পরীক্ষার জন্য কিছু রক্ত দেওয়া রোযাদারের জন্য বৈধ। এতে তার রোযার কোন ক্ষতি হয় না। *(রিমুযাসিঃ ২৪পৃঃ, ফাসিঃ মুসনিদ ৫৩পৃঃ, ফামুতাসিঃ ৩৪পৃঃ)*

তদনুরূপ কোন রোগীর প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে রক্তদান করাও বৈধ এবং তা দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করার মতই। এতেও রোযার কোন ক্ষতি হয় না। *(দ্রঃ আসাইঃ ১৩৮পৃঃ)*

11। দাঁত তোলাঃ

রোযাদারের জন্য দাঁত (স্টোন ইত্যাদি থেকে) পরিষ্কার করা, ডাক্তারী ভরণ (ইনলেই) ব্যবহার করা এবং যন্ত্রণায় দাঁত তুলে ফেলা বৈধ। তবে এ সব ক্ষেত্রে তাকে একান্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, যাতে কোন প্রকার ওষুধ বা রক্ত গিলা না যায়। *(ইবনে বায,*

ফামুতাসিঃ ২৯পৃঃ)

12। কিড্‌নী (বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি) অচল অবস্থায় দেহের রক্ত শোধন ঃ

রোযাদারের কিড্‌নী অচল হলে রোযা অবস্থায় প্রয়োজনে দেহের রক্ত পরিষ্কার ও শোধন (Dialysis) করা বৈধ। পরিশুদ্ধ করার পর পুনরায় দেহে ফিরিয়ে দিতে যদিও রক্ত দেহ থেকে বের হয়, তবুও তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। *(ইবনে উষাইমীন, ৭০ঃ ৪২নং)*

13। আহারের কাজ দেয় না এমন (ওষুধ) ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা ঃ

রোযাদারের জন্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেই ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা বৈধ, যা পানাহারের কাজ করে না। যেমন, পেনিসিলিন বা ইন্‌সুলিন ইঞ্জেকশন অথবা অ্যান্টিবায়োটিক বা টনিক কিংবা ভিটামিন ইঞ্জেকশন অথবা ভ্যাক্‌সিন ইঞ্জেকশন প্রভৃতি হাতে, কোমরে বা অন্য জায়গায়, দেহের পেশী অথবা শিরায় ব্যবহার করলে রোযার ক্ষতি হয় না। তবুও নিতান্ত জরুরী না হলে তা দিনে ব্যবহার না করে রাত্রে ব্যবহার করাই উত্তম ও পূর্বসাবধানতামূলক কর্ম। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "যে বিষয়ে সন্দেহ আছে সে বিষয় বর্জন করে তাই কর যাতে সন্দেহ নেই।" *(আঃ, তিঃ ২৫১৮, নাঃ, ইহিঃ, ত্বাবঃ প্রমুখ, ইগঃ ২০৭৪, সজাঃ ৩৩৭৭, ৩৩৭৮নং)* "সুতরাং যে সন্দিহান বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে নেবে।" *(আঃ ৪/২৬৯, ২৭০, বুঃ ৫২, মুঃ ১৫৯৯নং, আদাঃ, তিঃ, ইমাঃ, দাঃ) (দ্রঃ রিমুযাসিঃ ২৪পৃঃ, ৭০ঃ ৪২নং)*

14। ক্ষতস্থানে ওষুধ ব্যবহার ঃ

রোযাদারের জন্য নিজ দেহের ক্ষতস্থানে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ ইত্যাদি করা দূষণীয় নয়। তাতে সে ক্ষত গভীর হোক অথবা অগভীর। কারণ, এ কাজকে না কিছু খাওয়া বলা যাবে, আর না পান করা। তা ছাড়া ক্ষতস্থান স্বাভাবিক পানাহারের পথ নয়। (আসাইঃ ১৪০পৃঃ)

15। মাথা ইত্যাদি নেড়া করা ঃ

রোযাদারের জন্য নিজ মাথার চুল বা নাভির নিচের লোম ইত্যাদি চাঁছা বৈধ। তাতে যদি কোন স্থান কেটে রক্ত পড়লেও রোযার কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে দাড়ি চাঁছা সব সময়কার জন্য হারাম; রোযা অবস্থায় অথবা অন্য কোন অবস্থায়। *(মবঃ ১৯/১৬৫)*

16। কুল্লি করা ও নাকে পানি নেওয়া ঃ

রোযাদারের ঠোঁট শুকিয়ে গেলে পানি দ্বারা ভিজিয়ে নেওয়া এবং মুখ বা জিভ শুকিয়ে গেলে কুল্লি করা বৈধ। অবশ্য গড়গড়া করা বৈধ নয়। আর এ ক্ষেত্রে মুখ থেকে পানি বের করে দেওয়ার পর ভিতরে পানির যে আর্দ্রতা বা স্বাদ থেকে যাবে, তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, তা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। *(ইআইঃ ২৪পৃঃ, ৭০ঃ ৫৩নং)*

অতি প্রয়োজনে গড়গড়ার ওষুধ ব্যবহার করা বৈধ। তবে শর্ত হল, যেন কোন প্রকারে পানি বা ওষুধ গলার নিচে নেমে না যায়। (নচেৎ, তাতে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।) তাই পূর্বসতর্কতামূলক আমল হল, তা দিনে ব্যবহার না করে রাতে করা। *(ফাসিঃ জিরাইসী ২১পৃঃ)*

নাকে পানি টেনে নিয়ে নাক ঝাড়াও রোযাদারের জন্য বৈধ। অবশ্য তাতে অতিরঞ্জন করা

যাবে না। কারণ, তাতে গলার নিচে পানি নেমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। মহানবী ﷺ বলেন, "(ওযূ করার সময়) তুমি নাকে খুব অতিরঞ্জিতভাবে পানি টেনে নিও। কিন্তু তোমার রোযা থাকলে নয়।" *(আঃ ৪/৩৩, আদাঃ ১৪২, সতিঃ ৬৩১, সনাঃ ৮৫, ইমাঃ ৪০৭নং)*

অবশ্য ওযূ ইত্যাদি করার সময় কুল্লি করতে গিয়ে বা নাকি পানি নিতে গিয়ে সাবধানতা সত্ত্বেও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে গলার নিচে চলে যায়, তাহলে তাতে রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা, তা ইচ্ছা করে গিলা হয় না। আর মহান আল্লাহ বলেন, ([illegible])

অর্থাৎ, (কোন ব্যাপারে তোমরা ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই;) কিন্তু ইচ্ছাকৃত করলে অপরাধ আছে। *(কুঃ ৩৩/৫) (ইবনে উষাইমীন, ফাসিঃ মুসনিদ ৩৮পৃঃ)*

17। সুগন্ধির সুঘ্রাণ নেওয়াঃ

রোযা রাখা অবস্থায় আতর বা অন্য প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং সর্বপ্রকার সুঘ্রাণ নাকে নেওয়া রোযাদারের জন্য বৈধ। তবে ধুঁয়া জাতীয় সুগন্ধি (যেমন আগরবাতি, চন্দন-ধুঁয়া প্রভৃতি) ইচ্ছাকৃত নাকে নেওয়া বৈধ নয়। কারণ, এই শ্রেণীর সুগন্ধির ঘনত্ব আছে; যা পাকস্থলিতে গিয়ে পৌঁছে। *(দ্রঃ ফইঃ ২/১২৮, ফাসিঃ মুসনিদ ৪৩পৃঃ, তাইরাঃ ৪৭পৃঃ)*

বলা বাহুল্য, রান্নাশালের যে ধুঁয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাকে এসে প্রবেশ করে, তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। কারণ, তা থেকে বাঁচার উপায় নেই। *(ইবনে উষাইমীন, মাফাঃ ১/৫০৮)*

প্রকাশ থাকে যে নস্যি ব্যবহার করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, তারও ঘনত্ব আছে এবং তার গুঁড়া পেটের ভিতরে পৌঁছে থাকে। তা ছাড়া তা মাদকদ্রব্যের শ্রেণীভুক্ত হলে ব্যবহার করা যে কোন সময়ে এমনিতেই হারাম।

18। নাকে বা মুখে স্প্রে ব্যবহারঃ

স্প্রে দুই প্রকার; প্রথম প্রকার হল ক্যাপসুল স্প্রে পাওডার জাতীয়। যা পিস্তলের মত কোন পাত্রে রেখে পুশ করে স্প্রে করা হয় এবং ধূলোর মত উড়ে গিয়ে গলায় পৌঁছলে রোগী তা গিলতে থাকে। এই প্রকার স্প্রেতে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। রোযাদারকে যদি এমন স্প্রে বছরের সব মাসে এবং দিনেও ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে তাকে এমন রোগী গণ্য করা হবে, যার রোগ সারার কোন আশা নেই। সুতরাং সে রোযা না রেখে প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একটি করে মিসকীন খাইয়ে দেবে।

দ্বিতীয় প্রকার স্প্রে হল বাষ্প জাতীয়। এই প্রকার স্প্রেতে রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা, তা পাকস্থলীতে পৌঁছে না। *(ইবনে উষাইমীন, ক্যাসেটঃ আহকামুন মিনাস সিয়াম)* কারণ, তা হল এক প্রকার কমপ্রেস্ড্ গ্যাস; যার ডিব্বায় প্রেসার পড়লে উড়ে গিয়ে (নিঃশ্বাসের বাতাসের সাথে) ফুসফুসে পৌঁছে এবং শ্বাসকষ্ট দূর করে। এমন গ্যাস কোন প্রকার খাদ্য নয়। আর রমযান অরমযান এবং দিনে রাতে সব সময়ে (বিশেষ করে শ্বাসরোধ বা শ্বাসকষ্ট জাতীয় যেমন হাঁফানির রোগী) এর মুখাপেক্ষী থাকে। *(ইবনে বায, ফামুতাসিঃ ৩৬পৃঃ, ৪৮ঃ ৬২পৃঃ, ৭০ঃ ৪২নং)*

অনুরূপভাবে মুখের দুর্গন্ধ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য স্প্রে রোযাদারের জন্য ব্যবহার করা দোষাবহ নয়। তবে শর্ত হল, সে স্প্রে পবিত্র ও হালাল হতে হবে। *(মবঃ ৩০/১১২)*

যা থেকে বাঁচা দুঃসাধ্য তাতে রোযা নষ্ট নয়

1। থুথু ও গয়ের ঃ

থুথু ও গয়ের থেকে বাঁচা দুঃসাধ্য। কারণ, তা মুখে বা গলার গোড়ায় জমা হয়ে নিচে এমনিতেই চলে যায়। অতএব এতে রোযা নষ্ট হবে না এবং বারবার থুথু ফেলারও দরকার হবে না।

অবশ্য যে কফ, গয়ের, খাঁকার বা শ্লেষ্মা বেশী মোটা এবং যা কখনো মানুষের বুক (শ্বাসযন্ত্র) থেকে, আবার কখনো মাথা (Sinuses) থেকে বের হয়ে আসে, তা গলা ঝেড়ে বের করে বাইরে ফেলা ওয়াজেব এবং তা গিলে ফেলা বৈধ নয়। যেহেতু তা ঘৃণিত; সম্ভবতঃ তাতে শরীর থেকে বেরিয়ে আসা কোন রোগজীবাণুও থাকতে পারে। সুতরাং তা গিলে ফেলাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতিও হতে পারে। তবে যদি কেউ ফেলতে না পেরে গিলেই ফেলে, তাহলে তাতে রোযা নষ্ট হবে না।

পক্ষান্তরে মুখের ভিতরকার স্বাভাবিক লালা গিলাতে কোন ক্ষতি নেই। রোযাতেও কোন প্রভাব পড়ে না। *(মুমঃ ৬/৪২৮-৪২৯, ফইঃ ২/১২৫, ফাসিঃ ৩৮পৃঃ)* এই লালা বের করে ফেলা জরুরী নয়; এমনকি ফজরের আযানের সামান্য পূর্বে পানি পান করার পরেও নয়। কারণ, আমাদের জানা মতে সাহাবাবর্গ কর্তৃক এমন কোন নির্দেশ বর্ণিত হয় নি, যাতে বুঝা যায় যে, রোযাদার ফজর উদয় (সেহরীর সময় শেষ) হওয়ার একটু পূর্বে পানি পান করলে ততক্ষণ পর্যন্ত থুথু ফেলতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত জিব থেকে পানির স্বাদ দূরীভূত না হয়েছে। বরং এতটুকু অবশ্যই ক্ষমার্হ। তবে হ্যাঁ, যদি কোন খাবারের স্বাদ; যেমন খেজুর, চা বা অনুরূপ কোন মিষ্টি জাতীয় খাবারের মিষ্টতা জিবে অবশিষ্ট থেকে যায়, তাহলে তা অবশ্যই থুথু ফেলার সাথে (বা পানি দ্বারা কুল্লি করে) দূর করা জরুরী এবং সেহরীর সময় শেষ হয়ে গেছে জানার পর তা গিলা বৈধ নয়।

দাঁতে লেগে থাকা গোশু বা অন্য কোন খাবার ফজর উদয় হওয়ার পরে অনিচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেললে, অথবা তা অতি সামান্য হওয়ার ফলে মুখে বুঝতে পারা এবং বের করে ফেলা সম্ভব না হলে তা মুখের স্বাভাবিক লালার মতই। তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু বেশী হলে এবং তা বের করে ফেলা সম্ভব হলে, বের করে দিলে আর কোন ক্ষতি হবে না। পরন্তু তা ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেললে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। *(৭০ঃ ৫৩নং)*

2। রাস্তার ধূলা ঃ

রাস্তার ধূলা রোযাদারের নিঃশ্বাসের সাথে পেটে গেলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। তদনুরূপ যে ব্যক্তি আটাচাকিতে কাজ করে অথবা তার কাছে যায় সে ব্যক্তির পেটে আটার গুঁড়ো গেলেও রোযার কোন ক্ষতি হবে না। *(আসাইঃ ১৪৫-১৪৬পৃঃ)* কারণ, এ সব থেকে বাঁচার উপায় নেই। অবশ্য মুখে মুখোশ ব্যবহার করে বা কাপড় বেঁধে কাজ করাই উত্তম।

রোযা অবস্থায় যা করা চলে

এমন কিছু কাজ আছে যা আপাতদৃষ্টিতে রোযাদারের জন্য করা অবৈধ মনে হলেও আসলে তা বৈধ। সেরূপ কিছু কাজ নিম্নরূপ ঃ-

1। লবণ বা মিষ্টি চাখা ঃ

রান্না করতে করতে প্রয়োজনে খাবারের লবণ বা মিষ্টি সঠিক হয়েছে কি না তা চেখে দেখা রোযাদারের জন্য বৈধ। তদনুরূপ কোন কিছু কেনার সময় চেখে পরীক্ষা করার দরকার হলে তা করতে পারে। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'কোন খাদ্য, সির্কা এবং কোন কিছু কিনতে হলে তা চেখে দেখাতে কোন দোষ নেই।' *(দ্রঃ বুঃ ৩৮০পৃঃ, ইআশাঃ ২/৩০৫, বাঃ ৪/২৬১, ইগঃ ৯৩৭নং)*

অনুরূপভাবে অতি প্রয়োজনে মা তার শিশুর জন্য কোন শক্ত খাবার চিবিয়ে নরম করে দিতে পারে, ধান শুকিয়েছে কি না এবং মুড়ির চাল হয়েছে কি না তা চিবিয়ে দেখতে পারে। অবশ্য এ সকল ক্ষেত্রে শর্ত হল, যেন চর্বিত কোন অংশ রোযাদারের পেটে না চলে যায়। বরং অতি সাবধানতার সাথে কেবল দাঁতে চিবিয়ে এবং জিভে তার স্বাদ চেখে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ফেলা জরুরী। *(ফইঃ ২/১২৮, ৭০ঃ ৫৩নং, সারাঃ ২৬পৃঃ, ফিসুঃ ১/৪০৯)*

2। সেহরীর শেষ সময় পর্যন্ত পানাহার করা ঃ

সেহরীর শেষ সময় পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস করা রোযাদারের জন্য বৈধ। কিন্তু ফজর উদয় (সময় বা আযান) হওয়ার সাথে সাথে মুখের খাবার উগলে ফেলা ওয়াজেব। (এ ব্যাপারে মতভেদ পূর্বে আলোচিত হয়েছে।) অনুরূপ সহবাস করতে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী পৃথক হয়ে যাওয়া জরুরী। এরূপ করলে রোযা শুদ্ধ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সেহরীর সময় শেষ হয়ে গেছে বা ফজরের আযান শুরু হয়ে গেছে জেনে বা শুনেও যদি কেউ পানাহার বা স্ত্রী-সঙ্গমে মত্ত থাকে, তাহলে তার রোযা হবে না। মহানবী ﷺ বলেন, "বিলাল রাতে আযান দেয়। সুতরাং তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেয়।" *(বুঃ ৬১৭নং, মুঃ)*

3। ফজর উদয় হওয়ার পরেও নাপাক থাকা ঃ

স্ত্রী-সঙ্গম অথবা স্বপ্নদোষ হওয়ার পরেও সময় অভাবে গোসল না করে নাপাক অবস্থাতেই রোযাদার রোযার নিয়ত করতে এবং সেহরী খেতে পারে। এমন কি সেহরীর সময় শেষ হয়ে গেলেও আযানের পর গোসল করতে পারে। এ ক্ষেত্রে রোযার শুরুর কিছু অংশ নাপাকে অতিবাহিত হলেও রোযার কোন ক্ষতি হবে না। অবশ্য নামাযের জন্য গোসল জরুরী।

মা আয়েশা ও উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর (কখনো কখনো) স্ত্রী-মিলন করে অপবিত্র অবস্থায় ফজর হয়ে যেত। তারপর তিনি গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন।' *(বুঃ ১৯২৫, মুঃ ১১০৯, সুআঃ)*

তাছাড়া মহান আল্লাহ ফজর উদয় হওয়ার সময় পর্যন্ত স্ত্রী-মিলনের অনুমতি দিয়েছেন এবং তার পর থেকে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন। আর তার মানেই হল যে, রোযাদারের জন্য (ফজর উদয়ের পূর্বে) মিলনের পর (ফজর উদয়ের পরে) নাপাকীর গোসল করা বৈধ।

(দ্রঃ মুহাল্লা ৬/২২০, ফারারাঃ ৬১পৃঃ)

তদনুরূপ নিফাস ও ঋতুমতী মহিলার রাত্রে খুন বন্ধ হলে (রোযার নিয়ত করে এবং সেহরী খেয়ে) ফজরের পর রোযায় থেকে পরে গোসল করে নামায পড়তে পারে। উপর্যুক্ত নাপাক পুরুষ ও মহিলার জন্য নাপাকীর গোসলকে সকাল বা দুপুরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা বৈধ নয়। বরং সূর্য উদয়ের পূর্বেই গোসল করে যথাসময়ে নামায আদায় করা তাদের জন্য ওয়াজেব। যেমন পুরুষের জন্য ওয়াজেব এমন সময়ের ভিতরে সত্বর গোসল করা, যাতে ফজরের নামায জামাআত সহকারে মসজিদে আদায় করতে সক্ষম হয়। *(ফিসুঃ ১/৪১১, ইবনে বায, ফাসিঃ মুসনিদ ৫১পৃঃ, রিমুযাসিঃ ২৩পৃঃ)*

জ্ঞাতব্য যে, রমযানের দিনের বেলায় রোযাদারের স্বপ্নদোষ হয়ে গেলে তার রোযা বাতিল নয়। কেননা, তা তার এখতিয়ারকৃত নয়। অতএব তার জন্য জরুরী হল, নাপাকীর গোসল করা। অবশ্য ফজরের নামায পড়ার পর ঘুমাতে গিয়ে স্বপ্নদোষ হলে, সঙ্গে সঙ্গে গোসল না করে যদি যোহরের আগে পর্যন্ত বিলম্ব করে গোসল করে, তাহলে তাতে দোষ হবে না। *(ইবনে বায, ফাসিঃ মুসনিদ ৫১ পৃঃ)* অবশ্য উত্তম হল, নাপাকে না থেকে সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে গোসল করে বিভিন্নভাবে আল্লাহর যিক্‌র করা।

4। দিনে ঘুমানোঃ

রোযাদারের জন্য দিনে ঘুমানো বৈধ। কিন্তু সকল নামায তার যথাসময়ে জামাআত সহকারে আদায় করতে অবহেলা প্রদর্শন করা বৈধ নয়। যেমন, বিভিন্ন ইবাদতের কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। বরং উচিত হল, ঘুমিয়ে সময় নষ্ট না করে রমযানের সেই মাহাত্ম্যপূর্ণ সময়কে নফল নামায, যিক্‌র-আযকার ও কুরআন কারীম তেলাঅত দ্বারা আবাদ করা। যাতে তার রোযার ভিতরে নানা প্রকার ইবাদতের সমাবেশ ঘটে। *(ইবনে উষাইমীন, ফাসিঃ মুসনিদ ৩১-৩২পৃঃ)*

5। সফর করাঃ

রোযাদারের জন্য এমন দেশে সফর করে রোযা রাখা বৈধ, যেখানের দিন ঠান্ডা ও ছোট। *(ইবনে উষাইমীন, মাফাঃ ১/৫০৬)*

অষ্টম অধ্যায়

রোযাদারের জন্য যা করা অপছন্দনীয়

উলামাগণ কিছু এমন বৈধ কর্ম করাকে রোযাদারের জন্য অপছন্দনীয় মনে করেন, যা করার ফলে তার রোযা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর তা নিম্নরূপ ঃ-

১। মুখে থুথু জমা করে গিলে নেওয়া।
২। গয়ের বা শ্লেষ্মা গিলা।
৩। চুইংগাম জাতীয় কিছু চিবানো।
৪। দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাবার পরিষ্কার না করা।
৫। অপ্রয়োজনে খাবার চেখে দেখা। কারণ, তা গলার নিচে নেমে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।
৬। এমন জিনিস নাকে নিয়ে ঘ্রাণ নেওয়া (শোঁকা); যা রোযাদারের নিঃশ্বাসের সাথে গলার ভিতরে যেতে পারে।
৭। স্ত্রীর সাথে এমন আচরণ করা, যা রোযাদারের যৌনক্ষুধা জাগ্রত করে। যেমন চুম্বন, কোলাকুলি, গলাগলি প্রভৃতি।
৮। এমন কিছু করা, যাতে তার শরীর দুর্বল হয়ে যাবে এবং রোযা চালিয়ে যেতে কষ্ট হবে। যেমন দূষিত রক্ত বহিষ্করণ ও অধিক রক্তদান।
৯। কুল্লি করা ও নাকে পানি নেওয়াতে অতিরঞ্জন করা। *(দ্রঃ আসাইঃ ১৬২- ১৬৩পৃঃ, তাইরাঃ ১৬- ১৭পৃঃ)*
১০। মাজন বা টুথ্ পেষ্ট্ দিয়ে দাঁত মাজা।

এ ছাড়া এমন কিছু কর্ম রয়েছে, যা করলে রোযাদারের রোযা অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং তার সওয়াবও কম হয়ে যায়। যেমন মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, গীবত করা, চুগলী করা, অনুরূপ প্রত্যেক সেই কথা বলা, যা শরীয়তঃ বলা নিষিদ্ধ। কারণ, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা ও তার উপর আমল ত্যাগ করতে পারল না, সে ব্যক্তির পানাহার ত্যাগ করার মাঝে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" *(বুঃ ৬০৫৭, ইমাঃ ১৬৮-৯, আঃ ২/৪৫২, ৫০৫)*

নবম অধ্যায়

যাতে রোযা নষ্ট ও বাতিল হয়

যে সব কারণে রোযা নষ্ট হয় তা দুই শ্রেণীর; প্রথম শ্রেণীর কারণ রোযা নষ্ট করে এবং তাতে কাযা ওয়াজেব হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণ রোযা নষ্ট করে এবং কাযার সাথে কাফ্ফারাও ওয়াজেব করে।

যে কারণে রোযা নষ্ট হয় এবং কাযার সাথে কাফ্ফারাও ওয়াজেব হয়; তা হল ঃ-

1। স্ত্রী-সঙ্গম ঃ

সঙ্গম বলতে স্ত্রী-যোনীতে স্বামীর (সুপারির মত) লিঙ্গাগ্র প্রবেশ হলেই রোযা নষ্ট হয়ে যায়;

Contents

তাতে বীর্যপাত হোক, আর নাই হোক। তদনুরূপ অবৈধভাবে পায়খানা-দ্বারে লিঙ্গাগ্র প্রবেশ করালেও রোযা বাতিল গণ্য হয়।

জ্ঞাতব্য যে, স্ত্রীর পায়খানাদ্বারে সঙ্গম করা মহাপাপ এবং এক প্রকার কুফ্রী।

বলা বাহুল্য রোযা অবস্থায় যখনই রোযাদার স্ত্রী-মিলন করবে, তখনই তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং এ মিলন যদি রমযানের দিনে সংঘটিত হয় এবং রোযা রোযাদারের জন্য ফরয হয়, (অর্থাৎ রোযা কাযা করা তার জন্য বৈধ না হয়) তাহলে ঐ মিলনের ফলে যথাক্রমে ৫টি জিনিস সংঘটিত হবে ঃ-

(ক) কাবীরা গোনাহ; আর তার ফলে তাকে তওবা করতে হবে।

(খ) তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে।

(গ) তাকে ঐ দিনের অবশিষ্ট অংশ পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে।

(ঘ) ঐ দিনের রোযা (রমযান পর) কাযা করতে হবে।

(ঙ) বৃহৎ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। আর তা হল, একটি ক্রীতদাসকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে হবে। তাতে সক্ষম না হলে, লাগাতার (একটানা) দুই মাস রোযা রাখতে হবে। আর তাতে সক্ষম না হলে, ৬০ জন মিসকীনকে খাদ্যদান করতে হবে।

এ ব্যাপারে মূল ভিত্তি হল, মহান আল্লাহর এই বাণী,

[illegible]

অর্থাৎ, রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ হালাল করা হয়েছে। *(কুঃ ২/১৮৭)*

আর আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংসগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।' তিনি বললেন, "কোন জিনিস তোমাকে ধ্বংসগ্রস্ত করে ফেলল?" লোকটি বলল, 'আমি রোযা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে ফেলেছি।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে বললেন, "তুমি কি একটি ক্রীতদাস মুক্ত করতে পারবে?" লোকটি বলল, 'জী না।' তিনি বললেন, "তাহলে কি তুমি একটানা দুই মাস রোযা রাখতে পারবে?" সে বলল, 'জী না।' তিনি বললেন, "তাহলে কি তুমি ৬০ জন মিসকীনকে খাদ্যদান করতে পারবে?" লোকটি বলল, 'জী না।' --- *(বুঃ ১৯৩৭, মুঃ ১১১১নং)*

যে মহিলার উপর রোযা ফরয, সেই মহিলা সম্মত হয়ে রমযানের দিনে স্বামী-সঙ্গম করলে তারও উপর কাফ্ফারা ওয়াজেব। অবশ্য তার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও স্বামী যদি তার সাথে জোরপূর্বক সহবাস করতে চায়, তাহলে তার জন্য যথাসাধ্য তা প্রতিহত করা জরুরী। রুখতে না পারলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজেব নয়।

এই জন্যই যে মহিলা জানে যে, তার স্বামীর কামশক্তি বেশী; সে তার কাছে প্রেম-হৃদয়ে কাছাকাছি হলে নিজের যৌন-পিপাসা দমন রাখতে পারে না, সেই মহিলার জন্য উচিত, রমযানের দিনে তার কাছ থেকে দূরে থাকা এবং প্রসাধন ও সাজ-সজ্জা না করা। তদনুরূপ স্বামীর জন্যও উচিত, পদস্খলনের জায়গা থেকে দূরে থাকা এবং রোযা থাকা অবস্থায় স্ত্রীর কাছ না ঘেঁষা; যদি আশঙ্কা হয় যে, উগ্র যৌন-কামনায় সে তার মনকে কাবু রাখতে পারবে না। কারণ, এ কথা বিদিত যে, প্রত্যেক নিষিদ্ধ জিনিসই ঈপ্সিত। *(দ্রঃ মুমঃ ৬/৪১৫, ৭০ঃ ৭০নং, ফাবারাঃ ৬১পৃঃ)*

পক্ষান্তরে যদি রমযানের রোযা কাযা রাখতে গিয়ে স্ত্রী-সঙ্গম করে ফেলে, তাহলে তার ফলে কাফ্ফারা নেই। আর তার জন্য ঐ দিনের বাকী অংশ পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও জরুরী নয়। অবশ্য তার গোনাহ হবে। কারণ, সে ইচ্ছাকৃত একটি ওয়াজেব রোযা নষ্ট করে তাই। *(মুমঃ ৬/৪১৩, আহকামুন মিনাস সিয়াম, ক্যাসেট, ইবনে উষাইমীন)*

মুসাফির যদি সফরে থাকা অবস্থায় রোযা রেখে স্ত্রী-সহবাস করে ফেলে, তাহলে তার জন্য কেবল কাযা ওয়াজেব, কাফ্ফারা ওয়াজেব নয়। যেমন, ঐ দিনের বাকী অংশ পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও তার জন্য জরুরী নয়। কেননা, সে মুসাফির। আর মুসাফিরের জন্য সফরে রোযা ভাঙ্গা (এবং পরে কাযা করা) বৈধ।

অনুরূপভাবে এমন রোগী, যার রোগের জন্য রোযা ভাঙ্গা বৈধ ছিল; কিন্তু কষ্ট করে সে রোযা রেখেছিল। সে যদি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে, যে সেই দিনেই মাসিক থেকে পবিত্রা হয়েছে, তাহলে তারও গোনাহ হবে না; অবশ্য কাযা ওয়াজেব। *(মুমঃ ৬/৪১৩)*

যে ব্যক্তি যে বৈধ ওযরের ফলে রোযা বন্ধ রেখেছিল, দিনের মধ্যে তার সেই ওযর দূর হয়ে যাওয়ার পর যদি স্ত্রী-সহবাস করে, তাহলে তার জন্য কাফ্ফারা ওয়াজেব নয়। যেমন, কোন মুসাফির যদি দিন থাকতে রোযা না রেখে ঘরে ফিরে দেখে যে, তার স্ত্রী সেই দিনেই (ফজরের পর) মাসিক থেকে পবিত্রা হয়েছে, তাহলে সঠিক মতে তাদের জন্য সঙ্গম বৈধ। এতে স্বামী-স্ত্রীর কোন প্রকার পাপ হবে না। যেহেতু ঐ দিন শরীয়তের অনুমতিক্রমে তাদের জন্য মান্য নয় এবং ঐ দিনে রোযা না রাখাও তাদের পক্ষে অনুমোদিত। *(ঐ ৬/৪২১)*

যদি কোন ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় রোযা রেখে স্ত্রী-সহবাস করার পর দিন থাকতেই এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে, যাতে তার জন্য রোযা ভাঙ্গা বৈধ, তাহলেও তার জন্য কাফ্ফারা ওয়াজেব; যদিও তার জন্য দিনের শেষভাগে (অসুস্থ হওয়ার পর) রোযা ভাঙ্গা বৈধ। কারণ, সহবাসের সময় সে তাতে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিল না।

তদনুরূপ যে ব্যক্তি দিনের প্রথমাংশে সহবাস করার পর সফর করে তাহলে তার জন্যও কাফ্ফারা ওয়াজেব; যদিও সফর করার পরে ঐ দিনেই তার জন্য রোযা ভাঙ্গা বৈধ। কেননা, রোযা ভাঙ্গা বৈধ হওয়ার পূর্বেই সে (রমযান) মাসের মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছে। *(ঐ ৬/৪২২)*

যদি কোন ব্যক্তি (কাফ্ফারা থেকে রেহাই পাওয়ার বাহানায়) প্রথমে কিছু খেয়ে অথবা পান করে তারপর স্ত্রী-সঙ্গম করে, তাহলে তার পাপ অধিক। যেহেতু সে রমযানের মর্যাদাকে পানাহার ও সঙ্গমের মাধ্যমে ডবল করে নষ্ট করেছে। বৃহৎ কাফ্ফারা তার হক্কে অধিক কার্যকর। আর তার ঐ বাহানা ও ছলনা নিজের ঘাড়ে বোঝা স্বরূপ। তার জন্য খাঁটি তওবা ওয়াজেব। *(৭০ঃ ৪৭নং)*

জ্ঞাতব্য যে, রমযান মাসে দিনে রোযা অবস্থায় সঙ্গম ছাড়া অন্য কোন কারণে সেই ব্যক্তির জন্য কাফ্ফারা ওয়াজেব হয় না, যার জন্য রোযা রাখা ফরয। বলা বাহুল্য, নফল রোযা রেখে, কসমের কাফ্ফারার রোযা রেখে, কোন অসুবিধার ফলে ইহরাম অবস্থায় কোন নিষিদ্ধ কাজ করে ফেললে তার জরিমানার রোযা রেখে, তামাত্তু হজ্জ করতে গিয়ে কুরবানী দিতে না পেরে তার বিনিময়ে রোযা রেখে অথবা নযরের রোযা রেখে স্ত্রী-সহবাস করে ফেললে কাফ্ফারা ওয়াজেব নয়। যেমন সঙ্গম না করে (স্ত্রী-যোনীর বাইরে) বীর্যপাত করে ফেললেও কাফ্ফারা

ওয়াজেব নয়। *(মুমঃ ৬/৪২২-৪২৩)* অবশ্য কাযা তো ওয়াজেবই।

জ্ঞাতব্য যে, ব্যভিচার করে ফেললেও সহবাসের মতই কাফ্ফারা ওয়াজেব। তাছাড়া ব্যভিচারের সাজা ও তওবা তো আছেই।

2। বীর্যপাত ঃ

রোযা নষ্টকারী কর্মাবলীর মধ্যে জাগ্রত অবস্থায় সকাম যৌন-স্বাদ অনুভূতির সাথে বীর্যপাত অন্যতম; চাহে সে বীর্যপাত (নিজ অথবা স্ত্রীর) হস্তমৈথুন দ্বারা হোক অথবা কোলাকুলি দ্বারা, নচেৎ চুম্বন অথবা প্রচাপন দ্বারা। কারণ, উক্ত প্রকার সকল কর্মই হল এক এক শ্রেণীর যৌনাচার। অথচ মহান আল্লাহ (হাদীসে কুদসীতে) বলেন, “সে আমার (সন্তুষ্টি লাভের) আশায় নিজের প্রয়োজনীয় পানাহার ও যৌনাচার পরিহার করে।” *(বুঃ ১৮৯৪, মুঃ ১১৫১নং)* আর যে ব্যক্তি যে কোন প্রকারে নিজ যৌন অনুভূতিকে উত্তেজিত করে তৃপ্তির সাথে বীর্যপাত করে, সে আসলেই নিজের যৌন-কামনা চরিতার্থ করে থাকে এবং তার রোযাতে সেই কর্ম বর্জন করে না, যা আল্লাহর উক্ত বাণীতে পানাহারের অনুরূপ। *(মুমঃ ৬/৩৮৭)*

পরন্তু রোযাদারের জেনে রাখা উচিত যে, হস্ত অথবা অন্য কিছু দ্বারা বীর্যপাত ঘটানো যেমন রোযার মাসে হারাম, তেমনি অন্য মাসেও। কিন্তু রমযানে তা অধিকরূপে হারাম। যেহেতু এ মাসের রয়েছে পৃথক মর্যাদা এবং তাতে হয়েছে রোযা ফরয। *(ফাতাওয়াঃ ৬১পৃঃ)*

3। পানাহার ঃ

পানাহার বলতে পেটের মধ্যে যে কোন প্রকারে কোন খাদ্য অথবা পানীয় পৌঁছানোকে বুঝানো হয়েছে; চাহে তা মুখ দিয়ে হোক অথবা নাক দিয়ে, পানাহারের বস্তু যেমনই হোক; উপকারী বা উপাদেয় হোক অথবা অপকারী বা অনুপাদেয়, হালাল হোক অথবা হারাম, অল্প হোক অথবা বেশী।

বলা বাহুল্য, (বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা প্রভৃতির) ধূমপান রোযা নষ্ট করে দেয়; যদিও তা অপকারী, অনুপাদেয় ও হারাম পানীয়।

প্লাস্টিক বা কোন ধাতুর মালা গিলে ফেললে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে; যদিও তা পেটে গেলে দেহের কোন উপকার সাধন হবে না। তদনরূপ যদি কেউ কোন অপবিত্র বা হারাম বস্তু ভক্ষণ করে, তাহলে তারও রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। *(দ্রঃ মুমঃ ৬/৩৭৯, ৪৮ঃ ১৪পৃঃ)*

পানাহারে রোযা নষ্ট হওয়ার মূল ভিত্তি হল মহান আল্লাহর এই বাণী,

([illegible])

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। *(কুঃ ২/১৮৭)*

সুতরাং ফজর উদয় হওয়ার আগে পর্যন্ত মহান আল্লাহ রোযাদারের জন্য পানাহার বৈধ করেছেন। অতঃপর তিনি রাত পর্যন্ত রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন। আর তা হল রোযা নষ্টকারী জিনিস থেকে বিরত থাকার নাম। তিনি বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। *(কুঃ ২/১৮৭)* অর্থাৎ, মাগরেব পর্যন্ত।

আর মহান আল্লাহ (হাদীসে কুদসীতে) বলেন, "সে আমার (সন্তুষ্টি লাভের) আশায় নিজের প্রয়োজনীয় পানাহার ও যৌনাচার পরিহার করে।" *(বুঃ ১৮৯৪, মুঃ ১১৫১নং)*

সুতরাং যে স্বেচ্ছায় পানাহার করবে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। সে গোনাহগার হবে, বিধায় তার জন্য তওবা ওয়াজেব এবং কাযাও। অবশ্য এর জন্য কোন কাফ্ফারা নেই। তবে ইচ্ছা করে কেউ রোযা নষ্ট করার পর তা কাযা করলেও তা কবুল হবে কি না -তা নিয়ে মতভেদ আছে।

4। যা এক অর্থে পানাহার ঃ

স্বাভাবিক পানাহারের পথ ছাড়া অন্য ভাবে পানাহারের কাজ নিলে তাতেও রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন খাবারের কাজ দেয় এমন (স্যালাইন ইঞ্জেকশন) নিলে রোযা হবে না। কেননা, তাতে পানাহারের অর্থ বিদ্যমান। আর শরীয়তের নির্দেশ-বাণীতে যে ব্যাপক অর্থ পাওয়া যায়, যে কোন অবস্থায় সেই অর্থ পাওয়া গেলে সেই নির্দেশ ঐ অবস্থার উপর আরোপ করা হবে। *(তাইরাঃ ৪৪পৃঃ)*

তদনুরূপ রোযা অবস্থায় দেহের রক্ত পরিবর্তন করলেও রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, তাতে দেহের মধ্যে নতুন ও নির্মল রক্ত প্রদান করা হয়। আর রক্তের সাথে অন্য কোন বস্তু বা ঔষধ থাকলে তো তা রোযা নষ্ট হওয়ার অন্য একটি কারণ। *(ইবনে বায, ফামুতাসিঃ ৩৮পৃঃ)*

5। ইচ্ছাকৃত বমি করা ঃ

ইচ্ছাকৃত বমি করলে, অর্থাৎ পেটে থেকে খাওয়া খাদ্য (বমন ও উদ্‌গিরণ করে) বের করে দিলে, মুখে আঙ্গুল ভরে, পেট নিঙরে, কোন বিকট দুর্গন্ধ জাতীয় কিছুর ঘ্রাণ নাকে নিয়ে, অথবা অরুচিকর ঘৃণ্য কিছু দেখে উল্‌টি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ঐ রোযার কাযা জরুরী। *(দ্রঃ মুমঃ ৬/৩৮৫, ৭০ঃ ৫৩নং)* পক্ষান্তরে সামলাতে না পেরে অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হয়ে গেলে রোযা নষ্ট হয় না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "রোযা অবস্থায় যে ব্যক্তি বমনকে দমন করতে সক্ষম হয় না, তার জন্য কাযা নেই। পক্ষান্তরে যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে, সে যেন ঐ রোযা কাযা করে।" *(আঃ ২/৪৯৮, আদাঃ ২৩৮০, তিঃ ৭১৬, ইমাঃ ১৬৭৬, দাঃ ১৬৮০, ইখুঃ ১৯৬০, ইহিঃ মাওয়ারিদ ৯০৭নং, হাঃ ১/৪২৭, দারাঃ, বাঃ ৪/২১৯ প্রমুখ, ইগঃ ৯৩০, সজাঃ ৬২৪৩নং)*

ঢেকুর তুলতে গিয়ে যদি রোযাদারের গলাতে কিছু খাবার উঠে আসে অথবা খাবারের স্বাদ গলাতে অনুভব করে এবং তারপরেই ঢোক গিলে নেয়, তাহলে তাতে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, তা আসলে মুখ পর্যন্ত বের হয়ে আসে না। বরং গলা পর্যন্ত এসেই পুনরায় তা পেটে নেমে যায় এবং রোযাদার কেবল নিজ গলাতে তার স্বাদ অনুভব করে থাকে। *(মুমঃ ৬/৪৩১)*

6। মহিলার মাসিক অথবা নিফাস শুরু হওয়া ঃ

মহিলার মাসিক অথবা নিফাসের খুন বের হতে শুরু হলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যায়। যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার সামান্য ক্ষণ পূর্বে খুন দেখা দেয়, তাহলে তার ঐ দিনের রোযা বাতিল এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সামান্য ক্ষণ পরে দেখা দিলে তার ঐ দিনের রোযা শুদ্ধ। *(৪৮ঃ ১৫পৃঃ)*

Contents

7। দূষিত রক্ত বের করাঃ

দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করলে রোযা নষ্ট হবে কি না - সে নিয়ে মতভেদের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে এবং সঠিক মত এই যে, তাতে রোযা নষ্ট হবে না। অবশ্য পূর্বসতর্কতামূলক আমল এই যে, রোযাদার রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় ঐ কাজ করবে না। *(৭০ঃ ৫৬নং)*

8। নিয়ত বাতিল করাঃ

নিয়ত প্রত্যেক ইবাদত তথা রোযার অন্যতম রুক্ন। আর সারা দিন সে নিয়ত নিরবচ্ছিন্নভাবে মনে জাগ্রত রাখতে হবে; যাতে রোযাদার রোযা না রাখার বা রোযা বাতিল করার কোন প্রকার দৃঢ় সংকল্প না করে বসে। বলা বাহুল্য, রোযা না রাখার নিয়ত করলে এবং তার নিয়ত বাতিল করে দিলে সারাদিন পানাহার আদি না করে উপবাস করলেও রোযা বাতিল গণ্য হবে। *(দ্রঃ ফিসুঃ ১/৪১২, মুমঃ ৬/৩৭৬, সারাঃ ২৪পৃঃ, ফাসিঃ জিরাইসী ৮পৃঃ)*

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কিছু খাওয়া অথবা পান করার প্রাথমিক ইচ্ছা পোষণ করার পর ধৈর্য ধরে পানাহার করার ঐ ইচ্ছা বাতিল করে পানাহার করে না, সে ব্যক্তির কেবল রোযা ভাঙ্গার ইচ্ছা পোষণ করার ফলে রোযা নষ্ট হবে না; যতক্ষণ না সে সত্যসত্যই পানাহার করে নেবে। আর এর উদাহরণ সেই ব্যক্তির মত, যে নামাযে কথা বলার ইচ্ছা পোষণ করার পর কথা না বলে অথবা নামায পড়তে পড়তে হাওয়া ছাড়ার ইচ্ছা করার পর তা সামলে নিতে পারে। এমন ব্যক্তির যেমন নামায ও ওযূ বাতিল নয়, ঠিক তেমনি ঐ রোযাদারের রোযা। *(ইবনে উষাইমীন, ক্যাসেট, আহকামুন মিনাস সিয়াম)*

9। মুরতাদ্দ্ হওয়াঃ

কোন সন্দেহ, কথা বা কাজের ফলে যদি কোন রোযাদার মুরতাদ্দ্ (কাফের) হয়ে যায় (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক), তাহলে সকলের মতে তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে। অতঃপর সে যদি তওবা করে পুনরায় মুসলিম হয়, তাহলে ঐ রোযা তাকে কাযা করতে হবে; যদিও সে ঐ দিনে রোযা নষ্টকারী কোন জিনিস ব্যবহার না করে। যেহেতু খোদ মুরতাদ্দ্ হওয়াটাই একটি রোযা নষ্টকারী কর্ম। তাতে সে কুফরী কোন বিশ্বাসের ফলে মুরতাদ্দ্ হোক অথবা কুফরী কোন সন্দেহ করার ফলে, আল্লাহ ও তদীয় রসূল কিংবা দ্বীনের কোন অংশ নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে কুফরী কথা বলে মুরতাদ্দ্ হোক অথবা তা না করে যে কোন প্রকার কুফরী মন্তব্য করে। আর যদিও তার ও তার বাপের নামখানি মুসলিমের তবুও তার সকল ইবাদত প্রত্যাখ্যাত। *(দ্রঃ আসাইঃ ৮৩পৃঃ)*

10। বেহুশ হওয়াঃ

রোযাদার যদি ফজর থেকে নিয়ে মাগরেব পর্যন্ত বেহুশ থাকে, তাহলে তার রোযা শুদ্ধ হবে না এবং তাকে ঐ দিনের রোযা কাযা রাখতে হবে। আর এ কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

রোযা নষ্ট হওয়ার শর্তাবলী

উপর্যুক্ত রোযা নষ্টকারী (মাসিক ও নিফাসের খুন ব্যতীত) সকল জিনিস কেবল তখনই রোযা নষ্ট করবে, যখন তার সাথে ৩টি শর্ত অবশ্যই পাওয়া যাবে। আর সে শর্ত ৩টি নিম্নরূপঃ-

১। রোযাদার জানবে যে, এই জিনিস এই সময়ে ব্যবহার করলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ, তা ব্যবহার করার সময় তার এ কথা অজানা থাকলে চলবে না যে, এই জিনিস রোযা নষ্ট করে অথবা এখন রোযার সময়।

২। তা যেন মনে স্মরণ রাখার সাথে ব্যবহার করে; ভুলে গিয়ে নয়।

৩। তা যেন নিজস্ব ইচ্ছা ও এখতিয়ারে ব্যবহার করে; অপরের তরফ থেকে বাধ্য হয়ে নয়।

কেননা, মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, কোন ব্যাপারে তোমরা ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; কিন্তু ইচ্ছাকৃত করলে অপরাধ আছে। *(কুঃ ৩৩/৫)*

তিনি আরো বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুল ও ত্রুটি করে ফেলি, তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না। *(কুঃ ২/২৮৬)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, (কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফ্রীর জন্য হৃদয় মুক্ত রাখলে তার উপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হবে। আর তার জন্য আছে মহাশাস্তি। তবে তার জন্য নয়, যাকে (কুফ্রী করতে) বাধ্য করা হয়; কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অটল থাকে। *(কুঃ ১৬/১০৬)*

মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ আমার জন্য আমার উম্মতের ভুল-ত্রুটি এবং বাধ্য হয়ে কৃত পাপকে মার্জনা করে দিয়েছেন।" *(আঃ, ইমাঃ, ত্বাবঃ, হাঃ, সজাঃ ১৭৩১নং)*

আর এই ভিত্তিতে একাধিক মাসায়েল প্রমাণিত হয়ঃ

❖ যদি কোন (নও-মুসলিম) স্বামী-স্ত্রী রোযা রেখে সঙ্গম করলে রোযা নষ্ট হয় - এ কথা না জেনে সঙ্গম করে ফেলে, অথবা ফজর উদয় হয়ে যাওয়ার সময় না জানতে পেরে (সময় বাকী আছে মনে করে) ভুল করে সঙ্গম করে ফেলে, তাহলে তাদের উপর কাযা-কাফ্ফারা কিছুই ওয়াজেব নয়।

❖ স্বামী যদি মিলনের জন্য স্ত্রীকে জোর করে এবং স্ত্রী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও বাধা দিতে পারঙ্গম না হয়ে সঙ্গম হয়েই যায়, তাহলে স্ত্রীর রোযা শুদ্ধ। কারণ, ঐ

মিলনে তার ইচ্ছা ছিল না।

❖ রোযা রেখে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় স্বপ্নে কেউ সঙ্গম করলে এবং তার ফলে সত্যসত্যই (স্বপ্নদোষ ও) বীর্যপাত হয়ে গেলে তার রোযা নষ্ট হবে না। কেননা, ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নে কোন ইচ্ছা থাকে না। বরং তার উপর থেকে ফিরিশ্তার নেকী-বদী লেখার কলমও তুলে নেওয়া হয়।

❖ রোযাদার ভুলে কিছু খেয়ে অথবা পান করে নিলে রোযা নষ্ট হবে না। কারণ, রোযার কথা সে ভুলে গিয়েছিল। আর মহানবী ﷺ বলেন, "যে রোযাদার ভুলে গিয়ে পানাহার করে ফেলে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে নেয়। এ পানাহার তাকে আল্লাহই করিয়েছেন।" *(বুঃ ১৯৩৩, মুঃ ১১৫৫, আদাঃ ২৩৯৮, তিঃ, দাঃ, ইমাঃ ১৬৭৩, দারাঃ, বাঃ ৪/২২৯, আঃ ২/৩৯৫, ৪২৫, ৪৯১, ৫১৩)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি রমযান মাসে ভুলবশতঃ রোযা নষ্টকারী কোন কাজ করে ফেলে, তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা কিছুই নেই।" *(ইহিঃ মাওয়ারিদ ৯০৬নং, হাঃ ১/৪৩০, ইরঃ ৪/৮৭)*

❖ যদি কেউ এই মনে করে খায় অথবা পান করে যে, সূর্য ডুবে গেছে অথবা এখনো ফজর উদয় হয় নি, তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে না। যেহেতু সে না জেনে খেয়েছে।

❖ যদি ওযূ বা গোসল করতে গিয়ে অথবা সাঁতার কাটতে গিয়ে পেটে পানি চলে যায়, কিংবা নলে পানি, পেট্রোল অথবা অন্য কোন তরল পদার্থ মুখে করে টানতে গিয়ে গলার নিচে নেমে যায়, তাহলে তাতেও রোযা নষ্ট হবে না। কারণ, এ সবে রোযাদারের ইচ্ছা থাকে না।

❖ ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় যদি কারো মুখে খাবার (যেমন পান ইত্যাদি) থেকে যায়, অতঃপর সেই অবস্থায় ফজর হয়ে যায়, তাহলে জাগার সাথে সাথে তা উগলে ফেলে দিয়ে কুল্লি করে নিলে তার রোযা হয়ে যাবে। কেননা, সে ঘুমিয়ে ছিল এবং ফজর হওয়ার পর সে ইচ্ছাকৃত সে খাবার গিলে খায়নি।

❖ কেউ জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলে তার মুখে পানি দিয়ে যদি তার জ্ঞান ফিরে যায়, তাহলে তার রোযা শুদ্ধ। কারণ, ঐ পানি সে নিজের ইচ্ছায় খায় নি। *(মুমঃ ৬/৪০১)*

এখানে একটি সতর্কতার বিষয় এই যে, যদি কেউ কোন রোযাদারকে না জেনে বা ভুলে খেতে অথবা পান করতে প্রত্যক্ষ করে, তাহলে তাকে রোযার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া জরুরী। যেহেতু মহান আল্লাহর ব্যাপক নির্দেশ হল,

(([illegible]))

অর্থাৎ, তোমরা সৎকার্য ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য কর। *(কুঃ ৫/২)*

আর মহানবী ﷺ-এর ব্যাপক নির্দেশ হল, "আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।" *(বুঃ ৪০১, মুঃ ৫৭২, আদাঃ, নাঃ, ইমাঃ)*

তাছাড়া আসলে এটি একটি আপত্তিকর কর্ম। অতএব তা প্রতিহত করা ওয়াজেব। *(ইবনে উষাইমীন ফাসিঃ মুসনিদ ৪৬পৃঃ, ৭০ঃ ৪৪নং)*

❖ বমি সামলাতে না পারলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, তা রোযাদারের

এখতিয়ারের বাইরে। আর তার দলীল হল উল্লেখিত স্পষ্ট হাদীস। এ ক্ষেত্রে মুখ ভর্তি হওয়া বা না হওয়ার কোন শর্ত কার্যকর নয়।

দশম অধ্যায়

রমযানে যে যে কাজ করা রোযাদারের কর্তব্য

মাহাত্ম্যপূর্ণ রমযান মাসে কি কি নেক কাজ করা কর্তব্য তা উল্লেখ করার পূর্বে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় ঃ-

১। এই মৌসমের মূল্য ও মাহাত্ম্য প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করা। আপনি এ কথা স্মরণে রাখবেন যে, যদি এই সওয়াবের মৌসম আপনার হাত ছাড়া হয়ে যায়, তাহলে তা পুনরায় ফিরে পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া এটি হল সংকীর্ণ সময়ের একটি সুবর্ণ সুযোগ। আল্লাহ সত্যই বলেছেন, "তা গোনা-গাঁথা কয়েকটি দিন।" *(কুঃ ২/১৮৪)* 'রমযান এসে গেল' এবং 'রমযান শেষ হয়ে গেল' লোকেদের এই উভয় উক্তির মাঝে ব্যবধান কত সংকীর্ণ! এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অস্পষ্ট উপলব্ধি থাকা যথেষ্ট নয় যে, রমযান মাস হল একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ মৌসম।

২। মর্যাদা ও সওয়াবের দিক থেকে আমলসমূহের মাঝে তারতম্য আছে। সুতরাং তাতে কোন আমল বড়। আবার কোন আমল ছোট। কোন আমল আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়; কিন্তু অন্য কোন আমল তাঁর নিকট অধিক পছন্দনীয়। অতএব মুসলিমের উচিত, সেই আমল করতে অধিক চেষ্টা ও যত্নবান হওয়া, যা সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ আমল, মহান আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় এবং সওয়াবের দিক থেকে অধিক মর্যাদাসমৃদ্ধ। *(কানামিরাঃ ৪৬পৃঃ)*

সলফে সালেহীন প্রত্যেক আমলকে পূর্ণাঙ্গ ও সুনিপুণ করার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস চালাতেন। তারপরেও তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে কি না তা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত থাকতেন। ভয় করতেন যে, তাঁর সে আমল হয়তো প্রত্যাখ্যাত হবে। আর তাঁরা তো তাঁরা, যাঁরা "সশঙ্ক ও ভীত-কম্পিত হৃদয়ে দান করে।" *(কুঃ ২৩/৬০)*

হযরত আলী ﷺ বলেন, 'আমল করার চাইতে তার কবুল হওয়ার ব্যাপারে অধিক যত্নবান হও। তোমরা কি শুননি, মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, আল্লাহ কেবল মুত্তাকী (পরহেযগার) লোকদের কাছ থেকেই (আমল) গ্রহণ করে থাকেন।' *(কুঃ ৫/২৭)*

হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, 'মহান আল্লাহ রমযান মাসকে তাঁর বান্দাদের জন্য প্রতিযোগিতার ময়দান স্বরূপ নির্ধারিত করেছেন; যার মধ্যে তারা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আপোসে প্রতিযোগিতা করতে পারে। বলা বাহুল্য, কিছু লোক অগ্রবর্তী হয়ে সফলকাম হয়েছে এবং অন্য কিছু লোক পশ্চাদ্‌বর্তী হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতএব অবাক লাগে সেই খেল-তামাশায় মত্ত ব্যক্তিকে দেখে; যে সেই দিনেও নিজ খেলায় মত্ত থাকে, যেদিনে

সৎকর্মশীলরা সাফল্য লাভ করেন এবং অকর্মণ্যরা হয় ক্ষতিগ্রস্ত।’ *(আল-আশরুল আওয়াখিরু মিন রামাযান থেকে উদ্ধৃত)*

রমযান মাসে যে যে আমল করা রোযাদারের জন্য কর্তব্য তা নিম্নরূপ ঃ-

1। তারাবীহর নামায বা কিয়ামে রামাযান

কিয়ামে রামাযান বা রমযানের কিয়ামকে স্বালাতুত তারাবীহ বা তারাবীহর নামায বলা হয়। ‘তারাবীহ’ মানে হল আরাম করা। যেহেতু সলফে সালেহীনগণ ৪ রাকআত নামায পড়ে বিরতির সাথে বসে একটু আরাম নিতেন, তাই তার নামও হয়েছে তারাবীহর নামায। আর ঐ আরাম নেওয়ার দলীল হল মা আয়েশার হাদীস; যাতে তিনি বলেন, ‘নবী ﷺ ৪ রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না। (অর্থাৎ অত্যন্ত সুন্দর ও দীর্ঘ হত।) অতঃপর তিনি ৪ রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না। অতঃপর তিনি ৩ রাকআত (বিত্‌র) নামায পড়তেন।’ *(বুঃ ১১৪৭, মুঃ ৭৩৮-নং)*

উক্ত হাদীসের মানে হল, তিনি প্রথম ৪ রাকআত নামাযকে এক সময়ে একটানা পড়েছেন। অর্থাৎ, তিনি ২ রাকআত নামায পড়ার পর সাথে সাথেই আবার ২ রাকআত নামায পড়তেন। অতঃপর বসে বিরতি নিতেন। অতঃপর তিনি উঠে পুনরায় ২ রাকআত নামায পড়ার পর সাথে সাথে আবার ২ রাকআত পড়তেন। অতঃপর আবার বসে একটু জিড়িয়ে নিতেন এবং সবশেষে ৩ রাকআত বিত্‌র পড়তেন। এখান থেকেই সলফগণ ১১ রাকআত নামাযের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং তাই তাঁরা প্রথমে ২ সালামে ৪ রাকআত নামায পড়ে একটু আরাম নেন। অতঃপর আবার ২ সালামে ৪ রাকআত নামায পড়ে পরিশেষে ৩ রাকআত বিত্‌র পড়েন। *(মুমঃ ৪/ ১৩, ৬৫, ৬৭)*

❖ তারাবীহর নামাযের মান ও তার মাহাত্ম্য ঃ

তারাবীহর নামায নারী-পুরুষ সকলের জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। বহু হাদীসগ্রন্থে হযরত আবূ হুরাইরা ؓ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ কিয়ামে রামাযানের ব্যাপারে (সকলকে) উৎসাহিত করতেন; কিন্তু তিনি বাধ্যতামূলকরূপে আদেশ দিতেন না। তিনি বলতেন, “যে ব্যক্তি ঈমান রেখে সওয়াবের আশায় রমযানের কিয়াম করবে, সে ব্যক্তির পূর্বকৃত পাপসমূহ মাফ হয়ে যাবে।” *(আঃ ২/২৮১, ৫২৯, বুঃ ১৯০১, মুঃ ৭৫৯, সআদাঃ ১২২২, সতিঃ ৬৪৮-নং)*

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘একদা নবী ﷺ মসজিদে নামায পড়লেন। তাঁর অনুসরণ (ইক্তিদা) করে অনেক লোক নামায পড়ল। অতঃপর পরের রাতে নামায পড়লে লোক আরো বেশী হল। তৃতীয় রাতে লোকেরা জমায়েত হলে তিনি বাসা থেকে বের হলেন না। ফজরের সময় তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, “আমি তোমাদের আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। তোমাদের নিকট (নামাযের জন্য) বের হতে আমার কোন বাধা ছিল না। কিন্তু আমি আশঙ্কা করলাম যে, ঐ নামায তোমাদের জন্য ফরয করে দেওয়া হবে।” আর এ ঘটনা হল

রমযানের।' *(বুঃ ২০১২, মুঃ ৭৬১নং)*

❖ তারাবীহর সময়ঃ

তারাবীহর নামায আদায় করার সময় হল, রমযানের (চাঁদ দেখার রাত সহ) প্রত্যেক রাত্রে এশার ফরয ও সুন্নত নামাযের পর বিত্র পড়ার আগে। অবশ্য শেষ রাত্রে ফজর উদয় হওয়ার আগে পর্যন্ত এর সময় বিস্তীর্ণ। যেহেতু মহানবী ﷺ প্রথম রাত্রে তার প্রথম ভাগে শুরু করে রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত নামায পড়েছিলেন। দ্বিতীয় রাত্রেও তার প্রথম ভাগে শুরু করে রাত্রের অর্ধেকাংশ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত নামায পড়েছিলেন এবং তৃতীয় রাত্রে তার প্রথম ভাগে শুরু করে শেষ রাত অবধি নামায পড়েছিলেন। *(সআদাঃ ১২২৭, সতিঃ ৬৪৬, সনাঃ ১৫১৪, সইমাঃ ১৩২৭নং)*

আর হযরত উমার ﷺ বলেন, 'রাতের প্রথম ভাগে নামায অপেক্ষা তার শেষ ভাগের নামাযই অধিক উত্তম।' অবশ্য লোকেরা তাঁর খেলাফতকালে রাত্রের প্রথম ভাগেই তারাবীহ পড়ত। *(বুঃ ২০১০নং)*

❖ তারাবীহর নিয়তঃ

নিয়ত মানে মনের সংকল্প। আর তার স্থান হল অন্তর; মুখ নয়। মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের কেউই কোন নির্দিষ্ট শব্দ মুখে উচ্চারণ করতেন না। তাই তা মুখে উচ্চারণ করা বিদআত। তাছাড়া নিয়তের জন্য কোন বাঁধা-ধরা শব্দাবলীও নেই।

জ্ঞাতব্য যে, তারাবীহর শুরুতেই কেউ যদি সমস্ত নামাযের একবার নিয়ত করে নেয়, তাহলে তাই যথেষ্ট। প্রত্যেক ২ রাকআতে নিয়ত করা জরুরী নয়। অবশ্য নামায পড়তে পড়তে কেউ কোন প্রয়োজনে তা ছেড়ে দিয়ে পুনরায় পড়তে লাগলে নতুন নিয়তের দরকার।

সতর্কতার বিষয় যে, নিয়ত করা জরুরী; কিন্তু পড়া বিদআত।

❖ তারাবীহর রাকআত-সংখ্যাঃ

সুন্নত ও আফযল হল এই নামায বিত্র সহ ১১ রাকআত পড়া। মহানবী ﷺ-এর রাতের নামায সম্বন্ধে সর্বাধিক বেশী খবর রাখতেন যিনি, সেই আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, রমযানে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নামায কত রাকআত ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি রমযানে এবং অন্যান্য মাসেও ১১ রাকআত অপেক্ষা বেশী নামায পড়তেন না।' *(বুঃ ১১৪৭, মুঃ ৭৩৮-নং)*

সায়েব বিন ইয়াযীদ বলেন, '(খলীফা) উমার উবাই বিন কা'ব ও তামীম আদ্-দারীকে আদেশ করেছিলেন, যেন তাঁরা রমযানে লোকদের নিয়ে ১১ রাকআত তারাবীহ পড়েন।' *(মাঃ ২৪৯নং, বাঃ ২/৪৯৬)*

কিছু উলামা বলেন, কিন্তু যদি কেউ তার চাইতে বেশী নামায পড়তে চায়, তাহলে তাতে কোন বাধা ও ক্ষতি নেই। কারণ, রাতের নামায প্রসঙ্গে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, "রাতের নামায ২ রাকআত ২ রাকআত করে। অতঃপর তোমাদের কেউ

যখন ফজর হয়ে যাওয়ার ভয় করে, তখন সে যেন ১ রাকআত বিত্র পড়ে নেয়। এতে তার পড়া নামাযগুলো বেজোড় হয়ে যাবে।” *(বুঃ ৯৯০, মুঃ ৭৪৯নং)* বলা বাহুল্য, উক্ত নির্দেশ দেওয়ার সময় তিনি রাতের নামাযের কোন নির্দিষ্ট রাকআত নির্ধারিত করেননি; না রমযানের এবং না অরমযানের।

তাছাড়া খোদ মহানবী ﷺ কখনো কখনো ১৩ রাকআত নামাযও পড়েছেন। আর তা এ কথারই দলীল যে, রাতের নামাযের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা নেই; অর্থাৎ তার এমন কোন নির্দিষ্ট রাকআত-সংখ্যা নেই যার অন্যথা করা যাবে না। তবে অবশ্য সেই সংখ্যার নামায পড়তে অভ্যাসী হওয়া অধিক উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ আমল, যে সংখ্যার কথা মহানবী ﷺ-এর সুন্নাহতে (খোদ আমলে) এসেছে। পরন্তু সেই সাথে নামায এমন ধীরে-সুস্থে ও লম্বা করে পড়া উচিত, যাতে নামাযীদের কষ্টবোধ না হয়। আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, উক্ত (১১ রাকআত) সংখ্যাই সাধারণ মানুষের জন্য অধিকতর সহজ এবং ইমামের জন্যও অধিক উপযোগী। এতে সকলের রুকূ, সিজদা ও কিরাআতে বিনয় রাখা, ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কুরআন পড়া ও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং প্রত্যেক বিষয়ে তাড়াহুড়া না করার ব্যাপারে বড় সহযোগিতা পাওয়া যাবে। *(দ্রঃ মুমঃ ৪/৭০, ৭৩, ইবনে বায সালাঃ ৫পৃঃ, রিমুযাসিঃ ২৬পৃঃ, ফুসিতাযাঃ ১৭পৃঃ)*

পক্ষান্তরে ২০ রাকআত তারাবীহ নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীস নেই। সাহাবাদের তরফ থেকে যে আসার বর্ণিত করা হয়, তার সবগুলিই যয়ীফ। *(মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানীর পুস্তিকা 'স্বালাতুত তারাবীহ' দ্রষ্টব্য)*

❖ তারাবীহর জামাআত ঃ

রমযানের কিয়াম জামাআতে পড়া বিধেয়; যেমন একাকী পড়াও বৈধ। তবে মসজিদে জামাআত সহকারে এই নামায আদায় করাই (অধিকাংশ উলামার মতে) উত্তম। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, রসূল ﷺ সাহাবাদেরকে নিয়ে উক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করেছেন। অবশ্য তা ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি জামাআত করে পড়া বর্জন করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ইন্তেকাল হল। তখনও ঐ নামাযের অবস্থা অনুরূপ জামাআতহীন ছিল। অনুরূপ ছিল আবূ বাকরের খিলাফতকালে এবং উমারের খিলাফতের প্রথম দিকেও একই অবস্থা ছিল। অতঃপর উমার ؓ সকলকে একটি ইমামের পশ্চাতে জামাআতবদ্ধ করলেন।

আব্দুর রহমান বিন আব্দ্ আলক্বারী বলেন, একদা রমযানের রাত্রে উমার বিন খাত্তাবের সাথে মসজিদে গেলাম; দেখলাম, লোকেরা ছিন্ন ছিন্ন বিভিন্ন জামাআতে বিভক্ত। কেউ তো একাকী নামায পড়ছে। কারো নামাযের ইক্তিদা করে কিছু লোক জামাআত করে নামায পড়ছে। তা দেখে উমার বললেন, 'আমি মনে করি, যদি ওদেরকে একটি ক্বারী (ইমামের) পশ্চাতে জামাআতবদ্ধ করে দিই, তাহলে তা উত্তম হবে।' অতঃপর তিনি তাতে সংকল্পবদ্ধ হয়ে উবাই বিন কা'বের ইমামতিতে সকলকে এক জামাআতবদ্ধ করলেন। তারপর আর এক রাত্রিতে আমি তাঁর সহিত বের হয়ে গেলাম। তখন লোকেরা তাদের ইমামের পশ্চাতে জামাআত সহকারে নামায পড়ছে। তা দেখে উমার বললেন, 'এটা একটি

উত্তম আবিষ্কার।' *(বুঃ ২০১০নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ে এবং তার নামায শেষ করা পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকে (ইক্তিদা করে), সেই ব্যক্তির জন্য সারা রাত্রি কিয়াম করার সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(আঃ, সআদাঃ ১২২৭, সতিঃ ৬৪৬, সনাঃ ১৫১৪, সইমাঃ ১৩২৭নং)* এই হাদীসও প্রমাণ করে যে, তারাবীহর নামাযের জামাআত ও ইমাম আছে।

❖ তারাবীহর জামাআতে মহিলাদের অংশগ্রহণ

যদি কোন ফিতনা সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে, তাহলে তারাবীহর জামাআতে মহিলাদের উপস্থিত হওয়া দোষাবহ নয়। অবশ্য শর্ত হল, তারা যেন সম্ভ্রমপূর্ণ লেবাস পরিধান করে, বেপর্দা হয়ে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং কোন প্রকারের সুবাস ও সুগন্ধি ব্যবহার না করে মসজিদে যায়। *(ফুসিতাযাঃ ১৯পৃঃ)* মহানবী ﷺ বলেন, "যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করেছে, সে যেন আমাদের সাথে এশার নামাযে উপস্থিত না হয়।" *(আঃ ২/৩০৪, মুঃ ৪৪৪, আদাঃ ৪১৭৫নং, নাঃ)*

এতদ্‌সত্ত্বেও স্বগৃহে নামায পড়াই তাদের জন্য উত্তম। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিও না। অবশ্য তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম।" *(আঃ ২/৭৬, ৭৭, সআদাঃ ৫৩০নং) (এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য 'স্বালাতি মুবাশ্‌শির' ২/১৯৪-১৯৬)*

মহানবী ﷺ শেষ রাত্রে নামায পড়তে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে তাঁর পরিবার ও স্ত্রীগণকে এবং সেই সাথে সাহাবাবর্গকে নিয়ে জামাআত করে নামায পড়েছিলেন। *(আঃ, সআদাঃ ১২২৭, সতিঃ ৬৪৬, সনাঃ ১৫১৪, সইমাঃ ১৩২৭নং)*

বলা বাহুল্য, জ্ঞানী মহিলার উচিত, মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামায পড়া তার জন্য উত্তম মনে করে, তাহলে সে যেন সেই আকার ও লেবাসে বের হয়, যে আকার ও লেবাস সলফদের মহিলারা মসজিদে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করতেন।

মহিলার জন্য জরুরী, মসজিদে যাওয়ার পথে সৎ-নিয়ত মনে উপস্থিত রাখা। তাকে মনে রাখতে হবে যে, সে মসজিদে নামায আদায় করতে এবং মহান আল্লাহর আয়াত শ্রবণ করতে যাচ্ছে। মনের মধ্যে এই খেয়াল থাকলে তার আকারে-চলনে শান্তভাব, শিষ্টতা ও গাম্ভীর্য প্রকাশ পাবে এবং তার প্রতি পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে না।

দুঃখের বিষয় যে, কতক মহিলা প্রাইভেট ড্রাইভারের সাথে একাকিনী মসজিদে যায়। আর এতে সে নফল আদায় করে সওয়াব কামাতে গিয়ে হারাম কাজ করে গোনাহ কামিয়ে আসে। অথচ তার এ কাজ যে বিরাট মুর্খামি এবং নিরেট বোকামি তা বলাই বাহুল্য।

মহিলাদের জন্য উচিত নয়, সে রকম কোন শিশু সঙ্গে নিয়ে মসজিদে আসা, যারা মায়ের নামায-ব্যস্ততায় ধৈর্য রাখতে পারবে না এবং কান্না, চিৎকার, চেঁচামেচি বা ছুটাছুটি করে, মসজিদের কুরআন, আসবাব-পত্র ইত্যাদি নিয়ে খেলা করে সকল নামাযীর ডিষ্টার্ব করবে। *(আশরু অক্বাফাতিন লিন্নিসা ফী রামাযান ৭-৮পৃঃ)*

❖ মহিলাদের আপোসে তারাবীহর জামাআতঃ

কোন কিশোর, পুরুষ বা মহিলার ইমামতিতে কোন বাড়িতে তারাবীহর নামাযের জন্য মহিলাদের পৃথক জামাআত করা দোষাবহ নয়।

হযরত আয়েশার ক্রীতদাস যাকওয়ান রমযানে কুরআন দেখে তাঁর ইমামতি করতেন। *(বুঃ তা'লীকান ১৩৯পৃঃ, ইআশাঃ ৭২ ১৬নং, আরাঃ)*

জাবের বিন আব্দুল্লাহ বলেন, একদা ক্বারী সাহাবী হযরত উবাই বিন কা'ব ﷺ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে এসে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! (রমযানের) গতরাত্রে আমি একটি (অস্বাভাবিক) কাজ করেছি।' তিনি বললেন, "সেটা কি?" উবাই বললেন, 'কিছু মহিলা আমার ঘরে জমা হয়ে বলল, আপনি (ভালো ও বেশী) কুরআন পড়তে পারেন, আমরা পারি না। অতএব আপনি আজ আমাদের ইমামতি করেন। তাদের এই অনুরোধে আমি তাদেরকে নিয়ে ৮ রাকআত এবং বিতর পড়েছি।' এ কথা শুনে মহানবী ﷺ চুপ থাকলেন। অর্থাৎ তাঁর এই নীরব থাকা এ ব্যাপারে তাঁর মৌনসম্মতির সুন্নত হয়ে গেল। *(ত্বাবঃ, আয়াঃ, মাযাঃ ২/৭৪, সাতাঃ আলবানী ৬৮-পৃঃ)*

অবশ্য এ ক্ষেত্রে শর্ত হল, মহিলা একাকিনী হলে সে ইমাম যেন তার কোন এগানা হয় এবং বেগানা না হয়। নতুবা মহিলা যেন একাধিক থাকে এবং তারা পর্দার সাথে থাকে। আর সর্বক্ষেত্রে যেন কোন প্রকার ফিতনার ভয় না থাকে। *(মুমঃ ৪/৩৫২)*

উম্মে অরাকাহ বিন নাওফাল (রাঃ)কে মহানবী ﷺ তাঁর পরিবারের মহিলাদের ইমামতি করতে আদেশ করেছিলেন। *(আদাঃ ৫৯১-৫৯২নং, দারাঃ ১০৭১, ১৪৯১নং)*

অবশ্য এ ক্ষেত্রে মহিলা ইমাম মহিলাদের কাতার ছেড়ে পুরুষের মত সামনে একাকিনী দাঁড়াবে না। বরং কাতারের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে ইমামতি করবে। হযরত উম্মে সালামাহ মহিলাদের ইমামতি করার সময় কাতারের মাঝখানেই দাঁড়াতেন। *(দারাঃ ১৪৯৩নং, বাঃ ৩/১৩১, ইআশাঃ, আরাঃ)* অনুরূপ বর্ণিত আছে হযরত আয়েশা থেকেও। *(দারাঃ ১৪৯২নং, আরাঃ, মুহাল্লা ৩/১৭১-১৭৩)*

❖ তারাবীহর জন্য ইমাম ভাড়া করাঃ

তারাবীহর নামাযের জন্য সুমধুর কণ্ঠবিশিষ্ট হাফেয-ক্বারী ইমাম ভাড়া করা দোষাবহ নয়। তবে (ক্বারী সাহেবের তরফ থেকে) ভাড়া বা পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করা উচিত নয়। যেহেতু এক জামাআত সলফ এ কাজকে অপছন্দ করেছেন। অবশ্য মসজিদের জামাআত যদি অনির্দিষ্ট-ভাবে তাঁকে অনেক কিছু দিয়ে পুরস্কৃত বা সাহায্য করেন, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

পক্ষান্তরে এমন ইমামের পিছনে নামায শুদ্ধ। বেতন নির্দিষ্ট করলেও নামাযের কোন ক্ষতি হবে না - ইন শাআল্লাহ। কারণ, এমন ইমামের প্রয়োজন পড়েই থাকে। তবে চুক্তিগতভাবে বেতন নির্ধারিত করার কাজ না করাই উচিত। জামাআতের সুস্থ বিবেক অনুযায়ী ইমাম বিনিময়-সাহায্য পাবেন; তবে তা শর্ত-সাপেক্ষ হওয়া উচিত নয়। এটাই হল উত্তম ও পূর্বসতর্কতামূলক কর্ম। এ রকমই বলেছেন সলফের একটি জামাআত। রাহিমাহুমুল্লাহ।

আর এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে হাদীসে। মহানবী ﷺ উসমান বিন আবুল আস ﷺ-কে বলেছিলেন, "এমন মুআয্যিন রাখ, যে আযান দেওয়ার বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না।" *(সআদাঃ ৪৯৭নং)* এ নির্দেশ স্পষ্টতঃ যদিও মুআয্যিনের জন্য, তবুও ইমামের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ অধিকতর প্রযোজ্য।

বলা বাহুল্য, হাফেয ও ক্বারী সাহেবদের উচিত, তাঁরাও যেন কুরআন-তেলাঅতকে অর্থোপার্জনের মাধ্যমরূপে ব্যবহার না করেন। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা কুরআন পাঠ কর, তার উপর আমল কর, (তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ কর,) তার প্রতি বৈমুখ হয়ে যেও না, তাতে অতিরঞ্জন করো না, তার মাধ্যমে উদরপূর্তি করো না এবং তার অসীলায় ধনবৃদ্ধিও করো না।" *(আঃ, ত্বাবঃ, আয়াঃ, প্রমুখ, সিসঃ ২৬০নং)*

❖ তারাবীহর নামাযের পদ্ধতি ঃ

মহানবী ﷺ-এর রাতের নামায সাধারণভাবে একই নিয়ম-পদ্ধতির অনুসারী ছিল না। বরং তাঁর এই নামায ছিল একাধিক ধরনের একাধিক নিয়মের। নিম্নে সংক্ষেপে সেই সব নিয়মাবলী মুসলিমের অবগতির জন্য উল্লেখ করা হল ঃ-

১। তিনি ১৩ রাকআত নামায পড়তেন। প্রথমে হাল্কা করে ২ রাকআত দিয়ে শুরু করতেন। প্রত্যেক ২ রাকআতে সালাম ফিরতেন। প্রত্যেক ২ রাকআতকে পূর্বের অপেক্ষা হাল্কা করতেন। এইভাবে ১০ রাকআত পড়ার পর পরিশেষে ৩ রাকআত বিত্র পড়তেন। *(মুঃ প্রমুখ সাতাঃ আলবানী ৮৬পৃঃ দ্রঃ)*

২। তিনি কোন রাতে ১৩ রাকআত নামায পড়তেন। তার মধ্যে প্রত্যেক ২ রাকআতে সালাম ফিরে ৮ রাকআত নামায পড়তেন এবং সবশেষে এক সালামে ৫ রাকআত বিত্র পড়তেন। আর এই ৫ রাকআত বিত্রের মাঝে কোথাও বসতেন না এবং সালামও ফিরতেন না। *(আঃ, মুঃ প্রমুখ ঐ ৮৯পৃঃ)*

৩। তিনি কোন রাতে ১১ রাকআত নামায পড়তেন। প্রত্যেক ২ রাকআতে সালাম ফিরে ১০ রাকআত পড়তেন এবং পরিশেষে ১ রাকআত বিত্র পড়তেন। *(আঃ, মুঃ, আদাঃ, প্রমুখ, ঐ ৯০পৃঃ)*

৪। কোন রাতে তিনি ১১ রাকআত নামায পড়তেন। এক সালামে ৪ রাকআত, অতঃপর আর এক সালামে ৪ রাকআত। তারপর ৩ রাকআত বিত্র পড়তেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'তিনি রমযানে এবং অন্যান্য মাসেও ১১ রাকআত অপেক্ষা বেশী নামায পড়তেন না। নবী ﷺ ৪ রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না। (অর্থাৎ অত্যন্ত সুন্দর ও দীর্ঘ হত।) অতঃপর তিনি ৪ রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না। অতঃপর তিনি ৩ রাকআত (বিত্র) নামায পড়তেন।' *(বুঃ ১১৪৭, মুঃ ৭৩৮নং)*

কিন্তু কোন কোন আহলে ইল্ম বলেন যে, 'নবী ﷺ ৪ রাকআত নামায পড়তেন।' হযরত আয়েশার এই কথার অর্থ এই নয় যে, তিনি ৪ রাকআত নামায একটানা একই সালামে পড়তেন। বরং তাঁর উদ্দেশ্য হল, তিনি ৪ রাকআত ২ সালামে পড়ে একটু আরাম করে নেওয়া তথা ক্লান্তি দূর করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে বসতেন। অতঃপর উঠে আবার ৪ রাকআত নামায পড়তেন। যেমন হযরত আয়েশার অন্য বর্ণনায় এ কথার বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে; তিনি বলেন, 'নবী ﷺ রাত্রে ১১ রাকআত নামায পড়তেন; এর প্রত্যেক ২ রাকআতে সালাম ফিরতেন।' *(মুঃ ৭৩৬নং)*

পক্ষান্তরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বিস্তারিত বর্ণনা দেননি, তবুও

মহানবী ﷺ-এর উক্তি, "রাতের নামায ২ রাকআত ২ রাকআত" উক্ত কর্মের ব্যাখ্যা দেয়। আর বিদিত যে, রসূল ﷺ-এর বিস্তারিত উক্তি তাঁর অস্পষ্ট কর্মের ব্যাখ্যা প্রদান করে। বলা বাহুল্য, এই ভিত্তির উপর বুনিয়াদ করে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম বলেন, এক সালামে একটানা ৪ রাকআত নামায পড়া মকরূহ অথবা হারাম। *(স্বালাতুল লাইলি অত্-তারাবীহ, ৪-৬পৃঃ, মুমঃ ৪/১৩, ৬৬-৬৭, ইবনে বায ফাসিঃ মুসনিদ ৮৭পৃঃ)*

৫। কোন রাতে তিনি ১১ রাকআত নামায পড়তেন। তার মধ্যে ৮ রাকআত একটানা পড়তেন। কোথাও না বসে অষ্টম রাকআত শেষ করে বসতেন। তাতে তিনি তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ে সালাম না ফিরে উঠে যেতেন এবং এক রাকআত পড়ে নিয়মিত সালাম ফিরতেন। সবশেষে বসে বসে ২ রাকআত নামায পড়তেন। *(আঃ ৬/৫৩-৫৪, ১৬৮, মুঃ, আদাঃ, নাঃ, বাঃ ৩০/৩০, সাতাঃ আলবানী ৯২পৃঃ)*

৬। কোন রাত্রে তিনি ৯ রাকআত নামায পড়তেন। তার মধ্যে ৬ রাকআত একটানা পড়তেন। অতঃপর বসে তাশাহহুদ ও দরূদ পাঠ করে সালাম না ফিরে উঠে যেতেন। তারপর এক রাকআত পড়ে নিয়মিত সালাম ফিরতেন। পরিশেষে বসে বসে ২ রাকআত নামায পড়তেন। *(ঐ)*

৩ রাকআত বিত্র পড়লে ২ নিয়মে পড়া যায়; (ক) ২ রাকআত পড়ে সালাম ফিরে পুনরায় উঠে আর এক রাকআত পড়তে হয়। অথবা (খ) ৩ রাকআত একটানা পড়ে শেষ রাকআতে বসে তাশাহহুদ-দরূদ পড়ে সালাম ফিরতে হয়। এ ক্ষেত্রে মাগরেবের নামাযের মত ২টি তাশাহহুদ পড়া বৈধ নয়। কারণ, বিত্র নামাযকে মাগরেবের নামাযের মত করে পড়তে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। সুতরাং তেমন করে পড়া কমপক্ষে মকরূহ। *(সালাতুল লাইলি অত্-তারাবীহ, ইবনে বায ৭পৃঃ, সাতাঃ আলবানী ৯৮-পৃঃ, বিস্তারিত দ্রঃ স্বালাতে মুবাশ্শির ২/২৯০)*

প্রকাশ থাকে যে, ইমামের জন্য উত্তম হল, ২ রাকআত করে তারাবীহর নামায আদায় করা। কারণ, এই নিয়ম নামাযীদের পক্ষে সহজ। তাছাড়া জামাআতের কোন লোক হয়তো বা নিজের প্রয়োজনে ২, ৪, অথবা ৬ রাকআত পর বের হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম ৪, ৫, ৭ বা ৯ রাকআত একটানা পড়লে সে ফেঁসে যাবে। দেহ থাকবে মসজিদে, অথচ তার মন থাকবে বাথরুমে অথবা জরুরী কাজে। পক্ষান্তরে ২ রাকআত করে পড়লে এমনটি হয় না। অবশ্য সুন্নাহ বয়ান করার উদ্দেশ্যে যদি কোন কোন সময় ঐরূপ একটানা নামায পড়ে, তাহলে তা দোষাবহ নয়। *(সালাতুল লাইলি অত্-তারাবীহ, ইবনে বায ৭পৃঃ)*

উক্ত সংখ্যা চাইতে কম সংখ্যক রাকআত তারাবীহ পড়াও বৈধ। যেহেতু এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ-এর কর্ম ও নির্দেশ প্রমাণিত। তাঁর কর্মের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন আবূ কাইস বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'আল্লাহর রসূল কত রাকআত বিত্র পড়তেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি কখনো ৪ রাকআত পড়ে ৩ রাকআত বিত্র পড়তেন, কখনো ৬ রাকআত পড়ে ৩ রাকআত বিত্র পড়তেন, কখনো ১০ রাকআত পড়ে ৩ রাকআত বিত্র পড়তেন। অবশ্য তিনি ৭ রাকআত অপেক্ষা কম এবং ১৩ রাকআত অপেক্ষা বেশী বিত্র পড়তেন না।' *(আঃ ৬/১৪৯, আদাঃ, প্রমুখ, দ্রঃ সাতাঃ আলবানী ৮৩-৮৪পৃঃ)*

আর এ ব্যাপারে তিনি নির্দেশ দিয়ে বলেন, "বিত্র হল প্রত্যেক মুসলিমের জন্য হক বা

সত্য। সুতরাং যে ৫ রাকআত বিত্র পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক, যে ৩ রাকআত পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক এবং যে এক রাকআত পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক।” *(আদাঃ ১৪২২, নাঃ, ইমাঃ, দারাঃ, হাঃ ১/৩০২, বাঃ ৩/২৭, মিঃ ১২৬৫নং)*

❖ প্রত্যেক দুই রাকআতের মাঝে যিক্র ঃ

প্রত্যেক দুই রাকআতে সালাম ফিরে তসবীহ, ইস্তিগফার বা দুআ পড়া দোষাবহ নয়। তবে এ সময় উচ্চস্বরে সে সব পড়া উচিত নয়। কারণ, তার কোন দলীল নেই। *(মবঃ ২৬/৯৮)*

প্রকাশ থাকে যে, ঐ সকল যিক্র বা দুআ যা ফরয নামাযের পর পড়া হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে এই নামাযের প্রত্যেক ২ রাকআত পরপর সালাম ফিরে নির্দিষ্ট যিক্র; যেমন “সুবহানা যিল মুলকি অল-মালাকূত, সুবহানা যিল ইয্যাতি অল-আযামাহ---” পড়া বিদআত। *(মুবিঃ ৩২৯পৃঃ)* এ স্থলে মহানবী ﷺ অথবা তাঁর কোন সাহাবী ؓ কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট দুআ বা যিক্র বর্ণিত হয়নি।

যেমন তারবীহর নামায শেষে অথবা প্রত্যেক ২ রাকআত পর পর নিয়মিত কোন নির্দিষ্ট জামাআতী যিক্র; যেমন সমস্বরে জামাআতী দরূদ আদি পড়া অবিধেয়; বরং তা বিদআত। মসজিদে এই শ্রেণীর চিৎকার ঘৃণ্য আচরণ এবং তা মসজিদে অন্যান্য নিষিদ্ধ কথা বলারই শ্রেণীভুক্ত। *(ফাতাওয়া শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ২/২৪৭)*

❖ এই নামাযের ক্বিরাআত ঃ

মহানবী ﷺ রাতের কিয়ামকে খুব লম্বা করতেন। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী ﷺ ৪ রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না। (অর্থাৎ অত্যন্ত সুন্দর ও দীর্ঘ হত।) অতঃপর তিনি ৪ রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না। অতঃপর তিনি ৩ রাকআত (বিত্র) নামায পড়তেন।’ *(বুঃ ১১৪৭, মুঃ ৭৩৮নং)*

হুযাইফা ؓ বলেন, ‘একদা তিনি এক রাকআতে সূরা বাক্বারাহ, আ-লি ইমরান ও নিসা ধীরে ধীরে পাঠ করেন।’ *(মুঃ ৭৭২, নাঃ ১০০৮, ১১৩২নং)*

হযরত উমার ؓ-এর যামানায় সলফগণ তারাবীহর নামাযের ক্বিরাআত লম্বা করে পড়তেন। পূর্ণ নামাযে প্রায় ৩০০টি আয়াত পাঠ করতেন। এমন কি এই দীর্ঘ কিয়ামের কারণে অনেকে লাঠির উপর ভর করে দাঁড়াতেন এবং ফজরের সামান্য পূর্বে তাঁরা নামায শেষ করে বাসায় ফিরতেন। সেই সময় খাদেমরা সেহরী খাওয়া সম্ভব হবে না -এই আশঙ্কায় খাবার নিয়ে তাড়াতাড়ি করত। *(মাঃ ২৪৯, ২৫১, ২৫২, মিঃ ১/৪০৮ আলবানীর টীকা দ্রঃ)*

তাঁরা ৮ রাকআতে সূরা বাক্বারাহ পড়ে শেষ করতেন এবং তা ১২ রাকআতে পড়া হলে মনে করা হত যে, নামায হাল্কা হয়ে গেল। *(ঐ)*

ইবনে কুদামাহ বলেন, ইমাম আহমাদ বলেছেন, রমযান মাসে (তারাবীহর নামাযে) এমন ক্বিরাআত করা উচিত, যাতে লোকেদের জন্য তা হাল্কা হয় এবং কাউকে কষ্ট না লাগে। বিশেষ করে (গ্রীষ্মের) ছোট রাতগুলিতে লম্বা ক্বিরাআত করা উচিত নয়। আসলে লোকেরা যতটা বহন করতে পারবে ততটা পরিমাণে নামায লম্বা হওয়া উচিত। *(মুগনী ২/১৬৯)*

❖ তারাবীহর নামাযে কুরআন খতমঃ

তারাবীহর নামাযে কুরআন খতম করার ব্যাপারে শায়খ ইবনে বায (রঃ) বলেন, এ ব্যাপারে প্রশস্ততা আছে। তবে আমার এমন কোন দলীল জানা নেই, যাকে কেন্দ্র করে বলা যায় যে, তারাবীহর নামাযে কুরআন খতম উত্তম। অবশ্য কিছু উলামা বলেন যে, ইমামের জন্য পূর্ণ কুরআন শুনানো উত্তম; যাতে করে জামাআতের জন্য (অন্ততপক্ষে বছরে একবার) পূর্ণ কুরআন শোনার সৌভাগ্য লাভ হয়। কিন্তু এ যুক্তি স্পষ্ট দলীল নয়।

সুতরাং যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, ইমাম তাঁর ক্বিরাআতে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করবেন, ধীর ও শান্তভাবে কুরআন তেলাঅত করবেন খতম করতে না পারলেও; বরং অর্ধেক বা দুই-তৃতীয়াংশ পড়তে না পারলেও মুক্তাদীরা যাতে উপকৃত হয় সেই চেষ্টাই করবেন। যেহেতু কুরআন খতম করা কোন জরুরী কাজ নয়; জরুরী হল লোকদেরকে তাদের নামাযের ভিতরে ক্বিরাআতের মাধ্যমে বিনয়-নম্রতা সৃষ্টি করে উপকৃত করা। যাতে তারা সেই নামায ও ক্বিরাআতে লাভবান ও তৃপ্ত হতে পারে। অবশ্য এর সাথে যদি কুরআন খতম করা সম্ভব হয়, তাহলে আল-হামদু লিল্লাহ। সম্ভব না হলে তিনি যা পড়েছেন তাই যথেষ্ট; যদিও কুরআনের কিছু অংশ বাকী থেকে যায়। কারণ, কুরআন খতম করা অপেক্ষা ইমামের মুক্তাদীগণের প্রতি সবিশেষ যত্ন নেওয়া, তাদেরকে নামাযের ভিতরে বিনয়াবনত হতে সর্বতঃ প্রয়াস রাখা এবং তাদেরকে নামাযে পরিতৃপ্ত করে উপকৃত করা বেশী গুরুত্ব রাখে। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কোন প্রকার কষ্ট-অসুবিধা ছাড়াই কুরআন খতম করেন এবং পূর্ণ কুরআন তাদেরকে শোনাতে সক্ষম হন, তাহলে তা অবশ্যই উত্তম। *(সালাতাঃ ১১-১২পৃঃ)*

বলা বাহুল্য, ইমামের জন্য জরুরী হল, মুক্তাদীদের অবস্থার খেয়াল রাখা। কেননা, মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ লোকেদের নামায পড়ায়, তখন সে যেন হাল্কা করে পড়ে। কেননা, তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও বৃদ্ধ লোক থাকে। অবশ্য যখন তোমাদের কেউ একা নামায পড়ে, তখন সে যত ইচ্ছা লম্বা করতে পারে।" *(আঃ, বুঃ ৭০৩নং, মুঃ ৪৬৭নং, তিঃ)*

❖ তাড়াহুড়া না করে সুন্দরভাবে তারাবীহ পড়াঃ

ইমামের জন্য উচিত নয়, নামাযে জলদিবাজি করা এবং কাকের দানা খাওয়ার মত ঠকাঠক নামায শেষ করা। যেহেতু মহানবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এ নামাযকে খুবই লম্বা করে পড়তেন; যেমন পূর্বে এ কথা আলোচিত হয়েছে। মহানবী ﷺ-এর রুকূ ও সিজদাহ প্রায় তাঁর কিয়ামের মতই দীর্ঘ হত। আর এত লম্বা সময় ধরে তিনি সিজদায় থাকতেন যে, সেই সময়ে প্রায় ৫০টি আয়াত পাঠ করা যেতে পারে। *(বুঃ ১১২৩নং দ্রঃ)*

সুতরাং এ কথা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে যে, আমরা আমাদের তারাবীহর নামাযকে তাঁদের নামাযের কাছাকাছি করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমরাও ক্বিরাআত লম্বা করব, রুকূ, সিজদাহ ও তার মাঝে কওমা ও বৈঠকে তসবীহ ও দুআ অধিকাধিক পাঠ করব। যাতে আমাদের মনে কিঞ্চিৎ পরিমাণ হলেও যেন বিনয়-নম্রতা অনুভূত হয়; যে বিনয়-নম্রতা হল নামাযের প্রাণ ও মস্তিষ্ক। আমাদের উচিত, এই নামাযের সুন্নতকে তার পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণ (কোয়ালিটি ও কোয়ানটিটি) উভয় দিক থেকেই গ্রহণ করা। অতএব আমরা

আমাদের সাধ্য অনুযায়ী নামাযের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য অবলম্বন করব; যেমন গ্রহণ করে থাকি রাকআত সংখ্যা। বলা বাহুল্য, বিনয়-নম্রতা, মনের উপস্থিতি ও ধীরতা-স্থিরতা ছাড়া কেবল রাকআত আদায়ের কর্তব্য পালন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

পক্ষান্তরে নামাযে অতিরিক্ত তাড়াহুড়া বৈধ নয়। তাছাড়া তাড়াহুড়া করতে গিয়ে যদি নামাযের কোন ওয়াজেব বা রুক্ন সঠিকরূপে আদায় না হয়, তাহলে তো নামাযই বাতিল হয়ে যাবে। পরন্তু ইমাম কেবল নিজের জন্য নামায পড়েন না। তিনি তো নিজের তথা মুক্তাদীদের জন্য নামায পড়ে (ইমামতি করে) থাকেন। সুতরাং তিনি হলেন একজন অলী (অভিভাবকের) মত। তাঁকে তাই করা ওয়াজেব, যা নামাযে ধীরতা-স্থিরতা বজায় রাখার সাথে সাথে মুক্তাদীদের অবস্থা অনুপাতে অবলম্বন করা উত্তম। *(দ্রঃ সাতাঃ ৯৯-১০৩, ফুসিতাযাঃ ১৮-পৃঃ, ফাসিঃ ৮৮, ৯৩পৃঃ)*

নামাযে ধীরতা ও স্থিরতা অবলম্বন করা ফরয ও অপরিহার্য। যে তা বর্জন করবে, তার নামায বাতিল গণ্য হবে। যেহেতু একদা মহানবী ﷺ এক ব্যক্তিকে অধীর ও অস্থির হয়ে নামায পড়তে দেখে তাঁকে নামায ফিরিয়ে পড়তে আদেশ করলেন এবং শিক্ষা দিলেন যে, নামাযের রুকূ, সিজদাহ, কওমাহ ও দুই সিজদার মাঝখানে ধীরতা ও স্থিরতা অবলম্বন করা ওয়াজেব। *(বুঃ ৭৫৭, মুঃ ৩৯৭নং, প্রমুখ)*

মহানবী ﷺ বলেন, "সে নামাযীর নামায যথেষ্ট নয়, যে রুকূ ও সিজদায় তার পিঠ সোজা করে না।" *(সুআঃ, আদাঃ ৮৫৫নং, আআঃ, সজাঃ ৭২২৪নং)*

তিনি বলেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হল সেই ব্যক্তি, যে তার নামায চুরি করে।" লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! নামায কিভাবে চুরি করবে?' বললেন, "পূর্ণরূপে রুকূ ও সিজদাহ না করে।" *(ইআশাঃ ২৯৬০ নং, ত্বাবা, হাঃ ১/২২৯, মাঃ, আঃ, সজাঃ ৯৮৬নং)*

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ সেই বান্দার নামাযের প্রতি তাকিয়েই দেখেন না, যে রুকূ ও সিজদায় তার মেরুদন্ড সোজা করে না।" *(ইআশাঃ ২৯৫৭, ইমাঃ, আঃ, সিসঃ ২৫৩৬ নং)*

❖ কুরআন দেখে ক্বিরাআত পড়াঃ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, একজন প্রকৃত হাফেযই ইমামতির অধিক যোগ্যতা রাখেন, যিনি নামাযে কুরআন মুখস্থ পড়বেন। কিন্তু ইমামতির জন্য যদি হাফেয না থাকেন, ইমাম সাহেব হাফেয না হন, অথবা তাঁর হিফয্ অত্যন্ত দুর্বল হয় এবং কুরআন দেখে পড়া তাঁর নিজের তথা মুক্তাদীদের জন্য বেশী উপকারী হয়, তাহলে কুরআন দেখে ক্বিরাআত করায় কোন দোষ নেই। বিশেষ করে প্রত্যেক রাত্রে তারাবীহর নামাযে প্রথম রাকআতে কোন ছোট সূরা এবং দ্বিতীয় রাকআতে 'ক্বুল হুওয়াল্লাহ' পড়া অথবা ৮ রাকআতেই সূরা নাবা পড়া অপেক্ষা উক্ত আমল উত্তম।

যদিও উক্ত কাজে নামাযের ভিতর কিছু অতিরিক্ত কর্ম করতে হয়; যেমন কুরআন তোলা-রাখা, পৃষ্ঠা খোঁজা ইত্যাদি, তদনুরূপ যদিও তাতে কিছু সুন্নত; যেমন বুকে হাত রাখা, সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা ইত্যাদি বাদ পড়ে, তবুও প্রয়োজনে তা বৈধ। যেহেতু কর্ম বেশী হলেও যদি তা কোন প্রয়োজন মোতাবেক হয় এবং একটানা একাধিকবার না হয়, তাহলে তাতে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। যেমন মহানবী ﷺ নামায-রত অবস্থায় উমামাহ বিন্তে

যায়নাবকে বহন করেছেন। সূর্যগ্রহণের নামাযে তিনি অগ্রসর ও পশ্চাদ্‌পদ হয়েছেন।

এতদ্ব্যতীত কিতাব ও সুন্নাহর যে ব্যাপক দলীল নামাযে ক্বিরাআত পড়তে নির্দেশ দেয় তা দেখে পড়া ও মুখস্থ পড়ার ব্যাপারে সাধারণ। অতএব মূলতঃ তা বৈধ। পরন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর আমল এ কথার সমর্থন করে। তাঁর মুক্ত করা দাস যাকওয়ান রাত্রে মুসহাফ দেখে তাঁর ইমামতি করতেন। *(বুঃ তা'লীকান ১৩৯পৃঃ, ইআশাঃ ৭২১৬নং, আরাঃ)*

পক্ষান্তরে হাফেয ইমাম পাওয়া গেলে সেটাই উত্তম। কারণ, মুখস্থ পড়াতে হৃদয় হাযির থাকে এবং অতিরিক্ত কাজও করতে হয় না। মোট কথা, প্রয়োজনে কুরআন দেখে তারাবীহর ক্বিরাআত বৈধ। তবে (হাফেয ইমাম রেখে) বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণই সর্বোত্তম। *(দ্রঃ সালাতাঃ ১৭-১৮-পৃঃ, ফবাঃ ২/২১৭ টীকা, ফাসিঃ মুসনিদ ৮৬পৃঃ)*

❖ মুক্তাদীর কুরআন দেখাঃ

নামায অবস্থায় মুক্তাদীর কর্তব্য হল, বিনয়-নম্রতা ও ধীরতা-স্থিরতা অবলম্বন করা, ইমামের ক্বিরাআত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকে বাঁধা, সিজদার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা ইত্যাদি। কিন্তু হাতে কুরআন নিলে উক্ত সকল সুন্নাহ পরিত্যক্ত হয়ে যায়। পৃষ্ঠা ও আয়াত নম্বর খুঁজতে গিয়ে অনেক সময় তার মন ও দৃষ্টি কুরআন শোনা থেকে মশগুল হয়ে পড়ে। সুতরাং হাতে কুরআন না নেওয়াটাই মুক্তাদীর জন্য সুন্নত। অবশ্য ইমামের হিফ্‌য কাঁচা হলে তাঁর ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর পিছনে কুরআন দেখে গেলে প্রয়োজনে তা বৈধ; দূষণীয় নয়। পক্ষান্তরে অপ্রয়োজনে প্রত্যেকে কুরআন হাতে ইমামের ক্বিরাআত দেখে যাওয়া সুন্নাহর বিপরীত কাজ। *(সালাতাঃ ১৮- ১৯পৃঃ)*

❖ ক্বিরাআত পড়তে পড়তে কান্না করাঃ

ক্বিরাআত চলা অবস্থায় ইমাম বা মুক্তাদীর আবেগে কান্না চলে আসা নামাযের জন্য ক্ষতিকর নয়। তবে কারো জন্য উচ্চস্বরে কাঁদা উচিত নয়। কারণ, এতে অন্যান্য নামাযীদের নামাযে ক্ষতি হয় এবং তাতে তাদের - আর বিশেষ করে মুক্তাদী কাঁদলে ইমামের - ডিষ্টার্ব হয়। অতএব মুমিনের চেষ্টা করা উচিত, যাতে তার কান্নার শব্দ অন্য কেউ শুনতে না পায় এবং 'রিয়া' (লোক-দেখানি কাজ) না হয়ে বসে। কারণ, শয়তান এই ছিদ্রপথে তাকে 'রিয়া'র দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

অবশ্য কান্না যার এখতিয়ারে নয়; বরং যে চাপা কান্না রুখতে সমর্থ নয় এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সশব্দে কান্না এসে পড়ে তার সে কাজ ধর্তব্য নয়; বরং তা ক্ষমার্হ। প্রমাণিত যে, মহানবী ﷺ যখন ক্বিরাআত পড়তেন তখন তাঁর বক্ষস্থলে হাঁড়িতে পানি ফোটার মত (অথবা যাঁতা ঘোরার মত) কান্নার শব্দ পাওয়া যেত। *(আদাঃ, নাঃ, বাঃ ২/২৫১, আঃ ৪/২৫, ২৬, ইখুঃ, ইহিঃ, সআদাঃ ৭৯৯নং)*

হযরত আবূ বাক্‌র ﷺ-এর ব্যাপারে বর্ণিত যে, তিনি ক্বিরাআত করলে কান্নার ফলে লোকদেরকে তা শুনাতে পারতেন না। *(বুঃ ৬৭৯নং দ্রঃ)*

হযরত উমার ﷺ-এর ব্যাপারে বর্ণিত যে কাতারসমূহের পিছন থেকে তাঁর কান্নার শব্দ শুনতে পাওয়া যেত। *(বুঃ ১৪৪পৃঃ তা'লীক)*

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ইচ্ছা করেই উচ্চস্বরে কান্না করা যাবে। বরং মহান আল্লাহর ভয়ে যে চাপা কান্না সংবরণ করতে পারা যায় না তা দূষণীয় নয়। বলা বাহুল্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে কান্না রুখতে পারা যায় না সে কান্নায় নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। *(সালাতাঃ ১৯-২০পৃঃ)*

পক্ষান্তরে কান্নার ভান করতে গিয়ে কষ্ট-চেষ্টা করা উচিত নয়। বরং কান্না এসে পড়লে এই চেষ্টা হওয়া উচিত, যাতে লোকেদের ডিষ্টার্ব না হয়। আর সে কান্না হবে সাধ্য ও সম্ভব অনুসারে হাল্কা; যাতে কারো নামাযে কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে। *(সালাতাঃ ২৪পৃঃ)* উল্লেখ্য যে, "তোমাদের কান্না না এলে কান্নার ভান কর" -এ হাদীস দুর্বল। *(দ্রঃ যইমাঃ ২৮১, যজাঃ ২০২৫নং)*

❖ আয়াতের পুনরাবৃত্তি ঃ

কোন আয়াতকে কেন্দ্র করে ভাবতে ও ভাবাতে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তা একাধিক বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পাঠ করা দোষাবহ নয়; যদি তার ফলে হৃদয়ে প্রভাব পড়ে এবং কান্না আকর্ষণ করে। *(সালাতাঃ ২০-২১পৃঃ)* আর এ কথা প্রমাণিত যে, এক রাত্রে মহানবী ﷺ একটি মাত্র আয়াতকে বারবার পাঠ করে ফজর পর্যন্ত কিয়াম করেছেন। *(আঃ, নাঃ, ইমাঃ, ইখুঃ, হাঃ, মিঃ ১২০৫নং)* সে আয়াতটি হল,

(([illegible]))

অর্থাৎ, (হে প্রতিপালক!) যদি তুমি ওদেরকে শাস্তি দাও, তাহলে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি ওদেরকে মাফ করে দাও, তাহলে নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়। *(কুঃ ৫/১১৮)*

মহানবী ﷺ কুরআন তেলাঅতের সময় তসবীহর আয়াত পাঠ করলে তসবীহ পড়তেন, মঙ্গল প্রার্থনার আয়াত পাঠ করলে মঙ্গল প্রার্থনা করতেন এবং আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত পাঠ করলে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। *(মুঃ ৭৭২, নাঃ ১১৩২নং)* অতএব বাঞ্ছনীয় হল, আয়াত হৃদয়ঙ্গম করার সাথে সাথে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। মহান আল্লাহ বলেন,

.(([illegible]))

অর্থাৎ, আমি এই বর্কতময় কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে ওরা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরা (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে। *(কুঃ ৩৮/১৯)*

❖ নামাযে কুরআন-খতমের দুআ ঃ

শায়খ ইবনে উষাইমীন (রঃ) বলেন, নামাযের ভিতরে কুরআন-খতমের পর দুআ করার সপক্ষে রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে অথবা সাহাবাদের আমল থেকে নির্ভরযোগ্য কোন সহীহ ভিত্তি নেই। এই দুআর সপক্ষে একমাত্র দলীল হল হযরত আনাসের আমল; তিনি কুরআন খতম করার সময় নিজের পরিবারের লোকদেরকে সমবেত করে দুআ করতেন। *(ইআশাঃ, দাঃ, ত্বাবঃ, মাযাঃ ৭/১৭২)* কিন্তু তিনি নামাযে এমন করতেন না।

আর বিদিত যে, নামাযের যে স্থানে দুআ করার ব্যাপারে কোন সুন্নাহ বর্ণিত হয়নি, সে স্থানে দুআ (আবিষ্কার) করা বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা সেই মত নামায পড়,

যে মত আমাকে পড়তে দেখেছ।” *(আঃ ৫/৫২, বুঃ ৬৩০নং, দাঃ)*

কিন্তু নামাযে কুরআন খতমের দুআকে বিদআত আখ্যায়ন দেওয়া আমার কাছে পছন্দনীয় নয়। কেননা উলামাদের তাতে মতভেদ রয়েছে। অতএব এ ব্যাপারে এত বড় কটুক্তি করা আমাদের উচিত নয়, যেখানে কিছু উলামা সে কাজকে মুস্তাহাব মনে করেছেন।([১]) অবশ্য মুসলিমের উচিত, সুন্নাহর অনুসরণে শত যত্নবান হওয়া। *(মুমঃ ৪/৫৭, ৪৮ঃ ৫৮পৃঃ)*

বলা বাহুল্য, এ কাজকে অনেক উলামা পরিষ্কারভাবে বিদআত বলেই অভিহিত করেছেন। *(দ্রঃ মুবিঃ ৩২০পৃঃ)*

যেমন কুরআন খতমের কোন নির্দিষ্ট দুআও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়নি। *(সালাতাঃ ৩২পৃঃ)* আর কুরআন মাজীদের শেষের দিকে ‘দুআ-এ খাতমুল কুরআন’ নামক শীর্ষে যে লম্বা দুআ লিখা থাকে, তা মনগড়া।

❖ খতমের দুআয় শরীক হওয়াঃ

ইমাম নামাযে কুরআন খতমের দুআ করলে মুক্তাদীও সে দুআতে শরীক হয়ে ‘আমীন-আমীন’ বলতে পারে। যদিও নামাযের মধ্যে কুরআন-খতমের মুনাজাত করার ব্যাপারে সুন্নাহ থেকে কোন দলীল নেই, তবুও যেহেতু মুসলিমদের কিছু আয়েম্মায়ে কেরাম তা করা মুস্তাহাব বলেছেন এবং তা হল একটি বৈধ ইজতিহাদী অভিমত, আর তা ভুল হলেও হতে পারে; কিন্তু তা হারাম কিছু নয়, সেহেতু সে কাজে ইমামের অনুসরণ করায় কোন বাধা নেই। যেমন ইমাম দুআ করলে সে দুআ বিদআত মনে করে অথবা সুন্নাহতে নেই বলে ঐ নামায ত্যাগ করে বেরিয়ে যাওয়া কারো জন্য উচিত নয়। কারণ, তাতে জামাআতের মাঝে অনৈক্য ও পারস্পরিক বিদ্বেষ পরিদৃষ্ট হবে। আর এ কাজ হবে আয়েম্মায়ে কেরামদের আমলের প্রতিকূল। যেমন ইমাম আহমাদ (রঃ) ফজরের নামাযে কুনূত পড়াকে মুস্তাহাব মনে করতেন না; বরং তা বিদআত মনে করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বলতেন, ‘যদি তুমি এমন ইমামের পশ্চাতে ফজরের নামায পড় যে কুনূত পড়ে, তাহলে তুমি তার কুনূতেও তার অনুসরণ কর এবং তার দুআয় আমীন বল।’ আর তা হল জামাআতের মাঝে সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য; যাতে একে অপরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ না করে। *(মুমঃ ৪/৮৬-৮৭, ৪৮ঃ ৫৯-৬০পৃঃ)*

❖ কুনূতের কতিপয় আনুষঙ্গিক মাসায়েলঃ

- উত্তম ও দলীলের অধিক নিকটবর্তী কাজ হল ‘আল্লাহুম্মাহদিনা ফীমান হাদাইতা’ বলে কুনূতের দুআ শুরু করা। অবশ্য যদি কেউ দুআ করার মৌলিক নীতির উপর আমল করে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পড়ার মাধ্যমে কুনূত শুরু করে, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই।
- নবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত দুআ-এ মাযূরা ছাড়াও যদি কেউ নিজের তরফ থেকে অন্য দুআ কুনূতে পড়তে চায়, তাহলে তা দোষাবহ নয়। কারণ, এ স্থল হল দুআ

([১]) এ ব্যাপারে ইবনে বাযের অভিমত সালাতাঃ ২৮-৩১পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

করার স্থল। তা ছাড়া এ কুনূত হল এক প্রকার 'কুনূতে নাযেলাহ'। আর এই কুনূতে মহানবী ﷺ কাফেরদের জন্য বদ্দুআ এবং মুসলিমদের জন্য দুআ করেছেন। *(বুঃ ১০০৬নং দ্রঃ)* অনুরূপ আবূ হুরাইরা ﷺ কুনূতে মুমিনদের জন্য দুআ করতেন এবং কাফেরদের উপর অভিশাপ দিতেন। *(বুঃ ৭৯৭, মুঃ ৬৭৬নং)* আ'রাজ বলেন, 'আমাদের দেখা সকল লোকেই রমযানে কাফেরদের প্রতি অভিশাপ করত।' *(মাঃ ২৫১নং)* বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট দুআ নেই। অতএব বুঝা গেল যে, এ ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা নেই। এতদ্ব্যতীত যদি ধরে নেওয়া যায় যে, কোন মানুষ দুআ-এ মাষূর জানে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির যা জানা আছে এবং যা উপযুক্ত মনে করে নিজের প্রয়োজন অনুপাতে তাই দিয়ে দুআ করতে পারে; যদি আসলে দুআ সহীহ দুআ হয় তাহলে। অবশ্য দুআ-এ মাষূর ব্যবহারে যত্নবান হওয়াই উত্তম আমল। *(মুমঃ ৪/৫২, সালাতাঃ ৩৯-৪০পৃঃ)*

❖ দুআয় ছন্দ ব্যবহার ঃ

দুআ করার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি দুআর শব্দাবলীতে ছন্দ এসে যায়, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। দূষণীয় হল কষ্টকল্পনার সাথে ছন্দ বানিয়ে দুআ করা। কারণ, মহানবী ﷺ কথায় ছন্দ ব্যবহারের নিন্দা করেছেন। এক ব্যক্তির বাঁধা-ছাঁদা কথা শুনে তিনি বলেছিলেন, "এ ছন্দ তো গণকের ছন্দের মত!" অথবা "এ লোক তো গণকদের এক ভাই।" *(মুঃ ১৬৮১নং)*

পক্ষান্তরে অনিচ্ছাকৃত ছন্দে দোষ নেই। এমন শব্দ-ছন্দ মহানবী ﷺ-এর কথায়ও কখনো কখনো এমনিই এসে যেত। *(সালাতাঃ ৪০পৃঃ)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'খেয়াল করে ছন্দযুক্ত দুআ থেকে দূরে থাক। যেহেতু আমি রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাবর্গের নিকট উপলব্ধি করেছি যে, তাঁরা ছন্দ করে দুআ উপেক্ষা করতেন।' *(আঃ ৬/২১৭, বুঃ ৬৩৩৭নং)*

❖ লম্বা দুআ কি বৈধ ?

কোন কোন ইমাম দুআকে এত লম্বা করেন যে, তাতে মুক্তাদীদের অনেকের অথবা সকলের কষ্ট হয়। পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর ইমাম আছেন, যাঁরা কুনূতের দুআকে কবিতা আবৃত্তির মত গড়গড় করে পড়ে ফেলেন। কিন্তু যখন মুনাজাত শুরু করেন, তখন একই দুআকে বারবার বলে বেশ দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। ফলে কেউ কেউ প্রায় আধ ঘন্টা ধরে কুনূত পড়েন। আর কেউ তো আবার লিখিত দুআর কাগজ হাতে রেখে দেখে দেখে পড়তে থাকেন!

বলা বাহুল্য, দুআ করতে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা এবং দুআ শেষ করার পরেও মুক্তাদীদের মনে আরো দুআ করার আকাঙ্ক্ষা থেকে যাওয়াটা, তাদের মনে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করা অপেক্ষা উত্তম।

আমাদের প্রিয় নবী ﷺ আমাদেরকে দুআ-এ কুনূত শিখিয়ে গেছেন। অবশ্য তার পরে অন্য মুনাজাতের প্রমাণিত ও শুদ্ধ দুআ বেশী করে পড়া যদিও দূষণীয় নয়, তবুও খেয়াল রাখতে হবে, যাতে নামাযীদের যেন কষ্ট না হয় এবং তা দুআয় সীমালংঘন করার পর্যায়ভুক্ত না হয়ে

পড়ে।

আসলে বিরাট লম্বা সময় ধরে দুআ করা দুআতে সীমালংঘন করারই পর্যায়ভুক্ত। আর মহান আল্লাহ বলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। *(সূরা আ'রাফ ৫৫ আয়াত)*

একদা আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল ﷺ তাঁর ছেলেকে দুআ করতে শুনলেন; ছেলে বলছে, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করব, তখন তার ডান দিকে সাদা মহল চাই।' তিনি বললেন, 'বেটা! আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাও। কারণ, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "এই উম্মতের একটি সম্প্রদায় হবে, যারা পবিত্রতায় এবং দুআতে সীমালংঘন করবে।" *(সআদাঃ ৮৭, সইমাঃ ৩১১৬নং)*

পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ-এর আদর্শ ছিল, তিনি অল্প শব্দে বেশী অর্ধবোধক দুআ ব্যবহার করতেন এবং এ ছাড়া অন্যান্য (লম্বা) দুআ পরিহার করতেন। অতএব ইমাম সাহেবের উচিত, অনুরূপ অল্প শব্দে বেশী অর্থবোধক উপকারী দুআ নির্বাচন করে তার দ্বারা দুআ করা এবং তা অতিরিক্ত লম্বা করে লোকদেরকে বিরক্ত না করা। *(সালাতাঃ ২৯পৃঃ, তাফাসাসাঃ ৮৩পৃঃ, কানামিরাঃ ১৪-১৫পৃঃ)*

❖ একবচন শব্দের দুআকে বহুবচন করে পড়াঃ

দুআ-এ মাষূর একবচন শব্দে হলে ইমাম সাহেব সেটিকে বহুবচন শব্দে ব্যবহার করবেন। কারণ, তিনি নিজের সাথে সাথে মুক্তাদীদের জন্যও দুআ করে থাকেন। *(সালাতাঃ ৪১পৃঃ, এ ব্যাপারে অধিক দ্রঃ সালাতি মুবাশ্শির ২/২৯৩)*

❖ কুনূতের জবাবঃ

কুনূতের দুআয় ইমামের 'ইন্নাহু লা য়্যাযিল্লু ---' বলার সময় যেহেতু 'আমীন' বলা হয় না সেহেতু কোন কোন লোক এ ক্ষেত্রে 'স্বাদাক্বতা', 'হাক্ব-হাক্ব', 'আশহাদ', অথবা 'ইয়াল্লাহ' বলে থাকে। আসলে এ সব বলা বিদআত। *(মুবিঃ ৩২২-৩২৩পৃঃ)*

❖ কুনূতের দুআর শেষে মুখে হাত বুলানোঃ

দুই হাত তুলে কুনূতের (অনুরূপ যে কোন) দুআর শেষে মুখে হাত বুলানো সুন্নত নয়। কেননা, এ ব্যাপারে বর্ণিত সমস্ত হাদীসগুলি যয়ীফ। *(দ্রঃ ইগঃ ২/১৮১, মুমঃ ৪/৫৫)* আর যয়ীফ হাদীস দ্বারা কোন সুন্নত প্রমাণ করা আমাদের জন্য সম্ভব নয়। তাই অনেক উলামা পরিষ্কারভাবে এ কাজকে বিদআত বলেছেন। *(দ্রঃ ইগঃ ২/১৮২, মুবিঃ ৩২২পৃঃ)*

মাজমূ' নামক কিতাবে ইমাম নওবী ইয্য্ বিন আব্দুস সালামের সাথে একমত হয়ে বলেন, (দুআর শেষে মুখে হাত বুলানো) মুস্তাহাব নয়। ইয্য্ বিন আব্দুস সালাম বলেছেন, 'জাহেল ছাড়া এ কাজ কেউ করে না।'

এতদ্ব্যতীত এ কাজ বিধেয় না হওয়ার সমর্থনকারী আরো দলীল এই যে, হাত তুলে দুআ করার কথা বহু হাদীসেই এসেছে; কিন্তু কোন হাদীসে দুআর শেষে মুখে হাত বুলানোর কথা উল্লেখ হয়নি। আর তার মানেই হল, ইন শাআল্লাহ- হাত বুলানোর সপক্ষের হাদীসগুলি মুনকার (সহীহ-বিরোধী), বিধায় তা বিধেয় নয়। *(ইগঃ ২/১৮২)*

❖ **কুনূতের মান ঃ**

বিতর নামাযে কুনূত পড়া সুন্নত, ওয়াজেব নয়। কারণ, যে সকল সাহাবাবৃন্দ বিতর নামাযের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা তাতে কুনূতের কথা উল্লেখ করেননি। বলা বাহুল্য, যদি মহানবী ﷺ তা প্রত্যহ করতেন, তাহলে তাঁরা সকলেই সে কথা বর্ণনা করতেন। তবে হ্যাঁ, একা উবাই বিন কা'ব বর্ণনা করেছেন যে, রসূল ﷺ বিতরে কুনূত পড়তেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি কখনো কখনো তা পড়তেন। আর এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, তা ওয়াজেব নয়। *(সিসানঃ ১৭৯পৃঃ টীকা নং ৭)* যেহেতু মহানবী ﷺ-এর কেবলমাত্র সে কাজ করা, তা ওয়াজেব হওয়ার দলীল হতে পারে না। যেমন হাসান ؓ-কে তাঁর সে দুআ শিক্ষা দেওয়াও, তা ওয়াজেব হওয়ার দলীল নয়।

সুতরাং উত্তম হল প্রত্যহ (প্রত্যেক রাত্রে) বিতরে কুনূত না পড়া। *(মুমঃ ৪/২৭)* আর ইমাম সাহেবেরও উচিত, কখনো কখনো তা বর্জন করা। যাতে সাধারণ লোক বিতরে কুনূত পড়াকে ওয়াজেব মনে করে না বসে।

❖ **ইমামের সাথে নামায শেষ করার মাহাত্ম্য ঃ**

যে ব্যক্তি জামাআতের ইমামের পিছনে রাতের কিছু অংশ তারাবীহ পড়বে এবং ইমাম শেষ করলে সেও শেষ করবে (অর্থাৎ, তাঁর আগে বা পরে শেষ করবে না), তার নেকীর খাতায় পূর্ণ রাত নামায পড়ার সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ে এবং তার নামায শেষ করা পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকে (ইক্তিদা করে), সেই ব্যক্তির জন্য সারা রাত্রি কিয়াম করার সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(আঃ, সআদাঃ ১২২৭, সতিঃ ৬৪৬, সনাঃ ১৫১৪, সইমাঃ ১৩২৭নং)*

এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, যদি কোন লোক ইমামের সাথে ৮ রাকআত নামায পড়ে এবং বিতর না পড়ে ইমামের সাথে নামায শেষ করে না, সে লোক উক্ত ফযীলত পাওয়ার অধিকারী নয়।

তদনুরূপ যদি কোন ইমাম ২১ রাকআত তারাবীহ পড়েন এবং তাঁর পশ্চাতে কেউ ১০ বা ১২ রাকআত পড়ে পৃথক হয়ে একাকী বিতর পড়ে নেয়, (কারণ তার মতে তার থেকে বেশী রাকআত পড়া বৈধ নয় তাই) তাহলে সে ব্যক্তিও উক্ত মাহাত্ম্য পাওয়ার হকদার নয়।

পক্ষান্তরে কোন মুসলিমের জন্য সাগ্রহে সুন্নত পালন করতে গিয়ে জামাআতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা এবং জামাআত ত্যাগ করে চলে যাওয়া উচিত নয়। উচিত হল, তাঁর সাথে যখন ১০ বা ১২ রাকআত পড়ল, তখন বাকী নামাযটাও তাঁর সাথেই শেষ করা। আর এই বেশী নামায পড়াটা (সুন্নত না হলেও) কোন অবৈধ বা আপত্তিকর কাজ নয়। (নফল নামায বেশী পড়া বিদআত তো নয়; কারণ তা বৈধ হওয়ার কিছু দলীল তো রয়েছে। আর এ

কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।) অতএব বড়জোর তা ভালোর পরিপন্থী অথবা সুন্নাহর খিলাপ; যাতে ইজতিহাদী মতভেদ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাহলে তা নিয়ে আমাদের আপোসের মাঝে অনৈক্য ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং এমন ইজতিহাদী মাসআলাকে কেন্দ্র করে নিজ মতের বিরোধী পক্ষকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা আদৌ বৈধ নয়। আমাদের উচিত, যথাসম্ভব আমাদের মাঝে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা। *(মুমঃ ৪/৮৩-৮৭ দ্রঃ)*

❖ জামাআতে নামায পড়ার পর শেষ রাতে নামাযঃ

যদি কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে বিতর পড়ার পর শেষ রাতে অতিরিক্ত নামায পড়ে সবশেষে বিতর পড়ার জন্য ইমামের সালাম ফিরার পর সে সালাম না ফিরে উঠে আর এক রাকআত পড়ে জোড় বানিয়ে নেয়, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। আর এ ব্যক্তির জন্য বলা যাবে যে, সে ইমামের সাথেই নামায শেষ করেছে। আর যে এক রাকআত নামায সে বেশী পড়েছে, তা শরয়ী স্বার্থেই; যাতে তার বিতর রাতের নামাযের শেষ নামায হয়। অতএব তা দোষাবহ নয়।

অবশ্য উত্তম হল, ইমামের সঙ্গেই বিতর পড়া, তাঁর সঙ্গেই নামায শেষ করা এবং তারপর আর তাহাজ্জুদ না পড়া। যেহেতু সাহাবাগণ যখন মহানবী ﷺ-এর নিকট বাকী রাতটুকু নামায পড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন জানালেন, তখন তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ে এবং তার নামায শেষ করা পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকে (ইক্তিদা করে), সেই ব্যক্তির জন্য সারা রাত্রি কিয়াম করার সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।” *(আঃ, সআদাঃ ১২২৭, সতিঃ ৬৪৬, সনাঃ ১৫১৪, সইমাঃ ১৩২৭নং)*

বলা বাহুল্য এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইমামের সাথেই নামায পড়ে শেষ করাটাই উত্তম। কারণ, তিনি তাঁদেরকে বিতর ছেড়ে দিয়ে শেষ রাতে কিয়াম করার নির্দেশ দেননি। আর তার কারণ হল, ইমামের সাথে এইটুকু কিয়ামেই তো সত্যপক্ষে সারা রাত্রি জাগরণ করে নামায পড়ার সওয়াব অর্জন হয়ে যাবে। বিশ্রাম করা সত্ত্বেও পরিশ্রম করার সওয়াব লিখা হবে। বাস্তবে এটি একটি বড় নেয়ামত! *(মুমঃ ৪/৮৮)*

মোট কথা, ইমাম রাতে কিছু অংশ নামায পড়লে জামাআতের জন্য কিছু অংশই নামায পড়া উত্তম এবং তিনি সারা রাত্রি নামায পড়লে সকলের জন্য সেটাই উত্তম। এ ছাড়া ইমাম না পড়লে একাকী কারো জন্য সারারাত্রি নামায পড়া উত্তম নয়।

❖ তারাবীহর জামাআতে এশার নামাযঃ

তারাবীহর নামাযের জামাআত চলাকালে কেউ এশার নামায না পড়া অবস্থায় মসজিদে এলে তার জন্য একাকী বা পৃথক জামাআত করে এশার নামায পড়া বৈধ নয়। বরং তার উচিত হল, এশার নিয়তে জামাআতে শামিল হওয়া। অতঃপর ইমাম সালাম ফিরে দিলে এশার বাকী নামায একাকী পড়ে নেওয়া। তারপর এশার পর ২ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদার নিয়তে ইমামের সাথে ২ রাকআত পড়া। তারপর তারাবীহর নিয়তে বাকী নামায পড়া।

এ ক্ষেত্রে ইমাম-মুক্তাদীর নিয়ত ভিন্ন হলেও কোন ক্ষতি নেই। যেহেতু নফল নামাযীর পশ্চাতে ফরয নামায পড়া বৈধ। *(সালাতাঃ ৪৪-৪৫পৃঃ, মুমঃ ৪/৯১)* সাহাবী মুআয বিন জাবাল

ﷺ মহানবী ﷺ-এর সাথে এশার নামায পড়তেন। অতঃপর তিনি ফিরে গিয়ে নিজের জামাআতের (ঐ নামাযেরই) ইমামতি করতেন। *(বুঃ ৭০০, মুঃ ৪৬৫, বাঃ ৩/৮৬, দারাঃ ১০৬২নং)* ফরয পড়ে নেওয়ার পর মুআযের সে নামায ছিল নফল। পরন্তু আল্লাহর নবী ﷺ তাঁর এ কাজে কোন আপত্তি প্রকাশ করেননি। অতএব বুঝা গেল যে, নফল নামাযীর পশ্চাতে ফরয নামায পড়া বৈধ।

এ ছাড়া স্বালাতে খাওফে মহানবী ﷺ একদলকে নিয়ে ২ রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরেছেন। অতঃপর আর একদলকে নিয়ে তিনি ২ রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরেছেন। *(সআদাঃ ১১১২নং)* উভয় নামাযের মধ্যে তাঁর প্রথম নামাযটি ছিল ফরয এবং দ্বিতীয়টি নফল; আর তাঁর পশ্চাতের লোকদের সে নামায ছিল ফরয।

❖ কাছের মসজিদ ছেড়ে দূরের মসজিদে নামায ঃ

কাছের মসজিদের ইমামের যদি ক্বিরাআত ভালো না হয়, তাহলে সুন্দর ক্বিরাআত বা সুমধুর আওয়াজের জন্য দূরের মসজিদে গিয়ে নামায পড়ায় কোন দোষ নেই। অবশ্য এতে উদ্দেশ্য হবে, সুমধুর ক্বিরাআতে তার নামাযে বিনয়-নম্রতা বৃদ্ধি পাবে এবং সে নামাযে পরিতৃপ্ত হয়ে তার হৃদয় প্রশান্ত হবে। আর খবরদার! তাতে যেন মনে কোন প্রকার খেয়াল-খুশী বা কারো প্রতি খামাখা বিদ্বেষ অথবা অন্যায় দোষারোপ না থাকে।

তদনুরূপ যদি কারো দূরের মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্য বেশী পদক্ষেপের ফলে বেশী বেশী সওয়াব নেওয়া হয়, তাহলে তাও একটি মহৎ উদ্দেশ্য। *(সালাতাঃ ৯-১০পৃঃ)*

অনুরূপভাবে যদি কাছের মসজিদের ইমাম সঠিকভাবে (যথানিয়মে রুকূ-সিজদাহ করার সাথে) নামায না পড়ে, অথবা কোন বিদআতী আমল অথবা কোন প্রকাশ্য ফাসেকী কর্মদোষে অভিযুক্ত হন, তাহলেও তাঁর পশ্চাতে নামায না পড়ে দূরের মসজিদে ভালো ইমামের পিছনে নামায পড়তে যাওয়া দূষণীয় নয়।

তবে সতর্কতার বিষয় যে, যদি একাজে পার্শ্ববর্তী মসজিদ পরিত্যক্ত হওয়ার ছিদ্রপথরূপে গণ্য হয় অথবা সে মসজিদের ইমামের মনে ব্যথা পাওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে দূরবর্তী মসজিদে যাওয়া বৈধ নয়। কারণ, আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত যে, মহানবী ﷺ বলেছেন, "লোকে যেন তার পার্শ্ববর্তী মসজিদে নামায পড়ে এবং এ মসজিদ সে মসজিদ করে না বেড়ায়।" *(ত্বাবঃ, সিসঃ ২২০০নং)*

বলা বাহুল্য, নিষেধ অমান্য করে কোন ফযীলত বা মাহাত্ম্য অর্জন সম্ভব নয়। তাছাড়া উক্ত কাজে ঐ ভালো ইমামও ফিতনায় (গর্ব বা অহমিকায়) পড়তে পারেন। সুতরাং সাবধান! *(কানামিরাঃ ২২-২৩পৃঃ টীকা, মারবিয়াতু দুআ-ই খাতমিল কুরআন, ডঃ বাক্‌র আবু যায়দ ৮০-৮১পৃঃ)*

❖ তারাবীহ ও শেষ দশকের কিয়ামের মাঝে পার্থক্য ঃ

তারাবীহ ও শেষ দশকের কিয়ামুল লাইলের মাঝে রাকআত সংখ্যা ও নিয়ম-পদ্ধতির দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। উভয় নামায এক ও অভিন্ন। (তবে সাধারণতঃ এশার পর পড়লে তারাবীহ এবং মধ্য রাত্রির পর পড়লে কিয়ামুল লাইল বলা হয়।) শেষ দশকেও ঐ ১১ রাকআতই নামায সুন্নত। কারণ, মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'তিনি রমযানে এবং অন্যান্য

মাসেও ১১ রাকআত অপেক্ষা বেশী নামায পড়তেন না।' *(বুঃ ১১৪৭, মুঃ ৭৩৮নং)* এখানে তিনি শেষ দশকে পৃথক রাকআত সংখ্যার কথা উল্লেখ করেন নি। সুতরাং রমযানের সকল রাত্রেই ১১ রাকআত কিয়াম পড়াই উত্তম। তবে শেষ দশকে ঐ নামায বেশী দীর্ঘ হবে। যেহেতু রসূল ﷺ ঐ শেষ দশকে সারা সারা রাত নামায পড়তেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'শেষ দশক এসে প্রবেশ করলে নবী ﷺ নিজের লুঙ্গি বেঁধে নিতেন, তার রাত্রি জাগরণ করতেন এবং নিজ পরিবারকে জাগাতেন।' *(বুঃ ২০২৪, মুঃ ১১৭৪নং)* কারণ, শেষ দশকে রয়েছে বর্কতময় রাত্রি শবেকদর। যে রাত্রি হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। অতএব এ রাতগুলিতে নামায লম্বা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ, ঐ ১১ রাকআত নামাযকে এশার পর থেকে শুরু করে ফজরের প্রায় ১ ঘন্টা আগে পর্যন্ত লম্বা করে পড়াই উত্তম।

কিন্তু যদি মসজিদের জামাআত এত দীর্ঘ রাকআত পড়তে কষ্টবোধ করে, ক্বিরাআত, রুকূ ও সিজদাহ তথা রাকআত ছোট করতে ও সেই হিসাবে তার সংখ্যা বেশী করতে পছন্দ করে এবং বলে, এটাই আমাদের জন্য সহজ, তাহলে তাদের মতে তাই করা ইমামের জন্য দোষাবহ নয়। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ-এর ব্যাপক নির্দেশ হল, "তোমরা সহজ কর এবং কঠিন করো না।" *(বুঃ ৬৯, মুঃ ১৭৩৪নং)* তিনি আরো বলেন, "তোমাদের কেউ লোকেদের ইমামতি করলে, সে যেন নামায হাল্কা করে পড়ে।---" *(আঃ, বুঃ ৭০৩নং, মুঃ ৪৬৭নং, তিঃ)*

সুতরাং বিষয়টি যখন ধরাবাঁধা নিষিদ্ধ কোন বিষয় নয়, তখন আল্লাহ আমাদেরকে যাদের দায়িত্ব প্রদান করেছেন, তাদের জন্য সহজ করাটাই উত্তম ও শ্রেষ্ঠতর। *(দ্রঃ ৪/৭১-৭২, সালাতাঃ ১৬পৃঃ)*

❖ কিয়ামুল লাইল-এর কাযা ঃ

যে ব্যক্তি কোন ওযরবশতঃ রাতের নামায (তারাবীহ, তাহাজ্জুদ বা কিয়াম) পড়তে সুযোগ না পায়, সে যদি দিনে তা কাযা করে নেয়, তাহলে তা তার জন্য বৈধ এবং তাতে সওয়াব ও ফযীলতও আছে। তবে বিত্‌র সহ সে কাযা তাকে জোড় বানিয়ে পড়তে হবে। বলা বাহুল্য, তার অভ্যাস মত ১১ রাকআত কিয়াম ছুটে গেলে, দিনের বেলায় ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে ১২ রাকআত নামায কাযা পড়বে।

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী ﷺ-এর তাহাজ্জুদ ঘুম বা ব্যথা-বেদনা ইত্যাদি কারণে ছুটে গেলে দিনে ১২ রাকআত কাযা পড়তেন। *(মুঃ ৭৪৬নং)* হযরত উমার বিন খাত্তাব رضي الله عنه প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার (পূর্ণ) অযীফা (তাহাজ্জুদের নামায, কুরআন ইত্যাদি) অথবা তার কিছু অংশ রেখে ঘুমিয়ে যায়, কিন্তু তা যদি ফজর ও যোহরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করে নেয় তবে তার জন্য পূর্ণ সওয়াবই লিপিবদ্ধ করা হয়, যেন সে ঐ অযীফা রাত্রেই সম্পন্ন করেছে।" *(মুঃ ৭৪৭নং, সুআ, ইখুঃ)*

2। সদকাহ বা দান করা

রমযান মাসে যে সকল কর্ম করা মুসলিমের জন্য অধিকতর কর্তব্য, তার মধ্যে সদকাহ বা দান করা অন্যতম। সময়ের মর্যাদা গুণে রমযান মাসে দানের পৃথক মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ কারণেই আল্লাহর রসূল ﷺ অন্যান্য মাসে সবার চাইতে বেশী দান করতেন; কিন্তু সবচেয়ে বেশী দান করতেন এই রমযান মাসে। আর এমনিতে তিনি কল্যাণ স্বরূপ প্রেরিত বায়ূ থেকেও অধিক দানশীল ছিলেন। *(দ্রঃ বুঃ ৬, মুঃ ২৩০৭নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে - আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না - সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়।" *(বুখারী ১৪১০নং, মুসলিম ১০১৪নং)*

3। ইফতার করানো

রমযান মাসে আর একটি মহৎ কাজ হল রোযাদার মানুষকে ইফতার করানো। রোযাদার গরীব হোক অথবা ধনী, বন্ধু হোক অথবা আত্মীয় অথবা দূরের কেউ, অথবা না হোক কিছু খাইয়ে তাকে ইফতার করালে তাতে বড় উপকার রয়েছে সকলের জন্য। যেহেতু ইফতারীর এই খুশীর সময় সকলে সমবেত হয়ে একে অন্যকে ফলপ্রসূ নসীহত করতে পারে। আর তার ফলে তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি, সংহতি ও দয়ার্দ্রতা।

তাছাড়া এতে রয়েছে প্রচুর সওয়াব। যায়দ বিন খালেদ জুহানী ؓ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায় সেই ব্যক্তিও ঐ রোযাদারের সমপরিমাণই সওয়াব অর্জন করে। আর এতে ঐ রোযাদারের সওয়াব কিঞ্চিৎ পরিমাণও কম হয়ে যায় না।" *(তিঃ ৮০৬, নাঃ, ইমাঃ ১৭৪৬, ইখুঃ, ইহিঃ, সতাঃ ১০৬৫ নং)*

সলফদের অনেকেই রোযা থাকতে নিজের ইফতারী অপরকে দান করতেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন, আব্দুল্লাহ বিন উমার ؓ, দাঊদ ত্বাঈ, মালেক বিন দীনার, আহমাদ বিন হাম্বল, প্রমুখ। আব্দুল্লাহ বিন উমার কিছু এতীম ও মিসকীন ছাড়া একাকী ইফতার করতেন না। আর যদি কোন দিন তিনি জানতে পারতেন যে, তাঁর পরিবার তাদেরকে তাঁর কাছে আসতে বাধা দিয়েছে বা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তাহলে সে দিন আর ইফতারই করতেন না!

আবুস সাওয়ার আদাবী বলেন, আদী বংশের কিছু লোক ছিলেন, যাঁরা এই মসজিদে নামায পড়তেন; তাঁদের মধ্যে কেউই কোন খাবার দ্বারা একাকী ইফতার করতেন না। যদি সঙ্গে খাওয়ার লোক পেতেন, তাহলে খেতেন। নচেৎ, তাঁদের ইফতারী নিয়ে মসজিদে এসে লোকেদের সাথে খেতেন এবং লোকেরা তাঁদের সাথে ইফতারী করত। *(কানারাঃ ১৫পৃঃ দ্রঃ)*

৪। কুরআন তেলাঅত

রমযান মাস কুরআনের মাস। "রমযান মাস; যে মাসে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট

নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।” *(কুঃ ২/১৮৫)*

জিবরীল عليه السلام রমযানের প্রত্যেক রাত্রে মহানবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে কুরআন পাঠ করাতেন। *(বুঃ ৬, মুঃ ২৩০৮নং)*

হযরত ফাতিমা (রাঃ) বলেন, আব্বা বলেছেন যে, জিবরীল عليه السلام প্রত্যেক বছর একবার করে তাঁর উপর কুরআন পেশ করতেন (পড়ে শুনাতেন)। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের বছরে দুইবার কুরআন পেশ করেন। *(বুঃ ১০৮৮পৃঃ)*

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে এই নির্দেশ পাওয়া যায় যে, রমযান মাসে কুরআন পঠন-পাঠন করা, এ উদ্দেশ্যে জমায়েত হওয়া এবং অপেক্ষাকৃত বড় হাফেয বা কারীর কাছে কুরআন পেশ করা (হিফ্য পুনরাবৃত্তি করা) মুস্তাহাব। আর তাতে এ কথারও দলীল রয়েছে যে, রমযান মাসে বেশী বেশী করে কুরআন তেলাঅত করা উত্তম।

প্রথমোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, জিবরীল عليه السلام মহানবী ﷺ-এর সাথে রাত্রিতে কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। আর তাতে বুঝা যায় যে, রমযানের রাতে অধিকাধিক কুরআন তেলাঅত করা মুস্তাহাব। যেহেতু রাতে কোন রকম ব্যস্ততা থাকে না, রাতে ইবাদত করতে মনের উদ্দীপনা সুসংবদ্ধ থাকে এবং হৃদয়-মন ও রসনা কুরআন উপলব্ধি করতে সমপ্রয়াসী হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ([illegible])

অর্থাৎ, নিশ্চয় রাত্রি জাগরণ মনের একাগ্রতা ও হৃদয়ঙ্গমের জন্য অতিশয় অনুকূল। *(কুঃ ৭৩/৬)*

সলফে সালেহীন রমযান মাসে বেশী বেশী কুরআন পাঠ করতেন। তাঁদের কেউ কেউ প্রত্যেক ৩ রাতে কিয়ামে পূর্ণ কুরআন খতম করতেন। কেউ কেউ খতম করতেন ৭ রাতে; এঁদের মধ্যে কাতাদাহ অন্যতম। কিছু সলফ ১০ রাতে খতম করতেন; এঁদের মধ্যে আবূ রাজা উতারিদী অন্যতম। আসওয়াদ রমযানের প্রত্যেক ২ রাতে কুরআন খতম করতেন। নাখয়ী রমযানের শেষ দশকে ২ রাতে এবং তার পূর্বে ৩ রাতে কুরআন খতম করতেন। রমযান মাস প্রবেশ করলে যুহরী বলতেন, ‘এ মাস তো কুরআন তেলাঅত এবং মিসকীনদেরকে খাদ্য দান করার মাস।’ ইমাম মালেক রমযান এলে হাদীস পড়া এবং আহলে ইল্‌মদের বৈঠকে বসা বাদ দিয়ে মুসহাফ দেখে কুরআন পড়তে যত্নবান হতেন। সুফিয়ান সওরী রমযান মাস প্রবেশ করলে সকল ইবাদত ত্যাগ করে কুরআন তেলাঅত করতে প্রয়াসী হতেন। *(লামাঃ ইবনে রজব ১৭২, ১৭৯, ১৮১-১৮২ পৃঃ, কানামিরাঃ ৪৮-৪৯পৃঃ, কানারাঃ ১৭পৃঃ, হাসাঃ ১১পৃঃ দ্রঃ)*

এ কথা বিদিত যে, ২ রাতে কুরআন খতম করা বিধেয় নয়। কারণ মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি ৩ রাতের কমে কুরআন পড়ে, সে তা বুঝে না।” *(আদাঃ, তিঃ, ইমাঃ, দাঃ, সজাঃ ৭৭৪৩নং)* কিন্তু ইবনে রজব (রঃ) বলেন, ৩ রাতের কম সময়ে কুরআন পড়তে যে নিষেধ এসেছে, তা আসলে নিয়মিতভাবে সারা বছরে করলে নিষিদ্ধ। নচেৎ, মর্যাদা ও মাহাত্ম্যপূর্ণ সময়; যেমন রমযান মাসে এবং বিশেষ করে যে সকল রাত্রে শবেকদর অনুসন্ধান করা হয় সে সকল রাত্রে অথবা মর্যাদা ও মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থান; যেমন মক্কায় বহিরাগত ব্যক্তির জন্য বেশী বেশী করে কুরআন তেলাঅত করা মুস্তাহাব। যাতে মর্যাদা ও মাহাত্ম্যপূর্ণ ঐ সময় ও স্থানের যথার্থ কদর করা হয়। এ কথা বলেছেন আহমাদ, ইসহাক প্রমুখ ইমামগণ। আর এরই উপর আমল

হল অন্যান্যদের; যেমন উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা সে কথা স্পষ্ট হয়। *(কানামিরাঃ ৪৮-৪৯পৃঃ, কানারাঃ ১৭পৃঃ, হাসাঃ ১১পৃঃ দ্রঃ)*

এ কথা অবিদিত নয় যে, যে কুরআন তেলাঅত তেলাঅতকারীর জন্য সম্যক্ উপকারী, তা হল তার আয়াতের অর্থ, আদেশ ও নিষেধ অনুধাবন করে ও বুঝে তেলাঅত। সুতরাং তেলাঅতকারী যদি এমন কোন আয়াত পড়ে, যাতে আল্লাহ তাকে কিছুর আদেশ করেছেন, তাহলে তা পালন করে। অনুরূপ এমন কোন আয়াত পড়ে, যাতে আল্লাহ তাকে কিছু নিষেধ করেছেন, তাহলে তা বর্জন করে ও তা থেকে বিরত হয়। কোন রহমতের আয়াত তেলাঅত করলে আল্লাহর কাছে রহমত ভিক্ষা করে এবং তাঁর নিকট দয়ার আশা করে। আযাবের আয়াত পাঠ করলে আল্লাহর নিকট তা থেকে পানাহ চায় এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। যে তেলাঅতকারী এমন করে, আসলে সেই কুরআন অনুধাবন করে এবং তার উপর আমল করে। আর তারই জন্য কুরআন হবে স্বপক্ষের দলীল। পক্ষান্তরে যে তেলাঅতকারী কুরআন অনুযায়ী আমল করে না, সে তাতে উপকৃতও হয় না। আর কুরআন তার বিরুদ্ধে দলীল হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٩﴾

অর্থাৎ, আমি এই বর্কতময় কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে। *(কুঃ ৩৮/২৯) (ইতহাফঃ ৫১-৫২পৃঃ দ্রঃ)*

মসজিদে কুরআন তেলাঅত করলে এমন উচ্চস্বরে করা উচিত নয়, যাতে নামাযীদের ডিষ্টার্ব হয়। যেহেতু মহানবী ﷺ এ ব্যাপারে নিষেধ করে বলেন, "অবশ্যই নামাযী তাঁর প্রভুর কাছে মুনাজাত করে। অতএব তার লক্ষ্য করা উচিত, সে কি দিয়ে তাঁর কাছে মুনাজাত করছে। আর তোমাদের কেউ যেন অপরের কাছে উচ্চস্বরে কুরআন না পড়ে।" *(আঃ, ত্বাবঃ, সআদাঃ ১২০৩নং, সজাঃ ১৯৫১নং) (যাসাফাকাঃ ১৯পৃঃ)*

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কুরআন পড়া ভাল, নাকি শোনা ভাল। আসলে উত্তম হল তাই করা, যা মনোযোগের জন্য এবং প্রভাবান্বিত হওয়ার দিক থেকে বেশী উত্তম। কারণ, তেলাঅতের উদ্দেশ্য হল, আয়াতের অর্থ অনুধাবন, হৃদয়ঙ্গম ও মহান আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল। *(সালাতাঃ ৪৬পৃঃ)*

সাধারণভাবে কুরআন তেলাঅতের রয়েছে বিশাল মর্যাদা এবং বিরাট সওয়াব। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেন না তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে। ---" *(মুঃ, আঃ, সজাঃ ১১৬৫নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব হতে একটি মাত্র অক্ষর পাঠ করে সে ব্যক্তি একটি নেকী লাভ করে। আর একটি নেকী দশগুণ বর্ধিত করা হয়। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি অক্ষর। বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মীম' একটি অক্ষর।" *(বুঃ তারীখ, তিঃ, হাঃ, সজাঃ ৬৪৬৯ নং)*

❖ কুরআন তেলাঅতের সময় কান্নাঃ

ইমাম নওবী বলেন, কুরআন তেলাঅতের সময় কান্না করা 'আরেফীন' (আল্লাহ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের অধিকারী) মানুষদের গুণ এবং নেক লোকদের প্রতীক। মহান আল্লাহ বলেন,

[illegible]

(([illegible]))

অর্থাৎ, এর পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন তা পাঠ করা হয়, তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারা বলে, আমাদের প্রতিপালকই পবিত্রতম, আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকরী হবে। তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে (সিজদায়) পড়ে এবং তাদের তা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে। *(কুঃ ১৭/১০৮-১০৯)*

তিনি আরো বলেন,

[illegible]

(([illegible]

অর্থাৎ, এরাই আদম-বংশের অন্তর্গত নবীগণ; যাদেরকে আল্লাহ অনুগৃহীত করেছেন এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে কিশ্তীতে আরোহণ করিয়েছিলাম এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈল-বংশের অন্তর্গত এবং যাদেরকে আমি সুপথগামী ও মনোনীত করেছিলাম; যখন তাদের নিকট পরম দয়াময়ের আয়াত পাঠ করা হত, তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় পতিত হত। *(কুঃ ১৯/৫৮)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﵁ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, "আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও।" আমি বললাম, 'আমি আপনাকে কুরআন শুনাব অথচ তা আপনার উপরেই অবতীর্ণ হয়েছে?!' তিনি বললেন, "আমি অপরের নিকট তা শুনতে পছন্দ করি।" ইবনে মাসঊদ বলেন, অতএব আমি সূরা নিসা পড়তে শুরু করলাম। অতঃপর যখন এই আয়াতে পৌঁছলাম,

(([illegible]))

অর্থাৎ, অনন্তর তখন কি দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে আনয়ন করব। *(কুঃ ৪/৪১)*

তখন তিনি বললেন, "যথেষ্ট।" আমি তাঁর প্রতি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর চক্ষু দুটি থেকে অশ্রু ঝরছে। *(বুঃ ৪৭৬৮, মুঃ ৮০০নং)*

আবূ হুরাইরা ﵁ বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

(([illegible]))

অর্থাৎ, তবে কি তোমরা এ কথায় বিস্ময় বোধ করছ? হাসছ এবং কান্না করছ না?! *(কুঃ ৫৩/৫৯-৬০)*

তখন আহলুস সুফ্ফার [6]সকলে 'ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজেউন' বলে কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁদের চোখের পানি গাল বেয়ে বইতে লাগল। তাঁদের কান্নার শব্দ শুনে মহানবী ﷺ-ও কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে আমরাও লাগলাম কাঁদতে। অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" *(তকুঃ ৯/৮০)*

একদা ইবনে উমার رضي الله عنه সূরা মুত্বাফফিফীন পাঠ করলেন। তিনি যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন ঃ (([illegible]))

(অর্থাৎ, যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হবে।) তখন কাঁদতে লাগলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অতঃপর অবশিষ্ট সূরা পড়া হতে বিরত থাকলেন। *(কানারাঃ ১৯পৃঃ দ্রঃ)*

৫। উমরাহ

রমযান মাসে উমরাহ করা বড় ফযীলতপূর্ণ সওয়াবের কাজ। মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই রমযানের উমরাহ একটি হজ্জ অথবা আমার সাথে একটি হজ্জ করার সমতুল্য।" *(বুঃ ১৮৬৩, মুঃ ১২৫৬নং)*

৬। শেষ দশকের আমল ও ইবাদত

মহানবী ﷺ রমযানের শেষ দশকে ইবাদত করতে যে মেহনত ও চেষ্টা করতেন, মাসের অন্যান্য দিনগুলিতে তা করতেন না। *(মুঃ ১১৭৫নং)* মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রমযানের শেষ দশক এসে উপস্থিত হলে আল্লাহর রসূল ﷺ (ইবাদতের জন্য) নিজের কোমর (লুঙ্গি) বেঁধে নিতেন, সারারাত্রি জাগরণ করতেন এবং আপন পরিজনকেও জাগাতেন।" *(বুঃ ২০২৪নং, আঃ ৬/৪১, আদাঃ ১৩৭৬, নাঃ ১৬৩৯, ইমাঃ ১৭৬৮, ইখুঃ ২২১৪নং)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি নিজে সারারাত্রি জাগরণ করতেন এবং আপন পরিজনকেও জাগাতেন। ইবাদতে মেহনত করতেন এবং কোমর (বা লুঙ্গি) বেঁধে নিতেন। *(মুঃ ১১৭৪নং)*

(ক) মহানবী ﷺ রমযানের শেষ দশকে অতিরিক্ত কিছু এমন আমল করতেন, যা মাসের অন্যান্য দিনগুলিতে করতেন না। যেমন, তিনি রাত্রি জাগরণ করতেন। সম্ভবতঃ তিনি সারারাত্রি জাগতেন; অর্থাৎ পুরো রাতটাই নামায ইত্যাদিতে মশগুল থাকতেন।

অথবা তিনি পুরো রাতটাই কিয়াম করতেন। অবশ্য এরই মধ্যে তিনি রাতের খাবার ও সেহরী খেতেন। এ ক্ষেত্রে রাত্রি জাগরণের মানে হবে অধিকাংশ বা প্রায় সম্পূর্ণ রাতটাই জাগতেন। আর মা আয়েশার একটি কথা এই ব্যাখ্যার সমর্থন করে। তিনি বলেন, আমি জানি না যে, তিনি কোন রাত্রি ফজর পর্যন্ত কিয়াম করেছেন। *(মুঃ ৭৪৬, নাঃ ১৬৪১নং)*

---

[6] *তাঁরা ছিলেন কিছু নিঃস্ব (মুহাজেরীন) সাহাবী, যাঁদের থাকার মত কোন ঘর-বাড়ি ছিল না। তাঁরা মসজিদে নববীর সামনের সুফ্ফায় (দোচালায়) খেয়ে-না খেয়ে বাস করতেন এবং মহানবীর কাছে ইল্ম শিক্ষা করতেন।*

(খ) মহানবী ﷺ এই রাতগুলিতে নামায পড়ার জন্য নিজের পরিবারের সকলকে জাগাতেন। আর এ কথা বিদিত যে, তিনি বছরের অন্যান্য মাসেও পরিবারকে নামাযের জন্য জাগাতেন। তাহাজ্জুদ পড়ার শেষে বিত্‌র পড়ার আগে আয়েশা (রাঃ)কে জাগাতেন। *(বুঃ ৯৫২নং)* কোন কোন রাতে আলী ও ফাতেমার নিকট উপস্থিত হয়ে বলতেন, "তোমরা কি উঠে নামায পড়বে না?" *(আঃ ১/১১২, বুঃ ১১২৭, মুঃ ৭৭৫নং)* কিন্তু তিনি তাদেরকে রাত্রের কিছু অংশ নামায পড়ার জন্য জাগাতেন। বলা বাহুল্য, বছরের অন্যান্য রাতের তুলনায় শেষ দশকের রাতগুলিতে জাগানো ছিল ভিন্নতর। *(দ্রঃ দুরূঃ ৮৬পৃঃ)*

(গ) মহানবী ﷺ শেষ দশকের রাতগুলিতে নিজের লুঙ্গি বেঁধে নিতেন। এ কথায় ইঙ্গিতে তাঁর ইবাদতের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি এবং চিরাচরিত অভ্যাসের তুলনায় অতিরিক্ত প্রচেষ্টাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি কোমরে কাপড় বেঁধে ইবাদতে লেগে যেতেন।

অথবা তাতে ইঙ্গিতে স্ত্রী-সংস্পর্শ ও সহবাস ত্যাগ করার কথা বুঝানো হয়েছে। আর এই বুঝটাই সঠিকতর বলে মনে হয়। কারণ, যিনি ইবাদতের জন্য রাত জাগবেন এবং স্ত্রীকে জাগাবেন, তাঁর আবার ঐ দিকে মন যাবে কেন? তাছাড়া মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় আলী ﷺ-এর হাদীসে আরো একটু স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, "তিনি লুঙ্গি তুলে নিতেন।" এই হাদীসের এক বর্ণনাকারী আবূ বাক্‌রকে জিজ্ঞাসা করা হল, "তিনি লুঙ্গি তুলে নিতেন।" এ কথার অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন, অর্থাৎ তিনি স্ত্রীগণ থেকে পৃথক হয়ে যেতেন। *(আঃ ১/১৩২, ১১০৩নং, ইআশাঃ ৯৫৪৪নং)* পক্ষান্তরে মা আয়েশা (রাঃ)এর এক বর্ণনায় অতি স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, "তিনি লুঙ্গি বেঁধে নিতেন এবং স্ত্রীগণ থেকে পৃথক হয়ে যেতেন।" *(আঃ ৬/৬৭, ২৪২৫৮নং)*

মহান আল্লাহ বলেন, (([illegible]))

অর্থাৎ, এক্ষণে (রমযানের রাতে) তোমরা স্ত্রী-গমন কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান কর। *(কুঃ ২/১৮৭)*

সলফদের একটি জামাআত উক্ত আয়াতের তফসীরে বলেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হল শবেকদর অনুসন্ধান করা। সুতরাং তার মানে হল, মহান আল্লাহ যখন রমযানের রাতে ফজরের আগে পর্যন্ত স্ত্রী-গমন হালাল করলেন, তখনই সেই সাথে শবেকদর অনুসন্ধান করতে আদেশ করেছেন। যাতে মুসলিমরা এ মাসের পুরো রাতটাই হালাল স্ত্রী-কেলিতে কাটিয়ে না দেয় এবং তার ফলে শবেকদর থেকে তারা বঞ্চিত না হয়ে যায়। তাই বৈধ যৌনাচারের সাথে সাথে তাহাজ্জুদ পড়ে শবেকদর অনুসন্ধান করতেও আদেশ করলেন রোযাদারকে; বিশেষ করে সেই সকল রাত্রে, যেগুলিতে শবেকদর হওয়ার আশা থাকে। এই জন্যই মহানবী ﷺ রমযানের ২০ তারীখের রাত পর্যন্ত স্ত্রী-সংসর্গে থাকতেন। কিন্তু তারপর ২১শের রাত থেকেই তিনি তাঁদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যেতেন এবং শবেকদর পাওয়ার কামনায় শেষ রাতগুলিতে পুরো রাতটাই একমন হয়ে ইবাদত করতেন।

অতএব আমাদের উচিত হল, সকল প্রকার কল্যাণে তাঁরই অনুসরণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, (([illegible]))

অর্থাৎ, নিশ্চয় রসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। *(কুঃ ৩৩/২১)*

৭। ই’তিকাফ

❖ ই’তিকাফের অর্থঃ

ই’তিকাফের আভিধানিক অর্থ হল, কোন জিনিসকে আঁকড়ে ধরা এবং তাতে নিজেকে আবদ্ধ রাখা (রত থাকা, মগ্ন থাকা, লিপ্ত থাকা); তাতে সে জিনিস ভাল হোক অথবা মন্দ। মহান আল্লাহ বলেন, (([illegible]))

অর্থাৎ, (ইবরাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল,) যে মূর্তিগুলোর পূজায় তোমরা রত আছ, (বা যাদের পূজারী হয়ে বসে আছ) সে গুলো কি? *(কুঃ ২১/৫২)* অর্থাৎ, তোমরা তাদের সম্মুখে দন্ডায়মান হয়ে পূজায় রত আছ।

শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় বিশেষ ব্যক্তির মসজিদের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে সেখানে অবস্থান করা; তথা সকল মানুষ ও সংসারের সকল কাজকর্ম থেকে দূরে থাকা এবং সওয়াবের কাজ; নামায, যিক্র ও কুরআন তেলাঅত ইত্যাদি ইবাদতের জন্য একমন হওয়াকে ই’তিকাফ বলা হয়। *(দ্রঃ ফিসুঃ ১/৪১৯, আসাইঃ ১৯১পৃঃ, তাইরাঃ ২৬পৃঃ)*

❖ ই’তিকাফের মানঃ

রমযান মাসে করণীয় যে সব সওয়াবের কর্ম বিশেষভাবে তাকীদপ্রাপ্ত, তার মধ্যে ই’তিকাফ অন্যতম। ই’তিকাফ সেই সকল সুন্নাহর একটি, যা প্রত্যেক বছরের এই রমযান মাসে - বিশেষ করে এর শেষ দশকে - মহানবী ﷺ বরাবর করে গেছেন। এ সব কথার দলীল নিম্নরূপঃ-

১। মহান আল্লাহ বলেন, (([illegible]))

অর্থাৎ, (আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে অঙ্গীকারবদ্ধ করলাম যে,) তোমরা উভয়ে আমার (কা’বা) গৃহকে তাওয়াফকারী, ই’তিকাফকারী, রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ। *(কুঃ ২/১২৫)*

তিনি অন্যত্র বলেন, (([illegible]))

অর্থাৎ, আর মসজিদে ই’তিকাফরত অবস্থায় তোমরা স্ত্রী-গমন করো না। *(কুঃ ২/১৮৭)*

২। আবূ হুরাইরা رضي الله عنه বলেন, নবী ﷺ প্রত্যেক রমযানে ১০ দিন ই’তিকাফ করতেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের বছরে তিনি ২০ দিন ই’তিকাফ করেন। *(বুঃ ২০৪৪নং)*

৩। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ প্রত্যেক রমযানে ই’তিকাফ করতেন। ফজরের নামায পড়ে তিনি তাঁর ই’তিকাফগাহে প্রবেশ করতেন। *(বুঃ ২০৪১, মুঃ ১১৭৩নং)*

৪। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর ইন্তেকাল অবধি রমযানের শেষ দশকে ই’তিকাফ করে গেছেন। তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই’তিকাফ করেছেন। *(বুঃ ২০২৬, মুঃ ১১৭২নং)*

৫। মহানবী ﷺ ই’তিকাফ করেছেন এবং তাঁর সাহাবাগণও তাঁর সাথে ই’তিকাফ করেছেন। *(বুঃ ২০১৬, মুঃ ১১৬৭নং)*

❖ ই’তিকাফের রহস্য ঃ

প্রত্যেক ইবাদতের পশ্চাতে রহস্য, হিকমত ও যৌক্তিকতা আছে একাধিক। এ কথা বিদিত যে, প্রত্যেক আমল হৃদয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন মহানবী ﷺ বলেন, “শোন! দেহের মধ্যে এমন এক মাংস-পিন্ড আছে যা ভালো হলে সারা দেহ ভালো হবে এবং তা খারাপ হলে সারা দেহ খারাপ হবে। শোন! তা হল হৃৎপিন্ড (অন্তর)।” *(বুঃ ৫২, মুঃ ১৫৯৯নং)*

হৃদয়কে যে জিনিস বেশী নষ্ট করে তা হল নানান হৃদয়গ্রাহী মনকে উদাসকারী জিনিস এবং সেই সকল মগ্নতা ও নিরতি; যা মহান আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার পথে বাধাস্বরূপ। যেমন উদরপরায়ণতা, যৌনাচার, অতিকথা, অতিনিদ্রা, অতিবন্ধুত্ব ইত্যাদি প্রতিবন্ধক কর্ম; যা অন্তরের ভূমিকাকে বিক্ষিপ্ত করে এবং তার একাগ্রতাকে আল্লাহর আনুগত্যে বিনষ্ট করে ফেলে। এই জন্য মহান আল্লাহ তাঁর নৈকট্য প্রদানকারী কিছু ইবাদত বিধিবদ্ধ করলেন; যা বান্দার হৃদয়কে ঐ উদাসকারী প্রতিবন্ধক বিভিন্ন অপকর্ম থেকে হিফাযত করে। যেমন রোযা; যে রোযা দিনের বেলায় মানুষকে পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত রাখে এবং সেই সকল স্বাদ উপভোগ থেকে বিরত থাকার প্রতিচ্ছবি হৃদয়-মুকুরে প্রতিফলিত হয়। আর তাই আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে অগ্রসর হতে শক্তি যোগায় এবং বান্দা সেই কুপ্রবৃত্তির বেড়ি থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়; যা তাকে আখেরাত থেকে দুনিয়ার দিকে ফিরিয়ে দেয়।

বলা বাহুল্য, রোযা যেমন পানাহার ও যৌনাচার-জনিত কুপ্রবৃত্তির নানা প্রতিবন্ধক থেকে বাঁচার জন্য হৃদয়ের পক্ষে ঢালস্বরূপ। ঠিক তেমনি ই’তিকাফও বিরাট রহস্য-বিজড়িত একটি ইবাদত। ই’তিকাফ মানুষের সঙ্গে অতিরিক্ত মিলামিশার ফলে হৃদয়ে যে কুপ্রভাব পড়ে এবং অতিকথা ও অতিনিদ্রার ফলে মহান প্রতিপালকের সাথে সম্পর্কে যে ক্ষতি হয় তার হাত হতে রক্ষা করে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অতিবন্ধুত্ব, অতিকথা এবং অতিনিদ্রার কবল থেকে মুক্তি পাওয়াতেই রয়েছে বান্দার বড় সাফল্য; যে সাফল্য তার হৃদয়কে আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে শক্তি যোগায় এবং এর প্রতিকূল সকল অবস্থা থেকে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করে। *(দুরাঃ ৭৬-৭৭পৃঃ)*

❖ ই’তিকাফের প্রকারভেদ ঃ

ই’তিকাফ দুই প্রকার; ওয়াজেব ও সুন্নত। সুন্নত হল সেই ই’তিকাফ, যা বান্দা আল্লাহর নৈকট্য ও সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে রসূল ﷺ-এর অনুকরণ করে স্বেচ্ছায় করে থাকে। আর এই ই’তিকাফ রমযান মাসের শেষ দশকে করাই হল তাকীদপ্রাপ্ত; যেমন এ কথা পূর্বে বলা হয়েছে।

পক্ষান্তরে ওয়াজেব হল সেই ই’তিকাফ, যা বান্দা খোদ নিজের জন্য ওয়াজেব করে নিয়েছে। চাহে তা সাধারণ নযর মেনে অথবা শর্তভিত্তিক বিলম্বিত নযর মেনে হোক। যেমন কেউ যদি বলে, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ই’তিকাফ করার নযর মানলাম অথবা আল্লাহ আমার রোগীকে আরোগ্য দান করলে আমি তাঁর জন্য ই’তিকাফ করব - তাহলে সে ই’তিকাফ পালন করা ওয়াজেব।

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য (ইবাদত) করার নযর মানে, সে যেন তা

পালন করে।" *(বুঃ ৬৬৯৬নং, সুআঃ)*

একদা উমার ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি জাহেলী যুগে মাসজিদুল হারামে এক রাত্রি ই'তিকাফ করার নযর মেনেছি। মহানবী ﷺ বললেন, "তুমি তোমার নযর পুরা কর।" *(বুঃ ২০৩২নং)*

❖ ই'তিকাফের সময়ঃ

ওয়াজেব ই'তিকাফ ঠিক সেই সময় মত আদায় করা জরুরী, যে সময় নযর-ওয়ালা তার নযরে উল্লেখ করেছে। সে যদি এক দিন বা তার বেশী ই'তিকাফ করার নযর মানে, তাহলে তাকে তাই পালন করা ওয়াজেব হবে, যা তার নযরে উল্লেখ করেছে।

আর মুস্তাহাব ই'তিকাফের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। এমন ই'তিকাফ নিয়ত করে মসজিদে অবস্থান করলেই বাস্তবায়ন হয়; চাহে সে সময় লম্বা হোক অথবা সংক্ষিপ্ত। মসজিদে অবস্থানকাল পর্যন্ত সওয়াব লাভ হবে। মসজিদ থেকে বের হয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করলে নিয়ত নবায়ন করতে হবে। *(ফিসুঃ ১/৪২০)*

মহানবী ﷺ ১০ দিন ই'তিকাফ করেছেন; যেমন শেষ জীবনে তিনি ২০ দিন ই'তিকাফ করেছেন। অনুরূপ তিনি রমযানের প্রথম দশকে, অতঃপর মধ্যম দশকে অতঃপর শেষ দশকে ই'তিকাফ করেছেন। *(বুঃ ২০১৬, মুঃ ১১৬৭নং)*

উমার ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি জাহেলী যুগে মাসজিদুল হারামে এক রাত্রি ই'তিকাফ করার নযর মেনেছি। উত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, "তুমি তোমার নযর পুরা কর।" *(বুঃ ২০৩২নং)*

এ সব কিছু এ কথারই দলীল যে, ই'তিকাফের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই।

যেমন ই'তিকাফ রমযানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ, মহানবী ﷺ উমার ﷺ-কে তাঁর ই'তিকাফের নযর পালন করতে অনুমতি দিলেন। আর তা ছিল রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে। অতএব সুন্নত হল রমযানে এবং বিশেষ করে কেবল তার শেষ দশকে ই'তিকাফ করা। যেহেতু শরীয়তের আহকাম রসূল ﷺ-এর আমল থেকেই গ্রহণ করতে হবে। আর তিনি কাযা করা ছাড়া অরমযানে ই'তিকাফ করেন নি। তদনুরূপ আমরা জানি না যে, সাহাবাদের কেউ কাযা ছাড়া অরমযানে ই'তিকাফ করেছেন।

কিন্তু উমার ﷺ যখন ফতোয়া চাইলেন, তখন তিনি তাঁকে (অরমযানে) ই'তিকাফের নযর পুরা করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তিনি উম্মতের জন্য তা সাধারণ শরয়ী নিয়ম হিসাবে ঘোষণা করে জান নি; যাতে লোকেদেরকে বলা যাবে যে, 'তোমরা মসজিদে রমযান-অরমযানে যে কোন সময় ই'তিকাফ কর; এটাই হল সুন্নত।'

সুতরাং বাহ্যতঃ যা বুঝা যায় তা এই যে, যদি কোন মুসলিম অরমযানে ই'তিকাফে বসে, তাহলে তাতে আপত্তির কিছু নেই। আর এ কথাও বলা যাবে না যে, তা বিদআত। কারণ, মহানবী ﷺ উমার ﷺ-কে তাঁর ই'তিকাফের নযর পুরা করতে অনুমতি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে যদি সে নযর মকরূহ অথবা হারাম হত, তাহলে তা পুরা করার অনুমতি দিতেন না। কিন্তু আমরা প্রত্যেকের কাছে এ চাইতে পারি না যে, সে যে কোন সময় ই'তিকাফ করবে। বরং

আমরা তাকে বলব, শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশ হল, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পথনির্দেশ। যদি তিনি জানতেন যে, অরমযানে বরং রমযানের শেষ দশক ছাড়া অন্য সময়ের ই'তিকাফের কোন বৈশিষ্ট্য বা সওয়াব আছে, তাহলে তিনি আমলে পরিণত করার জন্য উম্মতের কাছে তা প্রচার করে যেতেন। অতএব আমাদের জন্য উত্তম হল রসূল ﷺ-এর অনুসরণ করা। *(দ্রঃ মুমঃ ৬/৫০৬-৫০৮)*

❖ ই'তিকাফের শর্তাবলী ঃ

ই'তিকাফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে ঃ-

১। ই'তিকাফকারীকে মুসলিম হতে হবে।

২। জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে।

৩। ভালো মন্দের বুঝ-শক্তিসম্পন্ন হতে হবে।

৪। তাতে তার নিয়ত হতে হবে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির তা-ই প্রাপ্য হয়, যার সে নিয়ত করে থাকে।"

৫। ই'তিকাফ মসজিদে হতে হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, আর মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তোমরা স্ত্রী-গমন করো না। *(কুঃ ২/১৮৭)* বলা বাহুল্য, তিনি ই'তিকাফের স্থান হিসাবে মসজিদের কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থানে ই'তিকাফ শুদ্ধ হলে আয়াতে তার উল্লেখ আসত না। *(মুমঃ ৬/৫০২, ফিসুঃ ১/৪২১)*

অতঃপর জানার কথা যে, ই'তিকাফ ব্যাপকভাবে যে কোন মসজিদে বসেই করা যায়। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মাহাত্ম্যপূর্ণ ৩টি মসজিদ; অর্থাৎ মাসজিদুল হারাম, মাসজিদে নববী এবং মাসজিদে আকসাতে ই'তিকাফ করা সবচেয়ে উত্তম। যেমন উক্ত ৩টি মসজিদে নামায পড়া অন্যান্য মসজিদের তুলনায় বহুগুণে উত্তম। *(মুমঃ ৬/৫০৫)*

মসজিদের শর্ত হল, তাতে যেন জামাআত কায়েম হয়। অবশ্য জুমআহ কায়েম হওয়া শর্ত নয়। *(ঐ ৬/৫১১)* তবে উত্তম হল জামে' মসজিদেই ই'তিকাফ করা। যেহেতু মহানবী ﷺ জামে' মসজিদে ই'তিকাফ করেছেন। তাছাড়া সকল নামাযের জামাআতে নামাযী সংখ্যা তাতেই বেশী হয় এবং যাতে জুমআহ পড়ার জন্য নিজের ই'তিকাফ-গাহ ছেড়ে কোন জামে' মসজিদে যাওয়ার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে বের হতে না হয়। *(ফিসুঃ ১/৪২১, তাইরাঃ ২৬পৃঃ)* পরন্তু আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নত হল, সে কোন রোগীকে দেখা করতে যাবে না ---। আর জামে' মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে ই'তিকাফ নেই।' *(সআদাঃ ২১৬০নং)*

জ্ঞাতব্য যে, মহিলার জন্য তার বাড়ির মসজিদে (যেখানে সে ৫ অক্ত্ নামায পড়ে সেখানে) ই'তিকাফ শুদ্ধ নয়। কারণ, তা আসলে কোন অর্থেই মসজিদ নয়।

৬। ই'তিকাফকারীকে (বীর্যপাত, মাসিক বা নিফাস-জনিত কারণে ঘটিত) বড় নাপাকী থেকে পবিত্র থাকতে হবে।

৭। কোন প্রকার ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে মহিলা যে কোন মসজিদে ই’তিকাফ করতে পারে। বলা বাহুল্য, কোন প্রকার ফিতনার ভয় থাকলে মসজিদে ই’তিকাফ করতে অনুমতি দেওয়া যাবে না। কারণ, সওয়াবের কাজ করতে গিয়ে গোনাহ ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে সওয়াবের কাজ করতে বাধা দেওয়া ওয়াজেব। *(মুমঃ ৬/৫১১)*

তদুপরি শর্ত হল, স্বামী যেন মহিলাকে সে কাজে অনুমতি দেয়। নচেৎ, তার অনুমতি না নিয়েই স্ত্রী ই’তিকাফে বসলে স্বামী ই’তিকাফ ভাঙ্গার জন্য তাকে বাধ্য করতে পারে। মহানবী ﷺ-এর স্ত্রীগণের তাঁবু টাঙ্গানোর পর তিনি তাঁদেরকে ই’তিকাফ করতে বাধা দিয়েছিলেন। *(বুঃ ২০৩৩, মুঃ ১১৭২নং)*

আর সঠিক অভিমত এই যে, ই’তিকাফের জন্য রোযা থাকা এবং সময় নির্ধারিত করা শর্ত নয়। এ কথার দলীল হল, উপর্যুক্ত হযরত উমার ﵁-এর হাদীস। *(মুমঃ ৬/৫০৯, কানারাঃ ২৫পৃঃ)* যেহেতু তিনি রাতে ই’তিকাফ করার নযর মেনেছিলেন; অথচ রাতে রোযা হয় না।

অবশ্য ই’তিকাফের জন্য রোযা মুস্তাহাব। কেননা, মহান আল্লাহ ই’তিকাফের কথা রোযার সাথে উল্লেখ করেছেন। আর রসূল ﷺ কাযা ছাড়া যে ই’তিকাফ করেছেন, তা রোযা রাখা অবস্থায় করেছেন। পরন্তু আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘ই’তিকাফকারীর জন্য সুন্নত হল, সে কোন রোগীকে দেখা করতে যাবে না ---। আর রোযা ছাড়া ই’তিকাফ নেই।---’ *(সআদাঃ ২১৬০নং)*

পক্ষান্তরে সবচেয়ে উত্তম হল রমযানের শেষ দশকেই ই’তিকাফ করা; যেমন এ কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

❖ ই’তিকাফ-গাহে প্রবেশ করার সময়ঃ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুস্তাহাব ই’তিকাফের জন্য কোন ধরাবাঁধা সময় নেই। সুতরাং ই’তিকাফকারী যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে এবং সেখানে অবস্থান করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত করবে, তখনই সে সেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত ই’তিকাফকারী বলে গণ্য হবে। কিন্তু সে যদি রমযানের শেষ দশকে ই’তিকাফ করতে চায়, তাহলে প্রথম (২১শের) রাত্রি আসার (২০শের সূর্য ডোবার) পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবে। কারণ, মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আমার সাথে ই’তিকাফ করতে চায়, সে যেন শেষ দশকে ই’তিকাফ করে।” *(বুঃ ২০২৭নং)* এখানে শেষ দশক বলতে শেষ দশটি রাতকে বুঝিয়েছেন। আর শেষ দশ রাতের প্রথম রাত হল ২১শের রাত।

পক্ষান্তরে সহীহায়নে প্রমাণিত যে, মহানবী ﷺ ফজরের নামায পড়ে তাঁর ই’তিকাফ-গাহে প্রবেশ করলেন। *(বুঃ ২০৪১, মুঃ ১১৭৩নং)* এর অর্থ এই যে, ঐ সময় তিনি মসজিদের ভিতরে ই’তিকাফের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় প্রবেশ করলেন। যেহেতু তিনি মসজিদের ভিতর বিশেষ এক জায়গায় ই’তিকাফ করতেন। যেমন সহীহ মুসলিমে বর্ণিত যে, তিনি পশম নির্মিত তুর্কী ছোট এক তাঁবুর ভিতরে ই’তিকাফ করেছেন। *(মুঃ ১১৬৭নং)* কিন্তু ই’তিকাফের জন্য তাঁর মসজিদে প্রবেশ করার সময় ছিল রাতের প্রথমাংশ। *(ফিসুঃ ১/৪২২, দুরাঃ ৮০পৃঃ)*

যে ব্যক্তি রমযানের শেষ দশকে ই’তিকাফ করবে, সে মসজিদ থেকে বের হবে মাসের শেষ

Contents

দিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার পর। অবশ্য কিছু সলফ মনে করেন যে, শেষ দশকের ই'তিকাফকারী ঈদের রাতটাও মসজিদে কাটিয়ে পরদিন সকালে ঈদের নামায পড়ে তবে ঘরে ফিরবে। *(ফিসুঃ ১/৪২৩, আসাইঃ ২০১পৃঃ)*

আর যে ব্যক্তি একদিন অথবা নির্দিষ্ট কয়েক দিন ই'তিকাফ করার নযর মেনেছে, অথবা অনুরূপ নফল ই'তিকাফ করতে চায়, সে ব্যক্তি ফজর উদয় হওয়ার আগে আগে ই'তিকাফ-গাহে প্রবেশ করবে এবং সূর্য পরিপূর্ণরূপে অস্ত যাওয়ার পরে সেখান হতে বের হবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এক রাত অথবা নির্দিষ্ট কয়েক রাত ই'তিকাফ করার নযর মেনেছে, অথবা অনুরূপ নফল ই'তিকাফ করতে চায়, সে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আগে ই'তিকাফ-গাহে প্রবেশ করবে এবং স্পষ্টরূপে ফজর উদয় হওয়ার পরে সেখান হতে বের হবে। *(ঐ)*

❖ ই'তিকাফকারীর জন্য যা করা মুস্তাহাব ঃ

১। ই'তিকাফকারীর জন্য বেশী বেশী নফল ইবাদত করা, নিজেকে নামায, কুরআন তেলাঅত, যিক্র, ইস্তিগফার, দরূদ ও সালাম, দুআ ইত্যাদি ইবাদতে মশগুল রাখা মুস্তাহাব; যে ইবাদত দ্বারা বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে এবং মুসলিম তার মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক কায়েম করতে পারে।

প্রকাশ যে, শরয়ী ইল্ম আলোচনা করা, (দ্বীনী বই-পুস্তক পাঠ করা,) তফসীর, হাদীস, আম্বিয়া ও সালেহীনদের জীবনী গ্রন্থ পাঠ করা এবং দ্বীনে ইসলাম ও ফিক্হ সম্বন্ধীয় যে কোন বই-পুস্তক পাঠ করাও উক্ত ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত। *(ফিসুঃ ৪/৪২৩)*

তদনুরূপ মসজিদে অনুষ্ঠিত ইলমী মজলিসেও সে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে উত্তম হল, বিশেষ ইবাদত দ্বারা ই'তিকাফ করা; যেমন নামায, যিক্র, কুরআন তেলাঅত প্রভৃতি। অবশ্য দিনে বা রাতে ২/১ টি দর্সে উপস্থিত হওয়া দূষণীয় নয়। কিন্তু ইলমী মজলিস যদি একটানা হতেই থাকে এবং ই'তিকাফকারীও সেই দর্সসমূহের পূর্বালোচনা ও পুনরালোচনা করতে থাকে, আর অনেক বৈঠক বা জালসায় উপস্থিত হয়ে বিশেষ ইবাদত করতে সুযোগ না পায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা ত্রুটির কথা। পক্ষান্তরে সাময়িক ও স্বল্প দর্সে ২/১ বার হাযির হলে কোন ক্ষতি হয় না। *(মুমঃ ৬/৫০৩, ৫২৯)*

২। ই'তিকাফকারী অপ্রয়োজনীয় ও বাজে কথা বলা থেকে দূরে থাকবে এবং তর্কাতর্কি, হুজ্জত-ঝগড়া ও গালাগালি করা থেকে বিরত থাকবে।

৩। মসজিদের ভিতরে একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে সেখানে অবস্থান করবে। নাফে' বলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন উমার মসজিদের সেই জায়গাটিকে দেখিয়েছেন, যে জায়গায় আল্লাহর রসূল ﷺ ই'তিকাফ করতেন।' *(মুঃ ১১৭১নং)*

❖ ই'তিকাফকারীর জন্য যা করা বৈধ ঃ

১। অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ই'তিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হতে পারে। যেমন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পানাহার করতে, পরনের কাপড় বা শীতের ঢাকা আনতে এবং পেশাব-

পায়খানা করতে বের হওয়া বৈধ। তদনুরূপ শরয়ী প্রয়োজনে; যেমন নাপাকীর গোসল করতে অথবা ওযূ করতে মসজিদের বাইরে যাওয়া অবৈধ নয়। *(মুমঃ ৬/৫২৩)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, '(ই'তিকাফের সময়) নবী ﷺ ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়া ঘরে আসতেন না।'

তিনি আরো বলেন, 'ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নত হল, সে কোন রোগীকে দেখা করতে যাবে না, কোন জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রী-স্পর্শ, কোলাকুলি, বা সঙ্গম করবে না, আর অতি প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হবে না।' *(সআদাঃ ২১৬০নং)*

২। মসজিদের ভিতরে ই'তিকাফকারী পানাহার করতে ও ঘুমাতে পারে। তবে মসজিদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার খেয়াল অবশ্যই রাখতে হবে।

৩। নিজের অথবা অন্যের প্রয়োজনে বৈধ কথা বলতে পারে।

৪। মাথা আঁচড়ানো, লম্বা নখ কাটা, দৈহিক পরিচ্ছন্নতার খেয়াল রাখা, সুন্দর পোশাক পরা, আতর ব্যবহার করা ইত্যাদি কর্ম ই'তিকাফকারীর জন্য বৈধ।

মহানবী ﷺ ই'তিকাফ অবস্থায় নিজের মাথাকে মসজিদ থেকে বের করে হুজরায় আয়েশার সামনে ঝুঁকিয়ে দিতেন এবং তিনি মাসিক অবস্থাতেও তাঁর মাথা ধুয়ে দিতেন এবং আঁচড়ে দিতেন। *(বুঃ ২০২৮, ২০৩০, মুঃ ২৯৭নং)*

৫। ই'তিকাফ অবস্থায় যদি পরিবারের কেউ ই'তিকাফকারীর সাথে মসজিদে দেখা করতে আসে, তাহলে তাকে আগিয়ে বিদায় দেওয়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ। হযরত সাফিয়্যাহ মহানবী ﷺ-কে দেখা করতে এলে তিনি এরূপ করেছিলেন। *(বুঃ ২০৩৫, মুঃ ২১৭৫নং)*

❖ ই'তিকাফকারীর জন্য যা করা মকরূহ ঃ

ই'তিকাফকারীর জন্য কোন কিছু ক্রয়-বিক্রয় করা, অপ্রয়োজনে কথা বলা, ইবাদত মনে করে প্রয়োজনেও বিলকুল কথা না বলা ইত্যাদি মকরূহ। *(ফিসুঃ ১/৪২৪, কানারাঃ ২৬-২৭পৃঃ)*

❖ ই'তিকাফ যাতে বাতিল হয়ে যায় ঃ

১। অতি প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে সামান্য ক্ষণের জন্যও ইচ্ছাকৃত বের হলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু মসজিদে অবস্থান করা ই'তিকাফের জন্য অন্যতম শর্ত অথবা রুক্ন।

২। স্ত্রী-সহবাস করে ফেললে ই'তিকাফ বাতিল। কারণ মহান আল্লাহ বলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, আর মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তোমরা স্ত্রী-গমন করো না। এ হল আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। অতএব তার নিকটবর্তী হয়ো না। *(কুঃ ২/১৮৭)*

৩। নেশা বা মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফলে জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যায়। কারণ তাতে মানুষের ভালো-মন্দের তমীয থাকে না।

৪। মহিলাদের মাসিক বা নিফাস শুরু হলে ই'তিকাফ বাতিল। কারণ, পবিত্রতা একটি

শর্ত।

৫। কোন কথা বা কর্মের মাধ্যমে শির্ক, কুফ্‌র করলে বা মুর্তাদ্দ্ হয়ে গেলে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, তুমি শির্ক করলে তোমার আমল পন্ড হয়ে যাবে। *(কুঃ ৩৯/৬৫) (ফিসুঃ ১/৪২৬, কানারাঃ ২৭পৃঃ, আসাইঃ ২০৫পৃঃ)*

❖ ই'তিকাফ ভঙ্গ এবং তার কাযা করাঃ

ই'তিকাফকারী যতটা সময় ই'তিকাফ করার নিয়ত করেছিল ততটা সময় পূর্ণ হওয়ার আগে সে তা ভঙ্গ করতে পারে। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের ই'তিকাফের তাঁবু তৈরী দেখে তা ভেঙ্গে ফেলতে আদেশ করলেন এবং নিয়ত করার পরে তাঁদের সাথে নিজেও ই'তিকাফ ত্যাগ করলেন। অতঃপর তিনি সেই ই'তিকাফ শওয়াল মাসের প্রথম দশকে কাযা করেন। *(বুঃ ২০৩৩, মুঃ ১১৭৩নং)*

উক্ত হাদীস অনুসারে যে বক্তি নফল ই'তিকাফ শুরু করার পর ভঙ্গ করে তার জন্য তা কাযা করা মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নযরের ই'তিকাফ শুরু করার পর কোন অসুবিধার ফলে ভঙ্গ করে, সুযোগ ও সামর্থ্য হলে তার জন্য তা কাযা করা ওয়াজেব। কিন্তু তা কাযা করার পূর্বেই সে যদি মারা যায়, তাহলে তার তরফ থেকে তার নিকটবর্তী ওয়ারেস কাযা করবে।

❖ নির্দিষ্ট মসজিদে ই'তিকাফের নযরঃ

যে ব্যক্তি মাসজিদুল হারামে ই'তিকাফ করার নিয়ত করেছে, তার জন্য অন্য মসজিদে ই'তিকাফ করা জায়েয নয়। যে ব্যক্তি মসজিদে নববীতে ই'তিকাফ করার নযর মানে, তার জন্যও সেখানেই ই'তিকাফ করা ওয়াজেব। অবশ্য সে মাসজিদুল হারামে ই'তিকাফ করতে পারে। কারণ, এ মসজিদ মসজিদে নববী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অনুরূপ যদি কেউ মাসজিদুল আকসাতে ই'তিকাফ করার নযর মানে, তার জন্য উক্ত তিনটি মসজিদের যে কোন একটিতে ই'তিকাফ পালন করা ওয়াজেব।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উক্ত তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য মসজিদে ই'তিকাফ করার নযর মানে, তার জন্য ঐ মসজিদে তা পালন করা জরুরী নয়। বরং ইচ্ছামত সে যে কোন মসজিদে ই'তিকাফ করতে পারে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদতের জন্য কোন নির্দিষ্ট জায়গা নির্বাচন করেন নি। আর যেহেতু উক্ত তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্যান্য মসজিদগুলোর পারস্পরিক কোন পৃথক মর্যাদা নেই। *(ফিসুঃ ১/৪২৮, কানারাঃ ২৮পৃঃ)*

পরিশেষে ব্রাদারানে ইসলাম! এই মৃতপ্রায় সুন্নতকে জীবিত করার জন্য, এর কথা নিজ পরিবার-পরিজন ও ভাই-বন্ধুদের কাছে প্রচার করার জন্য যত্নবান হন। প্রচার ও পালন করুন নিজ সমাজ ও জামাআতের মসজিদে। অবশ্যই আল্লাহ আপনাদেরকে ই'তিকাফের সওয়াবের সাথে সাথে তাদের ই'তিকাফের সওয়াবও দান করবেন, যারা আপনার অনুসরণ

করে তা পালন করবে।

৮। শবেকদর অন্বেষণ

রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় সংখ্যার রাত্রিগুলোতে শবেকদর অনুসন্ধান করা মুস্তাহাব। মহানবী ﷺ এর অনুসন্ধানে উক্ত রাত্রিগুলিতে বড় মেহনত করতেন। আর এ কথা পূর্বে বলা হয়েছে যে, রমযানের শেষ দশক এসে উপস্থিত হলে আল্লাহর রসূল ﷺ (ইবাদতের জন্য) নিজের কোমর (লুঙ্গি) বেঁধে নিতেন, সারারাত্রি জাগরণ করতেন এবং আপন পরিজনকেও জাগাতেন। তাছাড়া শবেকদরের সন্ধানে ও আশায় তিনি ঐ শেষ দশকের দিবারাত্রে ই'তিকাফ করতেন।

আসুন! আমরা দেখি শবেকদর কি? তার কদর কতটুকু? এবং তার আহকাম কি?

❖ শবেকদরের নাম শবেকদর কেন?

আরবীতে 'লাইলাতুল ক্বাদ্র'-এর ফারসী, উর্দু, হিন্দী ও বাংলাতে অর্থ হল শবেকদর। আরবীতে 'লাইলাহ' এবং ফারসীতে 'শব' শব্দের মানে হল রাত। কিন্তু 'ক্বাদর' শব্দের মানে বিভিন্ন হতে পারে। আর সে জন্যই এর নামকরণের কারণও বিভিন্ন। যেমন ঃ-

১। ক্বাদ্র মানে তকদীর। সুতরাং লাইলাতুল ক্বাদ্র বা শবেকদরের মানে তকদীরের রাত বা ভাগ্য-রজনী। যেহেতু এই রাতে মহান আল্লাহ আগামী এক বছরের জন্য সৃষ্টির রুযী, মৃত্যু ও ঘটনাঘটনের কথা লিপিবদ্ধ করে থাকেন। যেমন তিনি এ কথা কুরআনে বলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, এই রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। *(কুঃ ৪৪/৪)*

আর এই তকদীর; যা বাৎসরিক বিস্তারিত আকারে লিখা হয়। এ ছাড়া মাতৃগর্ভে ভ্রূণ থাকা অবস্থায় লিখা হয় সারা জীবনের তকদীর। আর আদি তকদীর; যা মহান আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টি করার ৫০ হাজার বছর পূর্বে 'লাওহে মাহফূয'-এ লিখে রেখেছেন।

২। ক্বাদরের আর একটি অর্থ হল, কদর, শান, মর্যাদা, মাহাত্ম্য ইত্যাদি। যেমন বলা হয়ে থাকে, সমাজে অমুকের বড় কদর আছে। অর্থাৎ, তার মর্যাদা ও সম্মান আছে। অতএব এ অর্থে শবেকদরের মানে হবে মহিয়সী রজনী।

৩। উক্ত কদর যে রাত জেগে ইবাদত করে তারই। এর পূর্বে যে কদর তার ছিল না, রাত জেগে শবেকদর পাওয়ার পর আল্লাহর কাছে সে কদর লাভ হয় এবং তাঁর কাছে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। আর তার জন্যই একে শবেকদর বলে।

৪। ঐ কদরের রাতে আমলেরও বড় কদর ও মাহাত্ম্য রয়েছে। সে জন্যও তাকে শবেকদর বলা হয়।

৫। ক্বাদরের আর এক মানে হল সংকীর্ণতা। এ রাতে আসমান থেকে যমীনে এত বেশী সংখ্যক ফিরিশ্তা অবতরণ করেন যে, পৃথিবীতে তাঁদের জায়গা হয় না। বরং তাঁদের সমাবেশের জন্য পৃথিবী সংকীর্ণ হয়। তাই এ রাতকে শবেকদর বা সংকীর্ণতার রাত বলা

হয়।

❖ শবেকদরের মাহাত্ম্য ঃ

১। শবেকদরের রয়েছে বিশাল মর্যাদা ও মাহাত্ম্য। মহান আল্লাহ এই রাতে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং সে রাতের মাহাত্ম্য ও ফযীলত বর্ণনা করার জন্য কুরআন মাজীদের পূর্ণ একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন এবং সেই সূরার নামকরণও হয়েছে তারই নামে। মহান আল্লাহ বলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি ঐ কুরআনকে শবেকদরে অবতীর্ণ করেছি। তুমি কি জান, শবেকদর কি? শবেকদর হল হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। *(কুঃ ৯৭/ ১-৩)*

এক হাজার মাস সমান ৩০ হাজার রাত্রি। অর্থাৎ এই রাতের মর্যাদা ৩০,০০০ গুণ অপেক্ষাও বেশী! সুতরাং বলা যায় যে, এই রাতের ১টি তসবীহ অন্যান্য রাতের ৩০,০০০ তসবীহ অপেক্ষা উত্তম। অনুরূপ এই রাতের ১ রাকআত নামায অন্যান্য রাতের ৩০,০০০ রাকআত অপেক্ষা উত্তম।

বলা বাহুল্য, এই রাতের আমল শবেকদর বিহীন অন্যান্য ৩০ হাজার রাতের আমল অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যে ব্যক্তি এই রাতে ইবাদত করল, আসলে সে যেন ৮৩ বছর ৪ মাস অপেক্ষাও বেশী সময় ধরে ইবাদত করল।

২। শবেকদরের রাত হল মুবারক রাত, অতি বর্কতময়, কল্যাণময় ও মঙ্গলময় রাত। মহান আল্লাহ বলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, আমি এ কুরআনকে বর্কতময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি। *(কুঃ ৪৪/৩)*

উক্ত বর্কতময় রাত্রি হল 'লাইলাতুল ক্বাদ্র' বা শবেকদর। আর শবেকদর নিঃসন্দেহে রমযানে। বলা বাহুল্য, ঐ রাত্রি শবেবরাতের রাত্রি নয়; যেমন অনেকে মনে করে থাকে এবং ঐ রাত্রে বৃথা মনগড়া ইবাদত করে থাকে। কারণ, কুরআন (লাওহে মাহফূয থেকে) অবতীর্ণ হয়েছে (অথবা তার অবতারণ শুরু হয়েছে) রমযান মাসে। কুরআন বলে,

(([illegible]))

অর্থাৎ, রমযান মাস; যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। *(কুঃ ২/ ১৮৫)*

আর তিনি বলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি ঐ কুরআনকে শবেকদরে অবতীর্ণ করেছি। *(কুঃ ৯৭/ ১-৩)*

আর এ কথা বিদিত যে, শবেকদর হল রমযানে; শা'বানে নয়।

৩। এই রাত সেই ভাগ্য-রাত; যাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। *(কুঃ ৪৪/৪)*

৪। এটা হল সেই রাত; যে রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফিরিশ্তাকুল তাঁদের প্রতিপালকের আদেশে অবতীর্ণ হন। অর্থাৎ, যে কাজের ফায়সালা ঐ রাতে করা হয় তা কার্যকরী করার

জন্য তাঁরা অবতরণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

(([illegible]))

৫। এ রাত হল সালাম ও শান্তির রাত। মহান আল্লাহ বলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, সে রজনী ফজর উদয় পর্যন্ত শান্তিময়।

পূর্ণ রাতটাই শান্তিতে পরিপূর্ণ; তার মধ্যে কোন প্রকার অশান্তি নেই। রাত্রি জাগরণকারী মুমিন নারী-পুরুষের জন্য এ হল শান্তির রাত্রি। শয়তান তাদের মাঝে কোন প্রকার অশান্তি আনয়ন করতে পারে না। অথবা সে রাত্রি হল নিরাপদ। শয়তান সে রাত্রে কোন প্রকার অশান্তি ঘটাতে পারে না। অথবা সে রাত হল সালামের রাত। এ রাতে অবতীর্ণ ফিরিশ্তাকুল ইবাদতকারী মুমিনদেরকে সালাম জানায়। *(তাফাকাঃ ৫/৬৮০-৬৮১, শাসাযিলাকাঃ ২৪-২৫পৃঃ)*

৬। এ রাত্রি হল কিয়াম ও গোনাহ-খাতা মাফ করাবার রাত্রি। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমান রেখে ও নেকী লাভের আশা করে শবেকদরের রাত্রি কিয়াম করে (নামায পড়ে), সে ব্যক্তির পূর্বেকার গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়।" *(বুঃ ৩৫, মুঃ ৭৬০ নং, সুআঃ)*

বলা বাহুল্য, এ রাত্রি হল ইবাদতের রাত্রি। এ রাত্রি ধুমধাম করে পান-ভোজনের, আমোদ-খুশীর রাত্রি নয়। আসলে যে ব্যক্তি এ রাত্রের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়, সেই সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

❖ শবেকদর কোন্ রাতটি?

রমযান মাসের শেষ দশকের যে কোন একটি রাত্রি শবেকদরের রাত্রি। একদা মহানবী ﷺ শবেকদরের অন্বেষণে রমযানের প্রথম দশকে ই'তিকাফ করলেন। অতঃপর মাঝের দশকে ই'তিকাফ করে ২০শের ফজরে বললেন, "আমাকে শবেকদর দেখানো হয়েছিল; কিন্তু পরে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা শেষ দশকের বিজোড় রাত্রে তা অনুসন্ধান কর। আর আমি দেখেছি যে, আমি পানি ও কাদাতে সিজদা করছি।" *(বুঃ ২০১৬, মুঃ ১১৬৭নং)* অতঃপর ২১শের রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছিল। অতএব সে বছরে ঐ ২১শের রাতেই শবেকদর হয়েছিল।

পূর্বোক্ত হাদীসের ইঙ্গিত অনুসারে শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিগুলোতে শবেকদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ এই ৫ রাত হল শবেকদর হওয়ার অধিক আশাব্যঞ্জক রাত। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, বিজোড় রাত্রি ছাড়া জোড় রাত্রিতে শবেকদর হবে না। বরং শবেকদর জোড়-বিজোড় যে কোন রাত্রিতেই হতে পারে। তবে বিজোড় রাতে শবেকদর সংঘটিত হওয়াটাই অধিক সম্ভাবনাময় ও আশাব্যঞ্জক। *(মুমঃ ৬/৪৯৬)*

শেষ দশকের মধ্যে শেষ সাত রাত্রিগুলো অধিক আশাব্যঞ্জক। মহানবী ﷺ বলেন, "আমি দেখছি যে, তোমাদের সবারই স্বপ্ন শেষ সাত রাতের ব্যাপারে একমত হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি শবেকদর অনুসন্ধান করতে চায়, সে যেন শেষ সাত রাতগুলিতে করে।" *(আঃ ২/৬, বুঃ ২০১৫, মাঃ, মুঃ ১১৬৫নং)*

অবশ্য এর অর্থ যদি 'কেবল ঐ বছরের রমযানের শেষ সাত রাতের কোন এক রাতে শবেকদর হবে' হয় এবং তার অর্থ 'আগামী প্রত্যেক রমযানে হবে' না হয় তাহলে। কারণ, এরূপ অর্থ হওয়ার সম্ভাবনাও নাকচ করা যায় না। তাছাড়া যেহেতু মহানবী ﷺ তাঁর শেষ জীবন অবধি রমযানের শেষ দশকের পুরোটাই ই'তিকাফ করে গেছেন এবং এক বছর শবেকদর ২১শের রাত্রিতেও হয়েছে - যেমন এ কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। *(মুমঃ ৬/৪৯৩)*

শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিগুলির মধ্যে ২৭শের রাত্রি শবেকদরের জন্য অধিক আশাব্যঞ্জক। কেননা, উবাই বিন কা'ব ﵁ 'ইন শাআল্লাহ' না বলেই কসম খেয়ে বলতেন, 'শবেকদর রাত্রি হল ২৭শের রাত্রি; ঐ রাত্রিতে কিয়াম করতে আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন।' *(মুঃ ৭৬২নং)*

অনুরূপভাবে মুআবিয়া ﵁ মহানবী ﷺ-এর নিকট থেকে বর্ণনা করে বলেন, '২৭শের রাত্রি হল শবেকদরের রাত্রি।' *(সআদাঃ ১২৩৬নং)*

কিন্তু ঐ রাতে হওয়াই জরুরী নয়। কারণ, এ ছাড়া অন্যান্য হাদীস রয়েছে, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, শবেকদর অন্য তারীখের রাতেও হয়ে থাকে।

বলা বাহুল্য, শবেকদরের রাত প্রত্যেক বছরের জন্য একটি মাত্রই রাত নয়। বরং তা বিভিন্ন রাত্রে সংঘটিত হতে পারে। সুতরাং কোন বছরে ২৯শে, কোন বছরে ২৫শে, আবার কোন বছরে ২৪শের রাতেও শবেকদর হতে পারে। আর এই অর্থে শবেকদর প্রসঙ্গে বর্ণিত সমস্ত হাদীসের মাঝে পরস্পর-বিরোধিতা দূর হয়ে যাবে।

শবেকদর একটি নির্দিষ্ট রাত না হয়ে এক এক বছরে শেষ দশকের এক এক রাতে হওয়ার পশ্চাতে হিকমত এই যে, যাতে অলস বান্দা কেবল একটি রাত জাগরণ ও কিয়াম করেই ক্ষান্ত না হয়ে যায় এবং সেই রাতের মর্যাদা ও ফযীলতের উপর নির্ভর করে অন্যান্য রাতে ইবাদত ত্যাগ না করে বসে। পক্ষান্তরে অনির্দিষ্ট হলে এবং প্রত্যেক রাতের মধ্যে যে কোন একটি রাতের শবেকদর হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বান্দা শেষ দশকের পুরোটাই কিয়াম ও ইবাদত করতে আগ্রহী হবে। আর এতে রয়েছে তারই লাভ। *(মুমঃ ৬/৪৯৪)*

ঠিক হুবহু একই যুক্তি হল মহানবী ﷺ-এর হৃদয় থেকে শবেকদর (তারীখ) ভুলিয়ে দেওয়ার পিছনে। *(শাসাযিলাকাঃ ৪৯পৃঃ)* আর এতে রয়েছে সেই মঙ্গল; যার প্রতি ইঙ্গিত করে মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমি শবেকদর সম্বন্ধে তোমাদেরকে খবর দেওয়ার জন্য বের হয়ে এলাম। কিন্তু অমুক ও অমুকের কলহ করার ফলে শবেকদরের সে খবর তুলে নেওয়া হল। এতে সম্ভবতঃ তোমাদের জন্য মঙ্গল আছে। সুতরাং তোমরা নবম, সপ্তম এবং পঞ্চম রাত্রে তা অনুসন্ধান কর।" *(বুঃ ২০২৩নং)*

শবেকদরের সওয়াব অর্জনের জন্য শবেকদর কোন্ রাতে হচ্ছে তা জানা বা দেখা শর্ত নয়। তবে ইবাদতের রাতে শবেকদর সংঘটিত হওয়া এবং তার অনুসন্ধানে সওয়াবের আশা রাখা শর্ত। শবেকদর কোন্ রাতে ঘটছে তা জানা যেতে পারে। আল্লাহ যাকে তওফীক দেন, সে বিভিন্ন লক্ষণ দেখে শবেকদর বুঝতে পারে। সাহাবাগণ ﵃ একাধিক নিদর্শন দেখে জানতে পারতেন শবেকদর ঘটার কথা। তবে তা জানা বা দেখা না গেলে যে তার সওয়াব পাওয়া যাবে না -তা নয়। বরং যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশা রেখে সে রাত্রিতে ইবাদত

করবে, সেই তার সওয়াবের অধিকারী হবে; চাহে সে শবেকদর দেখতে পাক বা না-ই পাক।

বলা বাহুল্য, মুসলিমের উচিত, সওয়াব ও নেকী অর্জনের উদ্দেশ্যে মহানবী ﷺ-এর আদেশ ও নির্দেশমত রমযানের শেষ দশকে শবেকদর অন্বেষণ করতে যত্নবান ও আগ্রহী হওয়া। অতঃপর দশটি রাতে ঈমান ও নেকীর আশা রাখার সাথে ইবাদত করতে করতে যে কোন রাতে যখন শবেকদর লাভ করবে, তখন সে সেই রাতের অগাধ সওয়াবের অধিকারী হয়ে যাবে; যদিও সে বুঝতে না পারে যে, ঐ দশ রাতের মধ্যে কোন্ রাতটি শবেকদররূপে অতিবাহিত হয়ে গেল। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমান রেখে ও নেকী লাভের আশা করে শবেকদরের রাত্রি কিয়াম করে (নামায পড়ে), সে ব্যক্তির পূর্বেকার গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়।" *(বুঃ ৩৫, মুঃ ৭৬০ নং, সুআঃ)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে তার খোঁজে কিয়াম করল এবং সে তা পেতে তওফীক লাভ করল তার পূর্বেকার গোনাহসমূহ মাফ হয়ে গেল।" *(আঃ ৫/৩১৮, ২২৬১২নং)* আর একটি বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি শবেকদরে কিয়াম করবে এবং সে তা ঈমান ও নেকীর আশা রাখার সাথে পেয়ে যাবে, তার গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে।" *(মুঃ ৭৬০নং)*

আর এ সব সেই ব্যক্তির ধারণাকে খন্ডন করে, যে মনে করে যে, যে ব্যক্তি শবেকদর মনে করে কোন রাতে কিয়াম করবে, তার শবেকদরের সওয়াব লাভ হবে; যদিও সে রাতে শবেকদর না হয়। *(মবঃ ২০/১৮৬-১৮৭)*

❖ শবেকদরের লক্ষণসমূহ ঃ

শবেকদরের কিছু লক্ষণ আছে যা রাত মধ্যেই দেখা যায় এবং আর কিছু লক্ষণ আছে যা রাতের পরে সকালে দেখা যায়। যে সব লক্ষণ রাতে পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ ঃ-

১। শবেকদরের রাতের আকাশ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল থাকে। অবশ্য এ লক্ষণ শহর বা গ্রামের ভিতর বিদ্যুতের আলোর মাঝে থেকে লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু যারা আলো থেকে দূরে মাঠে-ময়দানে থাকে, তারা সে ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করতে পারে।

২। অন্যান্য রাতের তুলনায় শবেকদরের রাতে মুমিন তার হৃদয়ে এক ধরনের প্রশস্ততা, স্বস্তি ও শান্তি বোধ করে।

৩। অন্যান্য রাতের তুলনায় মুমিন শবেকদরের রাতে কিয়াম বা নামাযে অধিক মিষ্টতা অনুভব করে।

৪। এই রাতে বাতাস নিস্তব্ধ থাকে। অর্থাৎ, সে রাতে ঝোড়ো বা জোরে হাওয়া চলে না। আবহাওয়া অনুকূল থাকে। মহানবী ﷺ বলেন, "শবেকদরের রাত উজ্জ্বল।" *(আঃ, ত্বাবঃ, ইখুঃ ২১৯২, প্রমুখ, সজাঃ ৫৪৭২, ৫৪৭৫নং)* অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "নাতিশীতোষ্ণ; না ঠান্ডা, না গরম।" *(ঐ)*

৫। শবেকদরের রাতে উল্কা ছুটে না। *(ঐ)*

৬। এ রাতে বৃষ্টি হতে পারে। মহানবী ﷺ বলেন, "আমাকে শবেকদর দেখানো হয়েছিল; কিন্তু পরে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা শেষ দশকের বিজোড় রাত্রে তা অনুসন্ধান কর। আর আমি দেখেছি যে, আমি পানি ও কাদাতে সিজদা

Contents

করছি।” *(বুঃ ২০১৬, মুঃ ১১৬৭নং)* অতঃপর ২ ১শের রাত্রিতে সত্যই বৃষ্টি হয়েছিল।

৭। শবেকদর কোন নেক বান্দা স্বপ্নের মাধ্যমেও দেখতে পারেন। যেমন কিছু সাহাবা তা দেখেছিলেন।

পক্ষান্তরে যে সব লক্ষণ রাতের পরে সকালে দেখা যায় তা হল এই যে, সে রাতের সকালে উদয়কালে সূর্য হবে সাদা; তার কোন কিরণ থাকবে না। *(মুঃ ৭৬২নং)* অথবা ক্ষীণ রক্তিম অবস্থায় উদিত হবে; *(সজাঃ ৫৪৭৫নং)* ঠিক পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত। অর্থাৎ, তার রশ্মি চারিদিকে বিকীর্ণ হবে না।

আর লোক মুখে যে সব লক্ষণের কথা প্রচলিত; যেমন ঃ সে রাতে কুকুর ভেকায় না বা কম ভেকায়, গাছ-পালা মাটিতে নুয়ে পড়ে আল্লাহকে সিজদা করে, সমুদ্রের লবণাক্ত পানি মিঠা হয়ে যায়, নূরের ঝলকে অন্ধকার জায়গা আলোকিত হয়ে যায়, নেক লোকেরা ফিরিশ্তার সালাম শুনতে পান ইত্যাদি লক্ষণসমূহ কাল্পনিক। এগুলি শরয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাছাড়া এ সব কথা নিশ্চিতরূপে অভিজ্ঞতা ও বাস্তববিরোধী। *(দুরাঃ ৯২পৃঃ, মুমঃ ৬/৪৯৮-৪৯৯)*

❖ শবেকদরের দুআ ঃ

মা আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি শবেকদর লাভ করলে তাতে কি দুআ পাঠ করব? উত্তরে তিনি বললেন, “তুমি বলো,

[illegible]

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুউবুন তুহিব্বুল আফওয়া, ফা’ফু আন্নী। *(আঃ ৬/১৭১, ১৮২, ১৮৩, ২৫৮, নাঃ আমালুল ইয়াওমি অল-লাইলাহ ৮৭২নং, ইমাঃ ৩৮৫০, হাঃ ১/৫৩০)*

[illegible]

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুউবুন কারীমুন তুহিব্বুল আফওয়া, ফা’ফু আন্নী। *(তিঃ ৩৫১৩নং)*

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল (মহানুভব), ক্ষমাকে পছন্দ কর। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

একাদশ অধ্যায়

ফিত্বরার বিবরণ
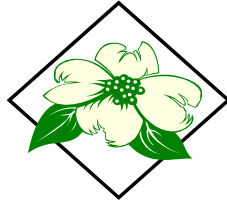
'সাদাকাতুল ফিত্বর'কে 'যাকাতুল ফিত্বর' বলা হয়। 'সাদাকাহ' শব্দটি শরয়ী পরিভাষায় ফরয যাকাতের অর্থে ব্যবহৃত। আর এ ব্যবহার কুরআন ও হাদীসে বহু জায়গায় পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে 'ফিত্বর' মানে হল, রোযা ছাড়া। সুতরাং 'যাকাতুল ফিত্বর'-এর মানে হল, সেই যাকাত; যা রমযানের রোযা ছাড়ার কারণে ফরয হয়। একে 'যাকাতুল ফিত্বরাহ'ও বলা হয়। 'ফিত্বরাহ' মানে প্রকৃতি। যেহেতু এ যাকাত আত্মশুদ্ধি ও আত্মার আমলকে নির্মল করার জন্য দেওয়া ওয়াজেব, তাই এর নাম যাকাতুল ফিত্বরাহ। *(ফিযাঃ ২/৯১৭)*

❖ সাদাকাতুল ফিত্বরার মান ঃ

ফিত্বরার যাকাত আদায় করা ফরয। আল্লাহর রসূল ﷺ এ যাকাতকে মুসলিম উম্মাহর জন্য ফরয করেছেন। ইবনে উমার ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ মুসলিমদের স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী এবং ছোট ও বড় সকলের জন্য এক সা' (প্রায় আড়াই কেজি) খেজুর বা যব খাদ্য (আদায়) ফরয করেছেন।' *(বুঃ ১৫০৩, মুঃ ৯৮৪নং)*

❖ সাদাকাতুল ফিত্বরার হিকমত ঃ

সাদাকাতুল ফিত্বর সন দুই হিজরীর শা'বান মাসে বিধিবদ্ধ হয়। এ সদকাহ ফরয করা হয় রোযাদারকে সেই অবাঞ্ছনীয় অসারতা ও যৌনাচারের মলিনতা থেকে পবিত্র করার জন্য, যা সে রোযা অবস্থায় করে ফেলেছে। এই সদকাহ হবে তার রোযার মধ্যে ঘটিত ত্রুটির সংশোধনী। যেহেতু নেকীর কাজ পাপকে ধ্বংস করে দেয়।

এ সদকাহ ফরয করা হয়েছে, যাতে সেই ঈদের খুশী ও আনন্দের দিনে গরীব-মিসকীনদের সহজলব্ধ আহার হয়। যাতে তারাও ধনীদের সাথে ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে। যারা আজ আনে কাল খায়, যাদের ভিক্ষা করে দিনপাত হয়, এক মুঠো খাবারের জন্য যাদেরকে লোকের দ্বারস্থ হতে হয়, তাদেরকে অন্ততঃপক্ষে ঈদের দিনটাতেও যেন লাঞ্ছিত হতে না হয় এবং ঘরে খাবার দেখে যাতে মনের ভিতর খুশীর ঢেউ আসে, তার জন্যই সমাজ-বিজ্ঞানী দীন-দরদী দ্বীনের নবী ﷺ এই সুব্যবস্থা করে গেছেন।

এই শেষোক্ত হিকমতের জন্য নিফাসবতী ও ছোট শিশু অরোযাদারের উপরেও উক্ত সদকাহ ফরয করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ রোযাদারের অসারতা ও যৌনাচারের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্রতা এবং মিসকীনদের আহার স্বরূপ ফরয করেছেন ---।' *(সআদাঃ ১৪২০, ইমাঃ ১৮২৭, দারাঃ, হাঃ ১/৪০৯, বাঃ ৪/১৬৩)*

যেমন এই সদকাহ আদায় করতে হয় মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ; যেহেতু তিনি রোযাদারকে পূর্ণ এক মাস রোযা রাখার তওফীক দান করেছেন। *(মুমঃ ৬/১৫১)*

ফিত্বরার সদকাহ হল দেহের যাকাত। যেহেতু মহান আল্লাহ এই দেহকে একটি বছর অবশিষ্ট রেখেছেন এবং নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য হেন নেয়ামত বান্দাকে দিয়ে রেখেছেন। *(ইতহাফঃ ৮২পৃঃ)*

ফিত্বরার যাকাত ফরয করা হয়েছে আনুগত্যের মাসের শেষে; যাতে আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া পরিপূর্ণ হয়। যেহেতু আল্লাহর আনুগত্যের কাজ করে এবং নিষিদ্ধ জিনিস বর্জন করে আত্মা বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়। তদনুরূপ মাল খরচ করলেও পবিত্রতা লাভ হয়। আর এ জন্যই মাল দানকে 'যাকাত' (পবিত্রতা) বলা হয়। *(৪৮ঃ ১৩)*

❖ কার উপরে ওয়াজেব ঃ

ফিতরার যাকাত প্রত্যেক সেই মুসলিমের উপর ফরয, ঈদের রাত ও দিনে যার একান্ত প্রয়োজনীয় এবং নিজের তথা তার পরিবারের আহারের চেয়ে অতিরিক্ত খাদ্য মজুদ থাকে। আর এ ফরযের ব্যাপারে সকল ব্যক্তিত্ব সমান। এতে স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড়, ধনী ও গরীব, শহরবাসী ও মরুবাসী (বেদুইন) এবং রোযাদার ও অরোযাদারের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এক কথায় এ যাকাত সকলের তরফ থেকে আদায়যোগ্য।

এ সদকাহ ফরয হওয়ার জন্য যাকাতের নিসাব হওয়া শর্ত নয়। যেহেতু তা ব্যক্তির উপর ফরয, মালের উপর নয়। মালের সাথে তার কোন সম্পর্কও নেই এবং মাল বেশী হলে তার পরিমাণ বেশীও হয় না। বলা বাহুল্য, এ সদকাহ কাফ্ফারার মত; যা ধনী-গরীব সকলেই আদায় করতে বাধ্য। যেমন "প্রত্যেক স্বাধীন ও ক্রীতদাস বান্দার জন্য---" *(বুঃ ১৫০৪, মুঃ ৯৮৪নং)* হাদীসের এই শব্দও ধনী-গরীব সকলের জন্য ব্যাপক; চাহে সে নিসাবের মালিক হোক অথবা না হোক।

আবূ হুরাইরা ﵁ বলতেন, '---(ফিতরার যাকাত ফরয) প্রত্যেক স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড়, গরীব ও ধনীর উপর।' *(আঃ ২/২৭৭, দারাঃ, বাঃ ৪/ ১৬৪, মাযাঃ ৩/৮০)*

পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ-এর হাদীস, "ধনী অবস্থা ছাড়া কোন সদকাহ নেই।" *(বুঃ ৫৫৭পৃঃ তা'লীক, আঃ ২/২৩০, ৪৩৫)* এর অর্থ হল, মালের সদকাহ। আর ফিতরার যাকাত খাস দেহাত্মার সদকাহ। *(মুগঃ ৩/৭৪, ফিযাঃ ২/৯২৭-৯২৯)*

ফিতরার সদকাহ আদায় করার জন্য মূল সম্পদ; যেমন জমি-জায়গা, আসবাব-পত্র এবং মহিলার ব্যবহারের অলঙ্কার বিক্রয় করা জরুরী নয়। অবশ্য যে জিনিস তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং যা বিক্রয় করা সম্ভব, তা বিক্রয় করে ফিতরার সদকাহ আদায় করা ওয়াজেব। যেহেতু মৌলিক কোন ক্ষতি ছাড়া তা আদায় করা সম্ভব। সুতরাং যেমন প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত খাদ্য-সামগ্রী থাকলে আদায় করতে হত, তেমনি অতিরিক্ত বিক্রয়যোগ্য জিনিস থাকলে তা বিক্রয় করে ফিতরার সদকাহ আদায় করতে হবে। *(মুগঃ ৩/৭৬, ফিযাঃ ২/৯৩০-৯৩১)*

যে ব্যক্তির সদকাহ আদায় করার মত কিছু আছে; কিন্তু তার ঐ পরিমাণ দেনা আছে, তবুও তাকে তা আদায় করতে হবে। তবে যদি ঋণদাতা তার ঋণ পরিশোধ নেওয়ার জন্য তাগাদা করে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে আগে ঋণ পরিশোধ করাই আবশ্যিক; আর তার জন্য যাকাত ফরয নয়। *(ফিযাঃ ২/৯৩১)* পরন্তু যাকাত ওয়াজেব হওয়ার আগে যদি দেনা শোধ করার সময় উপস্থিত হয়ে থাকে, তাহলে ঋণদাতার পক্ষ থেকে তাগাদা না থাকলেও আগে দেনা শোধ করতে হবে এবং ফিতরার যাকাত মাফ হয়ে যাবে। *(মুমঃ ৬/ ১৫৫)*

যার কাছে বর্তমানে কিছু নেই, কিন্তু পরে আসবে; যেমন চাকুরীর বেতন, তাকে ঋণ করে সদকাহ আদায় করতে হবে।

যদি কারো ঘরে আড়াই কেজি পরিমাণ চাইতে কম খাদ্য থাকে, তাহলে সে তাই আদায় করবে। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর।" *(কুঃ ৬৪/১৬)* আর মহানবী ﷺ বলেন, "আমি যখন তোমাদেরকে কিছু আদেশ করি, তখন তোমরা তা যথাসাধ্য (যতটা পার) পালন কর।" *(বুঃ ৭২৮৮, মুঃ ১৩৩৭, নাঃ, ইমাঃ) (মাশারাঃ মজলিস নং ২৮)*

যার ভরণ-পোষণ করা ওয়াজেব, তার তরফ থেকেও ফিতরার যাকাত আদায় করা ওয়াজেব; যেমন স্ত্রী-সন্তান প্রভৃতি - যদি তারা নিজেদের যাকাত নিজেরা আদায় করতে সক্ষম না হয় তাহলে। অন্যথা তারা নিজেরা নিজেদের ফিতরাহ আদায় করলে সেটাই উত্তম। যেহেতু শরীয়তের আদেশে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সরাসরি সম্বোধন করা হয়। *(মাশারাঃ মজলিস নং ২৮)* তাছাড়া ইবনে উমার ﷺ-এর হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ ছোট-বড় এবং স্বাধীন-ক্রীতদাস; যাদের ভরণ-পোষণ তোমাদেরকে করতে হয় তাদের সকলের পক্ষ থেকে ফিতরার সদকাহ আদায় করতে আদেশ করেছেন। *(দারাঃ, বাঃ ৪/১৬১, ইরঃ ৮৩৫নং)*

মাতৃজঠরে ভ্রূণের বয়স যদি ১২০ দিন হয়ে থাকে, তাহলে তার পক্ষ থেকেও ফিতরার যাকাত আদায় করা মুস্তাহাব বলে কিছু উলামা মনে করেন। বলা বাহুল্য, ভ্রূণের তরফ থেকে ফিতরাহ আদায় ওয়াজেব নয়। *(ফিযাঃ ২/৯২৭, মুমঃ ৬/১৬২)*

❖ ফিতরার যাকাতের পরিমাণ কত?

ফিতরার সদকাহ ওয়াজেব হল এক সা' পরিমাণ। এখানে সা' বলতে মদীনায় প্রচলিত নববী সা' উদ্দিষ্ট। পৃথিবীর অন্য কোন অঞ্চলে সা' প্রচলিত থাকলেও তা যদি মাদানী সা' থেকে মাপে ভিন্ন হয়, তাহলে ফিতরাহ আদায়ের ক্ষেত্রে সে সা'-এর মাপ গ্রহণযোগ্য নয়।

নববী সা'-এর মাপ অনুযায়ী বর্তমান যুগে ভাল ধরনের গমের ওজন হয় ২ কেজি ৪০ গ্রাম। *(মুমঃ ৬/১৭৬)* অবশ্য চাল ইত্যাদি সলিট খাদ্য-দ্রব্যের ওজন তার থেকে বেশী হবে। অতএব এক সা' পরিমাণ খাদ্যের মাঝামাঝি ওজন হবে মোটামুটি আড়াই কেজি মত। *(তাইরাঃ ৩১পৃঃ, যাসাঃ ২৯পৃঃ)*

পক্ষান্তরে অর্ধ সা' গম ফিতরা দেওয়ার ব্যাপারটা মুআবিয়া ﷺ-এর নিজস্ব মত; যে মতের বিরোধিতা করেছেন আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন আমাদের মাঝে ছিলেন, তখন আমরা ফিতরার সদকাহ প্রত্যেক ছোট ও বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের তরফ থেকে এক সা' খাদ্য; এক সা' পনির, এক সা' যব, এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিসমিস আদায় দিতাম। এইভাবেই আমরা সদকাহ আদায় দিতাম; অতঃপর একদা মুআবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান হজ্জ অথবা উমরাহ করতে এসে (মদীনায়) এলেন। সেই সময় তিনি মিম্বরে খুতবাহ দেওয়ার সময় লোকেদের উদ্দেশ্যে যে সব কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে একটি কথা ছিল এই যে, 'আমি মনে করি শামের অর্ধ সা' (উৎকৃষ্ট) গম এক সা' খেজুরের সমতুল্য।' ফলে লোকেরা তাঁর এ মত গ্রহণ করে নিল। আবূ সাঈদ বলেন, 'কিন্তু আমি ততটা পরিমাণ খাদ্যই আজীবন আদায় দিতে থাকব, যতটা পরিমাণ আমি পূর্বে (আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে) আদায় দিতাম।' *(বুঃ ১৫০৮, মুঃ ৯৮৫, আদাঃ ১৬১৬নং)*

ত্বাহাবী প্রমুখ হাদীসগ্রন্থের এক বর্ণনায় আছে, আবূ সাঈদ বলেন, ' আমি ততটা পরিমাণ খাদ্যই আদায় দিতে থাকব, যতটা পরিমাণ আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে আদায় দিতাম; এক সা' খেজুর, এক সা' যব, এক সা' কিসমিস অথবা এক সা' পনীর।' এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, 'অথবা অর্ধ সা' গম?' তিনি বললেন, 'না। এটা হল মুআবিয়ার মূল্য নির্ধারণ; আমি তা গ্রহণ করি না এবং তার (এ মতের) উপর আমলও করি না।' *(ইগঃ ৩/৩৩৯)*

এক সা' গম ফিতরাহ দেওয়ার কথা মহানবী ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। যেমন অর্ধ সা' গম ফিতরাহ দেওয়ার হাদীস সহীহর দর্জায় পৌঁছে না।

বলা বাহুল্য, ফিতরার মূল্য নির্ধারণ সঠিক হবে না। বরং মূল্য প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক দেশে ভিন্ন ভিন্ন হবে। কোন সময় এমনও হতে পারে যে, (খেজুরের পরিমাণে) ফিতরায় কয়েক সা' গম আদায় দিতে হবে।

মোটকথা, সা'-এর পরিমাপকেই ফিতরার মাপকাঠি গণ্য করা হল মৌলিক ব্যাপার এবং তাতেই রয়েছে সর্বপ্রকার খাদ্য এবং সর্বযুগের জন্য পূর্বসতর্কতামূলক আমল। আর এই মত অনুসরণ করার মাধ্যমেই এ ব্যাপারে মতভেদকে এড়ানো সম্ভব হবে এবং মান্য করা হবে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হাদীসকে। *(ফিযাঃ ২/৯৪০-৯৪১, মুমঃ ৬/১৭৯-১৮০)*

❖ সাদাকাতুল ফিত্বর কোন্ খাদ্য থেকে আদায় করতে হবে?

সাদাকাতুল ফিত্বর দেশের প্রধান খাদ্য থেকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়; যদিও হাদীসে সে খাদ্যের উল্লেখ নেই, যেমন চাল। পক্ষান্তরে যে সব খাদ্যের কথা হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ এসেছে; যেমন খেজুর, যব, কিমমিস ও পনীর - এ সব খাদ্য আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগের মত দেশের প্রধান খাদ্য না হলে তা থেকে ফিতরা আদায় যথেষ্ট হবে না। হাদীসে ঐ চারটি খাদ্যের উল্লেখ আসার কারণ হল, সে যুগে মদীনায় সেগুলি প্রধান খাদ্যসামগ্রীরূপে ব্যবহার হত। সুতরাং তার উল্লেখ উদাহরণস্বরূপ করা হয়েছে; নির্ধারণস্বরূপ নয়। আবূ সাঈদ رضي الله عنه বলেন, 'আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যামানায় ঈদের দিন এক সা' খাদ্য আদায় দিতাম। আর তখন আমাদের খাদ্য ছিল, যব, কিসমিস, পনীর ও খেজুর।' *(বুঃ ১৫১০নং)*

এখানে 'খাদ্য' বলে মৌলিক উপাদানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ, ফিতরা ছিল মানুষের খাদ্য ও আহার; যা খেয়ে লোকেরা জীবন ধারণ করত। এ কথার সমর্থন করে ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-এর হাদীস; তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ রোযাদারের অসারতা ও যৌনাচারের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্রতা এবং মিসকীনদের আহার স্বরূপ (সাদাকাতুল ফিত্বর) ফরয করেছেন ---।' *(সআদাঃ ১৪২০, ইমাঃ ১৮২৭, দারাঃ, হাঃ ১/৪০৯, বাঃ ৪/১৬৩)*

সুতরাং যে দেশের প্রধান খাদ্য কোন শস্য অথবা ফল না হয়; বরং গোশ্ত্ হয়, যেমন যারা পৃথিবীর উত্তর মেরুতে বসবাস করে তাদের প্রধান খাদ্য হল গোশ্ত্, তারা যদি ফিত্বরায় গোশ্ত্ দান করে, তাহলে সঠিক মত এই যে, নিঃসন্দেহে তা যথেষ্ট হবে।

সারকথা, দেশের প্রধান খাদ্য শস্য, ফল বা গোশ্ত্ যাই হোক না কেন, ফিতরায় তা দান করলে ফিতরা আদায় হয়ে যাবে। তাতে সে খাদ্যের কথা হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ থাক অথবা না থাক। *(মুমঃ ৬/১৮০-১৮৩)*

উক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, ফিতরায় টাকা-পয়সা, কাঁথা-বালিশ-চাটাই, লেবাস-পোশাক, পশুখাদ্য অথবা কোন আসবাব-পত্র দান করলে তা যথেষ্ট নয়। কারণ, তা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নির্দেশ-বিরোধী। আর তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে, যাতে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।” *(আঃ ২/১৪৬, বুঃ তা'লীক ১৫৩৯পৃঃ, মুঃ ১৭১৮নং, আদাঃ, ইমাঃ)* “যে ব্যক্তি আমাদের এ ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।” *(আঃ ৬/২৭০, বুঃ ২৬৯৭, মুঃ ১৭১৮, ইমাঃ)*

টাকা-পয়সা হিসাবে (রুপার) দিরহাম এবং (সোনার) দীনার মুদ্রা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যামানায় মজুদ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ফিতরার যাকাতে এক সা' খাদ্য দান করতেই আদেশ করলেন এবং তার মূল্য দান করার এখতিয়ার ঘোষণা করলেন না। সুতরাং ফিতরায় খাদ্যের দাম আদায় দেওয়া সাহাবা ﷺ-গণের বিরুদ্ধাচরণ। যেহেতু তাঁরা ফিতরার সদকায় এক সা' খাদ্যই দান করতেন। পরন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমরা আমার সুন্নাহ (তরীকা) ও আমার পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাহ অবলম্বন কর। তা খুব সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। আর অভিনব কর্মাবলী থেকে সাবধান থেকো।---” *(আঃ ৪/১২৬, ১২৭, আদাঃ ৪৬০৭, তিঃ ২৬৭৬, ইমাঃ ৪৩, ৪৪, ইহিঃ, হাঃ ১/৯৫ প্রমুখ, ইগঃ ২৪৫৫নং)*

তাছাড়া ফিতরার যাকাত নির্দিষ্ট দ্রব্য থেকে আদায়যোগ্য একটি ফরয ইবাদত। অতএব নির্দিষ্ট ঐ দ্রব্য ছাড়া অন্য দ্রব্য আদায়ের মাধ্যমে ঐ ফরয পালন হবে না; যেমন তার নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময়ে তার আদায় যথেষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে ফিতরায় খাদ্য দান করা ইসলামের একটি স্পষ্ট প্রতীক। কিন্তু মূল্য আদায় দিলে তা গোপন দানে পরিণত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, সুন্নাহর অনুসরণ করাই আমাদের জন্য উত্তম এবং তাতেই আছে সার্বিক মঙ্গল। *(মাশারাঃ মজলিস নং ২৮, ফুসিতাযাঃ ৩০পৃঃ)*

বুঝা গেল যে, গ্রাম-শহর সকল স্থানে প্রধান খাদ্য চাল ফিতরা দেওয়ার পরিবর্তে তার নির্দিষ্ট মূল্য আদায় করা যথেষ্ট নয়। চাকুরী-জীবী হলেও তাকে চাল ক্রয় করেই ফিতরা দিতে হবে। অবশ্য তার কোন এমন প্রতিনিধি অথবা কোন এমন সংস্থাকে টাকা দেওয়া চলবে, যে খাদ্য ক্রয় করে ঈদের আগে গরীবদের হাতে পৌঁছে দেবে।

আর দানের ক্ষেত্রে মধ্যম ধরনের চাল এখতিয়ার করা বাঞ্ছনীয়। নচেৎ ইচ্ছাকৃত নিম্নমানের চাল দান করলে মহান আল্লাহর দরবারে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

.(([illegible]))

অর্থাৎ, (হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জিত এবং ভূমি হতে উৎপাদনকৃত বস্তুর মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা দান কর।) আর তা হতে মন্দ জিনিস দান করো না; অথচ চোখ বন্ধ করে ছাড়া তোমরা নিজে তা গ্রহণ করবে না। *(কুঃ ২/২৬৭)*

❖ ফিতরা কখন ওয়াজেব হয়?

রমযানের শেষ দিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে ফিতরার যাকাত ওয়াজেব হয়। এ সময় হল রমযানের শেষ রোযা ইফতার করার সময়। আর এ সময়ের দিকে সম্বদ্ধ করেই তার নাম হয়েছে 'সাদাকাতুল ফিত্‌র'। বলা বাহুল্য, ইফতার করার সময় বাস্তবায়িত হয় ঈদের রাতের সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার সাথে সাথে। অতএব এ সময়ে যে শরীয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত

থাকবে কেবল তারই উপর ঐ যাকাত ওয়াজেব এবং তার পরে কেউ আজ্ঞাপ্রাপ্ত হলে তা ওয়াজেব নয়।

যেমন ঈদের রাতের সূর্য ডোবার সামান্যক্ষণ পর যদি কেউ ইসলামে দীক্ষিত হয় অথবা কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে, অথবা শেষ রমযানের সূর্য ডোবার সামান্যক্ষণ পূর্বে যদি কেউ মারা যায়, তাহলে উক্ত প্রকার লোকেদের উপর ফিতরা ওয়াজেব নয়। অবশ্য মায়ের গর্ভে ভ্রূণের তরফ থেকে যাকাত দেওয়া অনেক উলামা মুস্তাহাব বলেছেন; যেমন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে।

পক্ষান্তরে ঐ দিনের সূর্য ডোবার সামান্যক্ষণ আগে যদি কেউ ইসলামে দীক্ষিত হয় অথবা কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে, অথবা সূর্য ডোবার সামান্যক্ষণ পরে যদি কেউ মারা যায়, তাহলে উক্ত প্রকার লোকেদের উপর ফিতরা ওয়াজেব। *(মুমঃ ৬/ ১৬৬- ১৬৭, মাশারাঃ মজলিস নং ২৮)*

❖ ফিতরা কখন দিতে হবে?

ফিতরা আদায় করার দুটি সময় আছে; তার মধ্যে একটি সময়ে আদায় দিলে ফযীলত পাওয়া যাবে এবং অন্য একটির সময়ে দান করলে যথেষ্ট হয়ে যাবে। প্রথম সময়ে দিতে হয় এবং দ্বিতীয় সময়ে দেওয়া চলে। প্রথম সময়ে দেওয়াই বিধেয় এবং দ্বিতীয় সময়ে দেওয়া বৈধ।

এই যাকাত আদায়ের ফযীলতের সময় হল, ঈদের সকালে নামাযের পূর্বে। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, 'আমরা নবী ﷺ-এর যুগে ঈদুল ফিত্বরের দিন এক সা' খাদ্য দান করতাম।' *(বুঃ ১৫১০নং)*

ইবনে উমার ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ লোকেদের ঈদের নামাযের জন্য বের হওয়ার পূর্বে ফিতরার যাকাত আদায় দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।' *(বুঃ ১৫০৯, মুঃ ৯৮৬নং)*

ইবনে উয়াইনাহ তাঁর তফসীর-গ্রন্থে আম্র বিন দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন, ইকরামা বলেন, 'লোকে তার ফিতরার যাকাত ঈদের নামাযের পূর্বে (মিসকীনদেরকে) পেশ করে দেবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, (([illegible]))

অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি সাফল্য লাভ করবে, যে (যাকাত দিয়ে) পবিত্র হবে এবং তার প্রভুর নাম স্মরণ করে নামায পড়বে। *(কুঃ ৮৭/ ১৪- ১৫)*

এই জন্যই ঈদুল ফিত্বরের নামায দেরী করে পড়া উত্তম। যাতে ফিতরা আদায় দেওয়ার জন্য সময় সংকীর্ণ না হয়।

এই যাকাত আদায়ের বৈধ সময় হল ঈদের আগে দু-এক দিন। নাফে' বলেন, 'ইবনে উমার ﷺ ছোট-বড় সকলের তরফ থেকে ফিতরা দিতেন; এমন কি আমার ছেলেদের তরফ থেকেও তিনি ফিতরা বের করতেন। আর তাদেরকে দান করতেন, যারা তা গ্রহণ করত। তাদেরকে ঈদের এক অথবা দুই দিন আগে দিয়ে দেওয়া হত।' *(বুঃ ১৫১১, আদাঃ ১৬১০নং)*

এ যাকাত দিতে ঈদের নামাযের পর পর্যন্ত দেরী করা বৈধ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পর তা আদায় দেয়, তার যাকাত কবুল হয় না। কারণ, তার কাজ মহানবী ﷺ-এর নির্দেশ-বিরোধী। ইবনে আব্বাসের হাদীসে বর্ণিত, মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তা নামাযের

পূর্বে আদায় দেয় তার যাকাত কবুল হয়। আর যে তা নামাযের পরে আদায় দেয়, তার সে যাকাত সাধারণ দান বলে গণ্য হয়।” *(সআদাঃ ১৪২০, ইমাঃ ১৮২৭, হাঃ ১/৪০৯, বাঃ ৪/১৬৩)*

অবশ্য কোন অসুবিধার জন্য নামাযের পর দিলে তার যাকাত কবুল হয়ে যাবে। যেমন, যদি কেউ ঈদের সকালে এমন জায়গায় থাকে, যেখানে যাকাত নেওয়ার মত লোক নেই, অথবা সকালে হঠাৎ করে ঈদের খবর এলে ফিতরা আদায় দেওয়ার সুযোগ না পেলে, অথবা অপর কাউকে তা আদায় দেওয়ার ভার দেওয়ার পর সে তা ভুলে গেলে ঈদের নামাযের পর তা আদায় দিলে দোষাবহ নয়। যেহেতু এ ব্যাপারে তার ওজর গ্রহণযোগ্য।

ওয়াজেব হল, যথা সময়ে ঈদের নামাযের পূর্বেই গরীব-মিসকীনদের হাতে অথবা তাদের কোন প্রতিনিধির হাতে পৌঁছে যাওয়া। যাকে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল তাকে বা তার প্রতিনিধিকে সে সময় না পাওয়া গেলে অন্য হকদারকে দান করে দিতে হবে। তবুও যথা সময় অতিবাহিত করা যাবে না। *(মাশারাঃ মজলিস নং ২৮)*

পক্ষান্তরে ইবনে উমার কর্তৃক যে হাদীস বর্ণিত আছে, ‘ঈদের নামাযের জন্য বের হয়ে যাওয়ার পূর্বে আমাদেরকে ফিতরার যাকাত বের করে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হত। অতঃপর নামায থেকে ফিরার পর আল্লাহর রসূল ﷺ তা মিসকীনদের মাঝে বন্টন করে দিতেন---।’ তা সহীহ নয়; বরং তা অপ্রামাণ্য ও যয়ীফ। *(ইগঃ ৮৪৪নং দ্রঃ)*

❖ যাকাত কোথায় দিতে হবে?

যাকাত আদায় করার সময় মুসলিম যে জায়গায় থাকে, সে জায়গার দরিদ্র মানুষদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। তাতে সে জায়গা তার স্থায়ী আবাসভূমি হোক অথবা অস্থায়ী প্রবাসভূমি। বিশেষ করে সে জায়গা যদি মাহাত্ম্যপূর্ণ হয়; যেমন মক্কা ও মদীনা, অথবা সে জায়গার গরীব মানুষরা বেশী অভাবী হয়, তাহলে সে জায়গাতেই যাকাত বন্টন করা কর্তব্য।

কিন্তু অবস্থান ক্ষেত্রে যদি সদকাহ গ্রহণকারী কোন গরীব মানুষ না থাকে, অথবা হকদার লোক জানা না থাকে, তাহলে যেখানে আছে সেখানে কোন প্রতিনিধিকে যাকাত বিতরণ করার ভার অর্পণ করতে হবে। তবে অবশ্যই তাদের হাতে সেই যাকাত ঈদের নামাযের আগে পৌঁছতে হবে। *(মাজাল্লাতুদ দা’ওয়া ১৬৭৪/৪১)*

❖ যাকাতের হকদার ও বন্টন-পদ্ধতি

ফিতরার যাকাতের হকদার হল গরীব মানুষরা এবং সেই ঋণগ্রস্ত মানুষরা, যারা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না। এই শ্রেণীর মানুষদেরকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যাকাত দেওয়া যাবে।

একটি ফিতরা কয়েকটি মিসকীনকে দেওয়া চলবে। যেমন কয়েকটি ফিতরা দেওয়া চলবে একটি মাত্র মিসকীনকে। যেহেতু মহানবী ﷺ কত দিতে হবে তা নির্ধারণ করেছেন; কিন্তু কয়জন মিসকীনকে দিতে হবে, তা নির্ধারণ করেন নি।

সুতরাং যদি কয়েক জন মিলে নিজ নিজ ফিতরা মেপে এক জায়গায় জমা করে এবং তারপর না মেপেই মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করে তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। তবে এ কথা মিসকীনদেরকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, তারা ঐ দানের পরিমাণ জানে না। নচেৎ,

মাপা আছে মনে করে কেউ ঐ ফিতরা নিজের তরফ থেকে আদায় দিলে ধোকায় পড়তে পারে।

বলা বাহুল্য, মিসকীন কারো কাছ থেকে ফিতরা নিয়ে সেই ফিতরাই নিজের অথবা পরিবারের কারো তরফ থেকে অন্য মিসকীনকে ফিতরা হিসাবে দিতে পারে। অবশ্য সে তা মেপে নেবে অথবা যে দিয়েছে তার কাছ থেকে বিশ্বাস্যরূপে জেনে নেবে যে, তা পরিপূর্ণ একটি ফিতরা। *(মাশারাঃ মজলিস নং ২৮)*

দ্বাদশ অধ্যায়

ঈদ ও তার বিভিন্ন আহকাম

ঈদ হল সেই দিন পালনের নাম, যা মানুষের চিরাচরিত অভ্যাস। ঈদ মানে ফিরে আসা। যেহেতু খুশীর বার্তা নিয়ে ঈদ বাৎসরিক বারবার ফিরে আসে এবং মানুষ তা বারবার পালন করে, তাই তাকে ঈদ বলা হয়। প্রত্যেক জাতির আচরণে ঈদ পালন করার প্রথা বড় প্রাচীন। প্রত্যেক বড় বড় ঘটনা-প্রবাহকে উপলক্ষ্য করে তারই মাধ্যমে সেই স্মৃতি জাগরণ করে ঈদ (পর্ব) পালন করে থাকে এবং তাতে তারা নানা ধরনের খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করে থাকে।

অমুসলিম জাতির পর্ব সাধারণতঃ কোন না কোন বৈষয়িক ব্যাপারের সাথে জড়িত। যেমন নওরোজ, ক্রিসমাস ডে, মাতৃদিবস, ভালোবাসা দিবস, জন্মদিন, বিবাহ-বার্ষিকী প্রভৃতি পর্ব। যেহেতু সেগুলো তাদের মনগড়া ঈদ, সেহেতু তাতে তাদের সেরেফ বস্তুবাদী উৎসব ও আড়ম্বরই পরিলক্ষিত হয়।

পক্ষান্তরে মুসলিম উম্মাহর ঈদ হয় কোন দ্বীনী উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। মহান আল্লাহর কোন ইবাদত পরিপূর্ণ করে এবং তাঁর রসূল ﷺ-এর বিধিবদ্ধ শরীয়ত অনুযায়ী তাঁকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে তা পালন করা হয়। কেননা, মুমিনদের এ দুনিয়ায় খুশী হল একমাত্র মাওলাকে রাজী করেই। যখন মুমিন নিজ মাওলার কোন আনুগত্য পরিপূর্ণ করে এবং তার উপর তাঁর দেওয়া সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করে তখনই খুশীর ঢল নেমে আসে তার হৃদয়-মনে। যেহেতু সে বিশ্বাস ও ভরসা রাখে সেই আনুগত্যের উপর তাঁর মাওলার অনুগ্রহ ও ক্ষমার প্রতিশ্রুতির উপর। মহান আল্লাহ বলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, তুমি বল, আল্লাহর এই অনুগ্রহ ও করুণা নিয়েই তাদেরকে খুশী হওয়া উচিত। আর তারা যা পুঞ্জীভূত করে তা (দুনিয়া) অপেক্ষা এটি শ্রেয়। *(কুঃ ১০/৫৮)*

হযরত আলী ﷺ বলেন, 'যেদিন আমি আল্লাহর কোন প্রকার নাফরমানি করি না, সেদিনই আমার ঈদ।'

অন্যান্য জাতির ঈদ অনেক। কারণ, সেসব ঈদ তাদের নিজস্ব মনগড়া। কিন্তু মুসলিমদের (বাৎসরিক) মাত্র দুটি ঈদ; এর কোন তৃতীয় নেই - ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা। আর এ দুটি ঈদ মহান আল্লাহরই বিধান। তিনিই বান্দার জন্য পালনীয় করেছেন। আনাস ﷺ বলেন,

মহানবী ﷺ মদীনায় আগমন করলে দেখলেন, মদীনাবাসীরা দুটি ঈদ পালন করছে। তা দেখে তিনি বললেন, (জাহেলিয়াতে) তোমাদের দুটি দিন ছিল যাতে তোমরা খেলাধূলা করতে। এক্ষণে ঐ দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তোমাদেরকে দুটি উত্তম দিন প্রদান করেছেন; ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন।' *(সআদাঃ ১০০৪, নাঃ ১৫৫৫নং)*

অবশ্য এ ছাড়া একটি সাপ্তাহিক ঈদ আছে। আর তা হল জুমআহর দিন। সপ্তাহান্তে একবার ফিরে আসে এই ঈদ। অবশ্য এখানে আমাদের আলোচনা হবে ঈদুল ফিত্‌র নিয়ে।(7)

❖ ঈদের নামাযের গুরুত্ব ঃ

ঈদের খুশীর প্রধান অঙ্গ হল, ঈদের নামায। এই নামায বিধিবদ্ধ হয় হিজরীর প্রথম সনেই। এ নামায ২ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। মহানবী ﷺ তাঁর জীবনের প্রত্যেক ঈদেই এ নামায আদায় করেছেন এবং পুরুষ ও মহিলা সকলকেই এ নামায আদায় করার জন্য (ঈদগাহে) বের হতে আদেশ করেছেন। *(ফিসুঃ ১/২৭৭, তাইরাঃ ৩৩পৃঃ)*

সত্যানুসন্ধানী বহু উলামা ঈদের নামাযকে ওয়াজেব মনে করেন; যা কোন ওযর ছাড়া মাফ নয়। তাঁরা এর কারণ দর্শিয়ে বলেন, যেহেতু মহানবী ﷺ তাঁর জীবনে প্রত্যেকটি ঈদে এ নামায আদায় করেছেন এবং কোন ঈদেই তা ত্যাগ করেন নি। মহিলাদেরকে এ নামায আদায় করার লক্ষ্যে ঘর থেকে বের হতে আদেশ করেছেন। আর আদেশ করার মানেই হল তা ওয়াজেব। তাছাড়া ঈদের নামায হল ইসলামের অন্যতম প্রতীক। আর দ্বীনের প্রতীক ওয়াজেব ছাড়া আর কি হতে পারে? যেমন ঈদ ও জুমআহ একই দিনে একত্রিত হলে এবং ঈদের নামায আদায় করলে আর জুমআহ না পড়লেও চলে। আর এ কথা বিদিত যে, কোন নফল আমল কোন ফরয আমলকে গুরুত্বহীন করতে পারে না। *(দ্রঃ = মাফাঃ ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৩/১৬১, কিসাঃ ইবনুল কাইয়েম ১১পৃঃ, নাআঃ ৩/৩১০-৩১১, মুমঃ ৫/১৫১, তামিঃ ৩৪৪পৃঃ, ফাসিঃ মুসনিদ ১১৬পৃঃ)*

কিন্তু যাঁরা বলেন, ঈদের নামায ওয়াজেব নয়; বরং তা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, তাঁরা দলীলস্বরূপ সেই আরব বেদুইনের হাদীসটি পেশ করেন, যে হাদীসে মহানবী ﷺ ঐ বেদুইনকে ইসলামের ফরয আমল শিক্ষা দিলেন এবং তার মধ্যে ৫ অক্ত্‌ নামাযও শামিল ছিল। বেদুইন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, এ ছাড়া কি আমার উপর অন্য কিছু ফরয আছে? উত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, “না, অবশ্য তুমি যদি নফল হিসাবে পড়, (তাহলে সে কথা আলাদা।)” *(বুঃ ৪৬, মুঃ ১১নং)* অতএব বুঝা গেল যে, ৫ অক্ত্‌ নামায ছাড়া অন্য কোন নামায ফরয বা ওয়াজেব নয়।

ঈদের নামায ওয়াজেব না হলেও তার পৃথক বৈশিষ্ট্য ও বড় গুরুত্ব রয়েছে। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

---

(7) ঈদুল আযহা নিয়ে আলোচনা 'যুল-হজ্জের তের দিন'-এ দ্রষ্টব্য।

Contents

ঈদের আদব

❖ ঈদের জন্য গোসল করা ঃ

ঈদের নামাযের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। ইবনে উমার ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি ঈদুল ফিত্বরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন। *(মাঃ ৪২৮নং)*

সাঈদ বিন মুসাইয়াব থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'ঈদুল ফিত্বরের সুন্নত হল ৩টি; পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া, যাওয়ার আগে কিছু খাওয়া এবং গোসল করা।' *(ইগঃ ৩/১০৪)* আর সম্ভবতঃ তিনি এ সুন্নত ৩টি কোন কোন সাহাবা থেকে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম নওবী ঈদের নামাযের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে উলামাগণ একমত আছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া যে অর্থে জুমআহ ইত্যাদি সাধারণ সমাবেশের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব, সেই অর্থ ঈদেও বর্তমান। বরং সেই অর্থ ঈদে অধিকতর স্পষ্ট। *(দুরাঃ ৯৭পৃঃ)*

❖ ঈদের জন্য সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার ঃ

সহীহ বুখারীতে 'ঈদ ও তার জন্য সাজসজ্জা গ্রহণ'-এর বাবে বর্ণিত আষারে আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেন, একদা উমার ﷺ একটি মোটা রেশমের তৈরী জুব্বা বাজারে বিক্রয় হতে দেখে তিনি তা নিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এটা ক্রয় করে নিন। এটি ঈদ ও বহিরাগত রাজ-প্রতিনিধিদের জন্য পরিধান করে সৌন্দর্য ধারণ করবেন।' কিন্তু তিনি বললেন, "এটি তো তাদের লেবাস, যাদের (পরকালে) কোন অংশ নেই।" *(বুঃ ৯৪৮নং)*

ইবনে কুদামাহ বলেন, এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, উক্ত সময়ে সৌন্দর্য ধারণ করা তাঁদের নিকট প্রচলিত ছিল। *(মুগঃ ৩/২৫৭)* উক্ত ঘটনায় আল্লাহর রসূল ﷺ সৌন্দর্য ধারণের ব্যাপারে আপত্তি জানালেন না। কিন্তু তা ক্রয় করতে আপত্তি জানালেন; কেননা তা ছিল রেশমের তৈরী। *(দুরাঃ ৯৯পৃঃ)*

ত্বাবারানীতে ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ ঈদের দিনে একটি লাল রঙের চেক-কাটা চাদর পরতেন। *(সিসঃ ১২৭৯নং দ্রঃ)*

ইবনে উমার ﷺ ঈদের জন্য তাঁর সবচেয়ে বেশী সুন্দর লেবাসটি পরিধান করতেন। *(বাঃ ৩/২৮১)*

আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ উভয় ঈদে তাঁর সব চাইতে বেশী সুন্দর পোশাকটি পরিধান করতেন। *(বাঃ, ফবাঃ ২/৫১০)*

ইমাম মালেক বলেন, 'আমি আহলে ইল্মদের কাছে শুনেছি, তাঁরা প্রত্যেক ঈদে সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহারকে মুস্তাহাব মনে করতেন।'

সুতরাং পুরুষের জন্য উচিত হল, ঈদের নামাযের জন্য বের হওয়ার আগে তার সব চাইতে সুন্দর পোশাকটি পরিধান করবে। অবশ্য মহিলারা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় (ভিতর বাহিরের) সর্বপ্রকার সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে দূরে থাকবে। যেহেতু বেগানা পুরুষের

সম্মুখে মহিলার সৌন্দর্য প্রকাশ করা হারাম। অনুরূপ হারাম - ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কোন প্রকার সেন্ট, পারফিউম, আতর বা সুগন্ধময় ক্রিম-পাউডার অথবা অন্য কোন প্রসাধন ব্যবহার। যেমন, বাইরে বের হয়ে তার চলনে, বলনে, ভাবে, ভঙ্গিমায় যেন-তেন প্রকারে কোন পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা। যেহেতু সে তো সে সময় কেবল মহান আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করার উদ্দেশ্যেই বের হয়। তাহলে যে মুমিন মহিলা তাঁর আনুগত্যে সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে আবার তাঁরই নাফরমানি করে টাইটফিট্ বা চুস্ত্ অথবা দৃষ্টি-আকর্ষক রঙিন পোশাক পরিধান করে কি করে অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হয় কিভাবে? *(দুরাঃ ৯৯-১০০পৃঃ)*

❖ ঈদের নামাযের জন্য বের হওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়াঃ

ঈদগাহের জন্য বের হওয়ার পূর্বে ৩ অথবা ৫ বেজোড় সংখ্যক খেজুর খাওয়া মুস্তাহাব। আনাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেজুর না খেয়ে বের হতেন না।' এক বর্ণনায় আছে যে, 'তিনি তা বেজোড় সংখ্যক খেতেন।' *(বুঃ ৯৫৩, ইমাঃ ১৭৫৪, ইখুঃ ১৪২৯নং)*

এই খাওয়ার পিছনে হিকমত হল, যাতে কেউ মনে না করে যে, ঈদের নামায পর্যন্ত রোযা রাখতে হয়। আর এতে রয়েছে রোযা ভেঙ্গে সত্বর মহান আল্লাহর হুকুম পালন। *(ফবাঃ ২/৫১৮)*

কোন কোন উলামা মনে করেন যে, যদি কেউ ফজর উদয় হওয়ার পরে এবং ফজরের নামায পড়ার আগেও খেয়ে নেয়, তাহলে উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে। কারণ, সে অবস্থায় সে দিনের বেলায় খেয়েছে বলেই বিবেচিত হবে। অবশ্য উত্তম হল, ঈদগাহে বের হওয়ার অব্যবহিত পূর্বেই তা খাওয়া। *(মুমঃ ৫/১৬১)*

প্রকাশ থাকে যে, খেজুর না পাওয়া গেলে যে কোন খাবার খেলেই যথেষ্ট হবে।

❖ ঈদগাহে বের হওয়াঃ

সুন্নত এই যে, ঈদের নামাযের জন্য গ্রাম-শহরের বাইরে ঈদগাহ হবে। যেহেতু মহানবী ﷺ উভয় ঈদের দিন মসজিদ ত্যাগ করে ঈদগাহে বের হতেন। অনুরূপ আমল ছিল খুলাফায়ে রাশেদীনের এবং তাঁদের পরবর্তীদের। *(দ্রঃ বুঃ ৯৫৬, মুঃ ৮৮৯, নাঃ ১৫৭৫, বাঃ ৩/২৮০, আঃ ৩/৩৬, ৫৪)*

❖ পায়ে হেঁটে যাওয়াঃ

পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া মুস্তাহাব। ইবনে উমার ও অন্যান্য সাহাবা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত যে, মহানবী ﷺ পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যেতেন এবং পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরতেন। *(সইমাঃ ১০৭০, ১০৭১, ১০৭৩নং)*

আলী ﷺ বলেন, 'একটি সুন্নত হল, পায়ে হেঁটে ঈদগাহ যাওয়া।' *(তিঃ ৫৩০, সইমাঃ ১০৭২, বাঃ ৩/২৮১)*

এ ছাড়া সাঈদ বিন মুসাইয়েবের উক্তি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে; তিনি বলেছেন, 'ঈদুল ফিত্বরের সুন্নত হল ৩টি; পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া, যাওয়ার আগে কিছু খাওয়া এবং গোসল করা।' *(ইগঃ ৩/১০৪)* যুহরী বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ কখনো জানাযায় অথবা

ঈদুল ফিতরে অথবা ঈদুল আযহায় সওয়ার হয়ে যান নি।' *(ঐ ৩/১০৩)* ইমাম আহমাদ বলেন, 'আমরা হেঁটে যাই, আমাদের ঈদগাহ নিকটে। দূরে হলে সওয়ার হয়ে যাওয়ায় দোষ নেই।' *(মুগনী ২/৩৭৪)*

❖ শিশু ও মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়া ঃ

শিশু ও মহিলার জন্যও ঈদগাহে যাওয়া বিধেয়। চাহে মহিলা কুমারী হোক অথবা অকুমারী, যুবতী হোক অথবা বৃদ্ধা, পবিত্রা হোক অথবা ঋতুমতী। উম্মে আতিয়্যাহ বলেন, 'আমাদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন মহিলাদেরকে উভয় ঈদে (ঘর থেকে ঈদগাহে) বের করি। তবে ঋতুমতী মহিলা নামাযের স্থান থেকে দূরে থাকবে। তারা অন্যান্য মঙ্গল ও মুসলিমদের দুআর জন্য উপস্থিত হবে। তারা পুরুষদের পিছনে অবস্থান করবে। পুরুষদের সাথে তারাও (নিঃশব্দে) তকবীর পাঠ করবে।'

তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো কারো চাদর না থাকলে?' উত্তরে তিনি বললেন, "তার কোন বোন তাকে নিজ (অতিরিক্ত অথবা পরিহিত বড়) চাদর পরতে দেবে।" *(বুঃ ৩২৪, ৯৭৪, মুঃ ৮৯০নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ কন্যা ও স্ত্রীদেরকে উভয় ঈদে ঈদগাহে বের হতে আদেশ দিতেন।' *(আঃ ১/২৩১, ইআশাঃ প্রমুখ, সিসঃ ২১১৫, সজাঃ ৪৮৮৮নং)*

বিদিত যে, ঈদগাহে বের হলে মহিলাদের জন্য পর্দা গ্রহণ করা ওয়াজেব। বেপর্দা হয়ে, সেন্ট বা আতর ব্যবহার করে, পুরুষদের দৃষ্টি-আকর্ষী সাজ-সজ্জা করে বের হওয়া বৈধ নয়। বৈধ নয় পুরুষদের পাশাপাশি চলা, তাদের ভিঁড়ে প্রবেশ করা।

বলা বাহুল্য, পরবর্তী যুগে মহিলা দ্বারা নানা ফাসাদ ও অঘটন ঘটার ফলে যাঁরা তাদেরকে ঈদগাহে যেতে বাধা দেন বা অবৈধ মনে করেন, তাঁদের মত সঠিক নয়। অবশ্য যদি তাঁরা কেবল বেপর্দা মহিলা এবং পর্দায় ঢিল মারে এমন মহিলাদের ক্ষেত্রে ঐ বাধা প্রয়োগ করেন, তাহলে তা সঠিক বলে সকলে মেনে নেবে। *(আআসাঈঃ ২৬পৃঃ, মাবাঃ ১৩৬/২৫)* পক্ষান্তরে পর্দানশীন মহিলা সহ সকল মহিলার জন্য ঐ বাধা ব্যাপক করা শুদ্ধ নয়। কারণ, মহানবী ﷺ তাদেরকে বের হতে আদেশ করেছেন। এমন কি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেছেন, 'মহিলাদের জন্য ঈদগাহে বের হওয়া ওয়াজেবও বলা যেতে পারে।' *(ইফিঃ ৮২পৃঃ, মাবাঃ ১৩৬/২৫)*

অতএব স্পষ্ট যে, ঈদের নামায আদায়ের জন্য মহিলাদের মসজিদে অথবা কোন ঘরে জমায়েত হয়ে পৃথকভাবে জামাআত করা এবং মুসলিমদের সাধারণ জামাআতের সাথে তাদের বের না হওয়া মহানবী ﷺ-এর আদেশের পরিপন্থী কাজ। উচিত হল, মহিলাদেরকে পর্দা করা এবং ঈদগাহেও পর্দার ব্যবস্থা করা।

❖ ঈদের দিন তকবীর পাঠ ঃ

শেষ রোযার দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে ঈদের নামায শুরু হওয়া পর্যন্ত তকবীর পাঠ করা বিধেয়। এর দলীল মহান আল্লাহর স্পষ্ট বাণী ঃ

(([illegible]))

অর্থাৎ, যেন তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন তার জন্য তোমরা আল্লাহর তকবীর পাঠ কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। *(কুঃ ২/১৮৫)*

কোন কোন উলামা বলেন, এই তকবীর পাঠ করা ওয়াজেব। অবশ্য তা একবার পাঠ করলেই ওয়াজেব পালনে যথেষ্ট হবে। *(মুহাল্লাঃ ৫/৮৯)*

এই তকবীর আল্লাহর তা'যীম ঘোষণা এবং তাঁর ইবাদত ও শুকরিয়া প্রকাশের উদ্দেশ্যে পুরুষের জন্য মসজিদে, ঘরে, বাজারে ও রাস্তা-ঘাটে উচ্চস্বরে পাঠ করা সুন্নত। সলফদের নিকট ঈদগাহের প্রতি বের হওয়া থেকে শুরু করে ইমাম আসার আগে পর্যন্ত উক্ত তকবীর পাঠ করার কথা অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। এ কথা সলফদের আমল বর্ণনাকারী এক জামাআত গ্রন্থকার; যেমন ইবনে আবী শাইবাহ, আব্দুর রায্যাক ও ফিরয়াবী তাঁদের এ আমল নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর মহানবী ﷺ কর্তৃকও এ কথা সরাসরিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। *(ইগঃ ৩/১২১-১২৩, আল্লামা আলবানী এ ব্যাপারে মারফূ' ও মাওকূফ উভয় সূত্রকে সহীহ বলেছেন।)*

❖ তকবীরের শব্দাবলী ঃ

ইবনে মাসঊদ ﵁ তকবীর পাঠ করে বলতেন,

[illegible]

'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার অলিল্লাহিল হাম্দ।' *(ইআশাঃ ৫৬৫০, ৫৬৫২নং, ইগঃ ৩/১২৫)*

ইবনে আব্বাস ﵁ বলতেন,

[illegible]

'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, অলিল্লাহিল হাম্দ। আল্লা-হু আকবার অ আজাল্ল, আল্লাহু আকবার আলা মা হাদা-না।' *(বাঃ ৩/৩১৫, ইগঃ ৩/১২৫)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

[illegible]

'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, আল্লা-হু আকবার কাবীরা, আল্লা-হু আকবার অ আজাল্ল, আল্লাহু আকবার, অলিল্লাহিল হাম্দ।' *(ইআশাঃ ৫৬৪৫, ৫৬৫৪, ইগঃ ৩/১২৫)*

মহিলারাও এই তকবীর পাঠ করবে, তবে নিম্নস্বরে। যাতে গায়র মাহরাম কোন পুরুষ তার এই তকবীর পাঠের শব্দ না শুনতে পায়। উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, '--- এমনকি আমরা ঋতুমতী মহিলাদেরকেও ঈদগাহে বের করতাম। তারা পুরুষদের পিছনে অবস্থান করত; তাদের তকবীর পড়া শুনে তারাও তকবীর পাঠ করত এবং তাদের দুআ শুনে তারাও দুআ করত। তারা ঐ দিনের বর্কত ও পবিত্রতা আশা করত।' *(বুঃ ৯৭১, মুঃ ৮৯০নং)*

পক্ষান্তরে সমবেত কণ্ঠে সমস্বরে জামাআতী তকবীর অথবা একজন বলার পর অন্য সকলের একই সাথে তকবীর পাঠ বিদআত। যেহেতু যিক্র-আযকারে মহানবী ﷺ-এর আদর্শ হল, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ যিক্র একাকী পাঠ করবে। সুতরাং তাঁর ও তাঁর

সাহাবাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া কারো জন্য উচিত নয়। *(আআসাঈঃ ৩১-৩২পৃঃ)*

❖ ঈদের নামাযের সময়ঃ

ঈদের নামাযের সময় চাশ্তের নামাযের সময়ের মত। যেহেতু আব্দুল্লাহ বিন বুস্র ﵁ লোকেদের সাথে ঈদুল ফিত্র অথবা ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে বের হলেন। ইমাম সাহেবের উপস্থিত হতে দেরী দেখে আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'আমরা নবী ﷺ-এর সাথে এতক্ষণ নামায থেকে ফারেগ হয়ে যেতাম।' আর সে সময়টি ছিল চাশ্তের সময়। *(বুঃ বিনা সনদে প্রত্যয়ের সাথে ১৯১পৃঃ, আদাঃ ১১৩৫, ইমাঃ ১৩১৭, হাঃ ১/২৯৫, বাঃ ৩/২৮২)*

আর চাশ্তের নামাযের সময় শুরু হয় সূর্য যখন দর্শকের চোখে এক বর্শা (এক মিটার) পরিমাণ উপরে ওঠে। অর্থাৎ সূর্য ওঠার মোটামুটি ১৫ মিনিট পরে এই নামায পড়া হয়। *(মুমঃ ৪/১২২)*

ইবনে বাত্ত্বাল বলেন, ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, ঈদের নামায সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে এবং উদয় হওয়ার সময়ে পড়া যাবে না। বরং যখন নফল নামায পড়া বৈধ হয়, তখনই তা পড়া বৈধ।*(ফবাঃ ২/৫৩০)* অর্থাৎ নিষিদ্ধ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরই ঈদের নামায পড়া চলে।

অবশ্য উলামাগণ ঈদুল আযহার নামাযকে সকাল সকাল এবং ঈদুল ফিত্বরের নামাযকে একটু দেরী করে পড়া উত্তম মনে করেছেন। কারণ, প্রত্যেক ঈদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যস্তকারী কর্ম রয়েছে। ঈদুল আযহার কর্ম হল কুরবানী; আর তার সময় হল নামাযের পর। পক্ষান্তরে ঈদুল ফিত্বরের কর্ম হল ফিতরা বন্টন; আর তার সময় হল নামাযের আগে। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ কর্তৃক হাদীস বর্ণিত থাকলেও তা সহীহ নয়। *(ইগঃ ৩/১০১, তামিঃ ৩৪৭পৃঃ দ্রঃ)*

❖ ঈদের নামাযের জন্য আযান ও ইকামতঃ

ঈদের নামাযের জন্য আযান ও ইকামত নেই। তার জন্য (সূর্য-গ্রহণের নামাযের মত) 'আস্-সালাতু জামেআহ' বা অন্য কিছু বলে আহবানও নেই। বরং মহানবী ﷺ যখন ঈদগাহে উপস্থিত হতেন, তখন নামায শুরু করতেন। ইবনে আব্বাস ﵁ ও জাবের ﵁ বলেন, '(রসূল ﷺ-এর যুগে) ঈদুল ফিত্র বা ঈদুল আযহার নামাযের জন্য আযান দেওয়া হত না।' *(বুঃ ৯৬০, মুঃ ৮৮৬নং)*

জাবের বিন সামুরাহ ﵁ বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে এক-দুইবারের অধিক উভয় ঈদের নামায বিনা আযান ও ইকামতে পড়েছি।' *(মুঃ ৮৮৭, আদাঃ ১১৪৮, তিঃ ৫৩২নং)*

❖ ঈদের নামাযের জন্য সুতরাহঃ

ঈদগাহ যদি ফাঁকা মাঠ অথবা ময়দানে হয় এবং সামনে কোন জিনিসের অন্তরাল না থাকে, তাহলে ইমামের সামনে কোন সুতরাহ রেখে নিতে হবে। ইবনে উমার ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ যখন ঈদগাহে বের হতেন, তখন একটি যুদ্ধাস্ত্র (বর্শা) সঙ্গে নিতে আদেশ করতেন এবং সেটিকে তাঁর সামনে রাখা হত; অতঃপর তিনি সেটিকে সুতরাহ বানিয়ে নামায পড়তেন। আর লোকেরা তাঁর পিছনে থাকত। এরূপ তিনি সফরেও করতেন।' আর এখান থেকেই আমীরগণ এ কাজকে অভ্যাস বানিয়েছেন। *(আঃ ২/১৪২, বুঃ ৪৯৪, মুঃ ৫০১, আদাঃ ৬৮৭, ইমাঃ ১৩০৪-১৩০৫, বাঃ ২/২৬৯)*

ইবনে মাজার এক বর্ণনায় এ কথা বেশী আছে যে, 'তার (সুতরাহ রাখার) কারণ এই যে, ঈদগাহ ছিল শূন্য ময়দানে; যেখানে সুতরাহ বানাবার মত কিছু ছিল না।' *(সইমাঃ ১০৭৭নং)*

❖ ঈদের নামাযের পদ্ধতি ঃ

ঈদের নামাযের পদ্ধতি অন্যান্য (ফজরের) নামাযের মতই। অবশ্য এ নামাযে অতিরিক্ত কিছু তকবীর রয়েছে। সুতরাং নামাযী কানের উপরি ভাগ পর্যন্ত দুই হাত তুলে তাহরীমার তাকবীর দিয়ে বুকের উপরে রাখবে। অতঃপর ইস্তিফতাহর দুআ পাঠ করে পরপর ৬বার তকবীর বলবে। ইস্তিফতাহর দুআ তকবীরগুলোর পরে এবং সূরা ফাতিহা পড়ার আগে পড়লেও চলে। *(আআসাঈঃ ২৯পৃঃ দ্রঃ)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ ঈদুল ফিতর ও আযহার নামাযের প্রথম রাকআতে সাত এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তকবীর দিতেন।' *(সআদাঃ ১০১৮, হাঃ ১/২৯৮, বাঃ ৩/২৮৬)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'রুকূর দুই তকবীর ছাড়া।' *(সআদাঃ ১০১৯, সইমাঃ ১০৫৮, দারাঃ ১৭১০, বাঃ ৩/২৮৭)*

আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "ঈদুল ফিতরের (নামাযের) প্রথম রাকআতে তকবীর সাতটি এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচটি। আর উভয় রাকআতেই তকবীরের পরে হবে ক্বিরাআত।" *(আঃ ২/১৮০, সআদাঃ ১০২০, সইমাঃ ১০৫৫-১০৫৬নং, দারাঃ, বাঃ, ইআশাঃ)* অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আম্র বিন আওফ ﷺ। *(সতিঃ ৪৪২, সইমাঃ ১০৫৭, ইখুঃ ১৪৩৮-১৪৩৯নং, দারাঃ, বাঃ)*

উপরোক্ত বর্ণনাগুলি একটি অন্যকে শক্তিশালী করে এবং সব মিলে 'সহীহ' বা বিশুদ্ধ হাদীসের মান লাভ করে। *(ইগঃ ৩/১০৬-১১১ দ্রঃ)*

উল্লেখিত আমল ছিল সাহাবী আবূ হুরাইরা ﷺ-এর। *(মাঃ, বাঃ ৩/২৮৮, ইআশাঃ)* ইবনে আব্বাস ﷺ ঈদের নামাযের প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ৭ তকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে রুকূর তকবীর সহ ৬ তকবীর দিতেন। আর সকল তকবীর দিতেন ক্বিরাআতের পূর্বে। *(ইআশাঃ ৫৭০৩)*

পক্ষান্তরে ইবনে আম্র ও আয়েশার হাদীসে *(দারাঃ ১৭০৪, ১৭১২, ১৭১৪, বাঃ ৩/২৮৫)* "তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া (৭ তকবীর)" অতিরিক্ত শব্দগুলি যয়ীফ হওয়ার সাথে সাথে আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজার বর্ণনায় উল্লেখ হয় নি। অল্লাহু আ'লাম।

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে ৯+৪ তকবীর বর্ণিত হয়েছে। যেমন তাঁর উক্তি, 'যার ইচ্ছা সে ৭, যার ইচ্ছা সে ৯, যার ইচ্ছা সে ১১ এবং যার ইচ্ছা সে ১৩ তকবীর দিবে।' তবে ৭+৫ তকবীরের বর্ণনাই সব চাইতে বেশী শুদ্ধ। সুতরাং বলা যায় যে, এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস ﷺ-এর নিকট প্রশস্ততা ছিল। আর সহীহ সূত্রে যা বর্ণিত, তাই তিনি বৈধ মনে করেন। অল্লাহু আ'লাম। *(ইগঃ ৩/১১১-১১২ দ্রঃ)*

অতিরিক্ত এই তকবীরগুলো বলা কিন্তু সুন্নত। কেউ বললে তার সওয়াব পাবে এবং না বললে তার কোন পাপ হবে না। অবশ্য এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে তা ত্যাগ করা উচিত নয়। যাতে অন্যান্য নামায থেকে ঈদের নামায পৃথক বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত হয়। *(মুগনী ৩/২৭৫, আআসাঈঃ ৬পৃঃ)*

এই ভিত্তিতে যদি কেউ ভুলে গিয়ে তকবীরগুলো ছেড়ে দিয়ে ক্বিরাআত শুরু করে ফেলে, তাহলে তা আর ফিরিয়ে বলতে হবে না। কারণ, তা সুন্নত এবং তার নির্দিষ্ট স্থান ছুটে গেছে। যেমন যদি কেউ ভুলে ইস্তিফতাহর দুআ ছেড়ে ক্বিরাআত শুরু করে দেয়, তাহলে তারও কোন ক্ষতি হয় না। আর এর জন্য সহু সিজদাও লাগবে না। *(আযকার, নওবী ১৫৬পৃঃ, নাআঃ ৩/৩০০, আআসাঈঃ ১১পৃঃ)*

উক্ত তকবীর দেওয়ার সময় প্রত্যেক বারে হাত তোলার ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই; না (মহানবী ﷺ থেকে) মারফূ এবং না (কোন সাহাবী থেকে) মাওকূফ। *(তামিঃ ৩৪৯, উদ্দাহ ১৪৭পৃঃ টীকা)* তবে কোন কোন আহলে ইল্ম বলেন যে, ঐ সময় হাত তুলতে হবে। আত্বা বলেন, 'প্রত্যেক তকবীরের সময় রফয়ে য়্যাদাইন করবে।' *(বাঃ ৩/২৯৩)* ইমাম মালেক বলেন, 'প্রত্যেক তকবীরের সময় রফয়ে য়্যাদাইন কর। তবে এ ব্যাপারে আমি কিছু শুনি নি।' *(ফিরয়্যাবী, ইগঃ ৩/১১৩)*

অবশ্য তকবীর দেওয়ার সময় রফয়ে য়্যাদাইনের ব্যাপারে ওয়াইল বিন হুজ্র কর্তৃক বর্ণিত একটি ব্যাপক হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন, 'নবী ﷺ তকবীরের সাথে তাঁর হাত দুটিকে তুলতেন।' *(আঃ ৪/৩১৬, দাঃ ১২৩২, ইগঃ ৬৪১নং)* ইমাম আহমাদ বলেন, 'আমি মনে করি যে, এগুলিও ঐ হাদীসের আওতায় পড়বে।' *(ইগঃ ৩/১১৪)*

মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করে নিঃশব্দে তকবীর বলবে; সশব্দে নয়। কারণ, মুক্তাদীর সশব্দে তকবীর বলা বিদআত। *(মুবিঃ ৩৩২পৃঃ)*

পক্ষান্তরে প্রত্যেক তকবীরের পরে কোন যিক্র বা দুআ পাঠের ব্যাপারে মহানবী ﷺ কর্তৃক কিছু বর্ণিত হয় নি। তবে ইবনে মাসউদ رضي الله عنه-এর মত হল যে, তকবীরগুলোর মাঝে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি এবং নবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ করতে হয়। *(বাঃ ৩/২৯১, ইগঃ ৬৪২, তামিঃ ৩৫০পৃঃ)*

❖ ঈদের নামাযের ক্বিরাআত ঃ

এ নামাযে উচ্চস্বরে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর প্রথম রাকআতে সূরা ক্বাফ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ক্বামার পড়া সুন্নত। *(আঃ ৫/৭, মুঃ ৮৯১, আদাঃ ১১৫৪, তিঃ ৫৩৪, নাঃ ১৫৬৬, ইমাঃ ১২৮২, দাঃ ১৫৬৮নং, বাঃ ৩/২৯৪)*

অনুরূপ প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়াহ পাঠ করাও সুন্নত। এমনকি ঈদ ও জুমআহ একই দিনে সংঘটিত হলে উভয় নামাযেই উভয় সূরা পাঠ করা সুন্নত। *(মুঃ ৮৭৮, তিঃ ৫৩৩, নাঃ ১৫৬৭, ইমাঃ ১২৮১, ১২৮৩নং)*

❖ ঈদের নামাযের আগে ও পরে নামায ঃ

ঈদের নামাযের আগে-পরে কোন নামায নেই। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, 'নবী ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে বের হয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন। আর এর আগে বা পরে কোন নামায পড়লেন না।' *(আঃ ৬/৩৫৫, বুঃ ৯৮৯, মুঃ ৮৮৪, আদাঃ ১১৫৯, তিঃ ৫৩৭, ইমাঃ ১২৯১, দাঃ, বাঃ ৩/৩০২, ইখুঃ ১৪৩৬নং)* অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইবনে উমার, ইবনে আম্র এবং জাবের رضي الله عنه। *(ইগঃ ৩/৯৯-১০০ দ্রঃ)*

কিন্তু ঈদের নামায কোন কারণবশতঃ মসজিদে হলে মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়তে হবে। যেহেতু আবূ কাতাদাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদ প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে ২ রাকআত নামায পড়ে নেয়।" *(বুঃ ৪৪৪, মুঃ ৭১৪নং প্রমুখ)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "সে যেন ২ রাকআত নামায পড়ার পূর্বে না বসে।" *(বুঃ ১১৬৭, মুঃ ৭১৪নং প্রমুখ)*

ঈদগাহ বা মুসাল্লা মসজিদের মত কি না সে নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে ঈদের নামাযের পূর্বে কোন নামায পড়া বিদআত। *(মুবিঃ ৩৩২পৃঃ)*

ঈদের নামাযের আগে-পরে নামায না থাকার কথা কেবল ঈদগাহের সাথে জড়িত। যেহেতু মহানবী ﷺ ঈদের নামায শেষে যখন বাড়ি ফিরতেন, তখন তিনি ২ রাকআত নামায পড়তেন। *(আঃ ৩/২৮, ৪০, ইমাঃ ১২৯৩, হাঃ ১/২৯৭, বাঃ, ইখুঃ ১৪৬৯, ইগঃ ৩/১০০)* অবশ্য অনেক উলামা বলেছেন যে, উক্ত নামায ছিল তাঁর চাশ্তের নামায। (ঈদের দিনের কোন বিশেষ নামায নয়।) *(মাবাঃ ১৩৫/১১)*

❖ ঈদের নামায পুরো অথবা কিছু অংশ ছুটে গেলে ঃ

ইমামের তকবীর পড়তে শুরু করার পর কেউ জামাআতে শামিল হলে, সে প্রথমে তাহরীমার তকবীর দিবে। অতঃপর বাকী তকবীরে ইমামের অনুসরণ করবে এবং ছুটে যাওয়া আগের তকবীরগুলো মাফ হয়ে যাবে। *(ইবনে উষাইমীন আআসাঈঃ ৭পৃঃ)*

ইমামকে রুকূ অবস্থায় পেলে তাহরীমার তকবীর দিয়ে (সময় আছে বুঝলে রুকূর তকবীর দিয়ে) রুকূতে যাবে। যেহেতু তকবীরগুলো শেষ হওয়ার পর সে শামিল হয়েছে এবং তার যথাস্থানও ছুটে গেছে, তাই তা আর কাযা করতে হবে না। *(ঐ ১১পৃঃ)*

পক্ষান্তরে যদি কেউ কওমায় বা তার পরে জামাআতে শামিল হয়, তাহলে ইমামের দ্বিতীয় রাকআত তার প্রথম ধরে ইমাম সালাম ফিরে দিলে উঠে সে নিজের দ্বিতীয় রাকআত পূরণ করে নেবে এবং ইমাম দ্বিতীয় রাকআতে যেভাবে নামায পড়েছেন, ঠিক সেভাবেই ঐ রাকআত কাযা করবে। *(ইআশাঃ ৫৮১২নং)*

কেউ তাশাহহুদে এসে জামাআতে শামিল হলে ইমামের সাথে তাশাহহুদ পড়ে তাঁর সালাম ফিরার পর উঠে যথা নিয়মে সমস্ত তকবীর সহ ২ রাকআত নামায আদায় করে নেবে। *(মুগনী ৩/২৮৫)*

অনুরূপ যদি কারো জামাআতই ছুটে যায়, তাহলে সেও দুই রাকআত নামায কাযা পড়ে নেবে। ইমাম বুখারী বলেন, 'বাব ঃ কারো ঈদের নামায ছুটে গেলে ২ রাকআত নামায পড়ে নেবে। তদনুরূপ মহিলা এবং যারা ঘরে ও গ্রামে থেকে যায় তারাও। যেহেতু নবী ﷺ বলেন, "এ হল আমাদের ঈদ, হে মুসলিমগণ!" একদা আনাস বিন মালেক ﷺ তাঁর স্বাধীনকৃত দাস ইবনে আবী উতবাহকে আদেশ করলেন, তিনি তাঁর পরিবার ও ছেলেদেরকে জমায়েত করে শহরবাসীদের মতই তকবীর দিয়ে নামায পড়লেন।' *(বুঃ ১৯৫পৃঃ, ইআশাঃ ৫৮০২নং)*

অনুরূপভাবে ইমামের সাথে আনাস ﷺ-এর ঈদের নামায ছুটে গেলে নিজের পরিবারবর্গকে জমা করে ইমামের মতই সে নামায পড়ে নিতেন। *(ফবাঃ ২/৫৫১, কিন্তু আল্লামা*

আলবানী এটিকে যয়ীফ বলেছেন। ইগঃ ৬৪৮-নং দ্রঃ) এই মত গ্রহণ করেছেন ইমাম আত্বা, *(বুঃ ১৯৫পৃঃ, ইআশাঃ ৫৮০১নং)* হাসান, ইবরাহীম, আবু ইসহাক, হাম্মাদ প্রমুখ সলফগণ। *(ইআশাঃ ৫৮০৬-৫৮০৯নং)*

পক্ষান্তরে ঈদ হওয়ার খবর সূর্য ঢলার পর জানতে পারা গেলে, রোযা ভেঙ্গে সেদিন নামায না পরে পরের দিন সকালে যথা সময়ে নামায কাযা পড়তে হবে। উমাইর বিন আনাস তাঁর আনসারী চাচাদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা বলেন, 'একদা শওয়ালের (ঈদের) চাঁদ দেখার দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার ফলে চাঁদ না দেখা গেলে আমরা (তার পর দিন) রোযা রাখলাম। দিনের শেষভাগে একটি কাফেলা এসে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে সাক্ষি দিল যে, তারা গতকাল চাঁদ দেখেছে। তিনি লোকদের সেদিনের রোযা ভাঙ্গতে এবং পরের দিন সকালে ঈদের নামাযের জন্য বের হতে আদেশ দিলেন।' *(আঃ ৫/৫৭, আদাঃ ১১৫৭, নাঃ ১৫৫৬, ইমাঃ ১৬৫৩, ইআশাঃ, দারাঃ, বাঃ ৩/৩১৬, ইগঃ ৬৩৪নং)*

❖ ঈদের খুতবাহ ঃ

ঈদের খুতবা হবে নামাযের পর। ইবনে আব্বাস ﷺ ও ইবনে উমার ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ, আবূ বাকর, উমার ও উসমান উভয় ঈদের নামায খুতবার আগে পড়তেন।' *(বুঃ ৯৬২-৯৬৩, মুঃ ৮৮৪, ৮৮৮-নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমাদের আজকের দিনে যে কাজ প্রথম শুরু করব, তা হল নামায।----" *(বুঃ ৯৫১, মুঃ ১৯৬১নং)*

আর জাবের ﷺ বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত হয়েছি; তিনি খুতবার আগে নামায শুরু করেছেন।' *(আঃ ৩/৩১৮, মুঃ ৮৮৫, নাঃ, বাঃ ৩/২৯৬, দাঃ)*

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, নবী ﷺ ঈদুল ফিতর ও আযহার দিনে ঈদগাহে বের হতেন। তিনি প্রথম কাজ হিসাবে নামায শুরু করতেন। অতঃপর লোকদের দিকে ফিরে দন্ডায়মান হতেন। লোকেরা নিজ নিজ কাতারে বসে থাকত। তিনি তাদেরকে নসীহত করতেন, অসিয়ত করতেন এবং বিভিন্ন আদেশ দিতেন। কোন যুদ্ধের সৈন্য প্রস্তুত করার থাকলে তা করতেন। কোন কিছুর আদেশ করার থাকলে তা করতেন। অতঃপর তিনি বাড়ি ফিরতেন। তাঁর পরবর্তীকালের লোকেরাও অনুরূপ করতে থাকল। অবশেষে একদা মদীনার আমীর মারওয়ানের সাথে ঈদের নামায পড়তে ঈদুল আযহা অথবা ফিতরের দিন বের হলাম। ঈদগাহে পৌঁছে দেখি কাষীর বিন সাল্‌ত মিম্বর তৈরী করে রেখেছে। নামায শুরু করার আগেই মারওয়ান তাতে চড়তে গেলেন। আমি তাঁর কাপড় ধরে টান দিলাম। তিনিও আমাকে টান দিলেন। অতঃপর মিম্বরে চড়ে নামাযের আগেই খুতবা দিলেন। (নামাযের পর) আমি তাঁকে বললাম, 'আল্লাহর কসম! আপনি (সুন্নত) পরিবর্তন করে ফেললেন।' উত্তরে তিনি বললেন, 'আবূ সাঈদ! আপনি যা জানেন তা গত হয়ে গেছে।' আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যা জানি, তা না জানা জিনিস অপেক্ষা উত্তম।' মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, 'কক্ষনো না। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! আমি যা জানি, তার থেকে উত্তম কিছু আপনারা আনয়ন করতে পারেন না।' উত্তরে মারওয়ান বললেন, 'লোকেরা নামাযের পরে আমাদের খুতবা শুনতে বসে না। তাই নামাযের পূর্বেই খুতবা দিলাম।' *(বুঃ ৯৫৬, মুঃ ৮৮৯নং)*

❖ মিম্বরে চড়ে খুতবা ঃ

মহানবী ﷺ এবং তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ঈদগাহে মিম্বর ব্যবহার করা হত না। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, মারওয়ান ঈদের দিন মিম্বর বের করেন এবং নামাযের পূর্বে খুতবা দেন। এ দেখে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'হে মারওয়ান! আপনি সুন্নাহর বিপরীত কাজ করলেন; ঈদের দিন মিম্বর বের করেছেন। অথচ তা ইতিপূর্বে বের করা হত না। আর নামাযের আগে খুতবাও দান করেছেন!'

আবূ সাঈদ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঐ প্রতিবাদকারী কে?' লোকেরা বলল, 'অমুকের বেটা অমুক।' তিনি বললেন, 'ও তো নিজ কর্তব্য পালন করে দিল। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি কোন আপত্তিকর কাজ ঘটতে দেখে এবং নিজ হাত দ্বারা তা পরিবর্তন করার সামর্থ্য রাখে, সে যেন তা পরিবর্তন করে। তাতে সমর্থ না হলে নিজ জিভ দ্বারা, তাতেও সক্ষম না হলে নিজ অন্তর দ্বারা (ঘৃণা জানবে)। আর এটি হল দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।" *(আঃ ৩/১০, ৫২, সআদাঃ ১০০৯, তিঃ ২১৭২, ইমাঃ ১২৭৫, হাদীসটির মূল রয়েছে মুসলিমে ৪৯নং)*

কিন্তু জাবের ﷺ-এর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, 'আল্লাহর নবী ﷺ যখন (খুতবা) শেষ করলেন, তখন নেমে মহিলাদের কাছে এলেন---।' *(বুঃ ৯৬১, ৯৭৮, মুঃ ৮৮৫, আদাঃ ১১৪১নং)* এর থেকে বুঝা যায় যে, তিনি কোন উঁচু জায়গাতে চড়েই খুতবা দিতেন। সুতরাং মিম্বর ব্যবহার করা ও না করার ব্যাপারে যে প্রশস্ততা আছে, তা বলাই বাহুল্য। *(আআসাঈঃ ৩-৪পৃঃ)*

❖ খুতবা কি দিয়ে শুরু হবে?

মহানবী ﷺ তাঁর সমস্ত খুতবা 'আল-হামদু লিল্লাহি---' দিয়ে শুরু করতেন। কোন একটি হাদীস দ্বারা এ কথা সংরক্ষিত নেই যে, তিনি তাঁর উভয় ঈদের খুতবা তকবীর দিয়ে শুরু করতেন। *(মাফাঃ ইবনে তাইমিয়্যাহ ২২/৩৯৩, যামাঃ ১/৪৪৭ দ্রঃ)*

❖ খুতবার মাঝে মাঝে তকবীর ঃ

এ কথাও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয় যে, তিনি তাঁর খুতবার মাঝে মাঝে তকবীর পাঠ করতেন। এ বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, তা যয়ীফ। *(ইগঃ ৬৪৭, যইমাঃ ২৬৪নং দ্রঃ)* সুতরাং ঈদের খুতবাকে তকবীর দিয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করা বৈধ নয়। বাকী থাকল যুহরীর এই কথা যে, 'ঘর থেকে বের হওয়ার পর থেকে ঈদগাহ পর্যন্ত ইমাম উপস্থিত হওয়া অবধি লোকেরা ঈদের তকবীর পাঠ করত। ইমাম উপস্থিত হলেই সকলে চুপ হয়ে যেত। অতঃপর ইমাম তকবীর দিলে সকলে আবার তকবীর দিত।' *(ইআশাঃ, ইগঃ ৩/১২১)* এ কথায় ' ইমাম তকবীর দিলে সকলে আবার তকবীর দিত' বলে নামায শুরু করার তাহরীমার তকবীরকে বুঝানো হয়েছে; খুতবার ভিতরের তকবীর নয়। *(মাবাঃ ১৩৬/২২)*

❖ খুতবা একটি না দুটি?

স্পষ্টতঃ যা বুঝা যায়, তাতে মনে হয় যে, মহানবী ﷺ-এর ঈদের খুতবা ছিল একটি। সাহাবী জাবের ﷺ বলেন, 'ঈদুল ফিতরের দিন নবী ﷺ দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। তিনি প্রথমে নামায পড়লেন, তারপর খুতবা দিলেন। খুতবা শেষ করে নেমে এসে তিনি মহিলাদের

নিকট এলেন এবং তাদেরকে উপদেশ দিলেন। এই সময় তিনি বিলালের হাতে ভর করে দাঁড়িয়ে ছিলেন।--' *(বুঃ ৯৬১, ৯৭৮, মুঃ ৮৮৫, আদাঃ ১১৪১নং)*

বলা বাহুল্য, উক্ত হাদীসে একটি মাত্র খুতবার কথা উল্লেখ হয়েছে। আর মহিলাদেরকে উপদেশ দান করাটাকে দ্বিতীয় খুতবা গণ্য করা সম্ভব নয়। কারণ, তিনি তাদেরকে নিজ নসীহত শুনাবার উদ্দেশ্যে তাদের কাছে নেমে এসেছিলেন। আর এ কথা কল্পনা করা যায় যে, ঈদের বিশাল জন-সমাবেশে মহিলারা পুরুষদের পিছনে থাকলে দূর থেকে তারা তাঁর খুতবা শুনতে পাচ্ছিল না। (অতএব খুতবা একটাই; শব্দ শুনাবার উদ্দেশ্যে কেবল জায়গার পরিবর্তন করা হয়েছিল।)

শায়খ ইবনে উষাইমীন (রঃ) বলেন, 'বুখারী-মুসলিম প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস নিয়ে যে ব্যক্তি চিন্তা-গবেষণা করবে, তার নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, নবী ﷺ একটার বেশী খুতবা দেননি।' *(মুমঃ ৫/১৯২)*

পক্ষান্তরে 'ঈদের খুতবা দুটি; মাঝখানে বসে ইমাম তা দুইভাগে ভাগ করে নেবে' বলে যে হাদীস বর্ণিত আছে, তা যয়ীফ। *(তামিঃ ৩৪৮পৃঃ, যইমাঃ ২৬৫নং দ্রঃ)* ইমাম নওবী বলেন, 'খুতবা ডবল হওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীস বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নেই।' *(ফিসুঃ ১/২৮২)*

❖ ঈদের খুতবায় মহিলাদের জন্য খাস নসীহত ঃ

ঈদের খুতবায় মহিলাদের জন্য খাস নসীহত করা সুন্নত। যেমন এ কথা পূর্বে উল্লেখিত জাবের ﷺ-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অতএব খুতবা মাইকে হলে খুতবার শেষাংশকে মহিলাদের জন্য খাস করবেন ইমাম। কিন্তু যদি মাইকে না হয় এবং মহিলারা পিছন থেকে শুনতে পাচ্ছে না বলে আশঙ্কা হয়, তাহলে তিনি তাদের নিকটবর্তী হবেন। তাঁর সাথে থাকবে দুই বা একটি লোক এবং যথাসাধ্য তিনি ওয়ায করবেন তাদের জন্য। *(আআসাঈঃ ৮পৃঃ)*

❖ খুতবা শোনার গুরুত্ব ঃ

ঈদের খুতবা দেওয়া ও শোনা (জুমআর খুতবার মত ওয়াজেব নয়; বরং তা) সুন্নত। আব্দুল্লাহ বিন সায়েব বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলাম। নামায শেষ করে তিনি বললেন, "আমরা খুতবা দোব; সুতরাং যে ব্যক্তি খুতবা শোনার জন্য বসতে পছন্দ করে সে বসে যাক্। আর যে ব্যক্তি চলে যেতে পছন্দ করে সে চলে যাক্।" *(সআদাঃ ১০২৪, সইমাঃ ১০৬৬, হাঃ ১/২৯৫, ইখুঃ ১৪৬২, ইগঃ ৬২৯, সজাঃ ২২৮৯নং, তামিঃ ৩৫০পৃঃ)*

অবশ্য মুমিনের জন্য উচিত এই যে, প্রত্যেক মঙ্গলের প্রতি সে আগ্রহী হবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য উপকারী বিষয়ের প্রতি যত্নবান হবে। আর খুতবা শোনা নিশ্চয় বড় উপকারী বিষয়।

❖ ঈদের দুআ কি?

উম্মে আত্বিয়্যাহর হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, "ঋতুমতী মহিলারাও মুসলিমদের (ঈদের) জামাআত ও দুআতে উপস্থিত হবে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তাদের দুআর মত দুআ করবে।"

ঐ দুআ কি ধরনের দুআ? ঐ দুআ কি মহানবী ﷺ নামাযের পরে দুই হাত তুলে করতেন? নাকি তিনি খুতবার শেষে হাত তুলে দুআ করতেন এবং সাহাবাগণও হাত তুলে তাঁর দুআর উপর 'আমীন-আমীন' বলতেন?

শায়খ উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (রঃ) বলেন, (হাদীসে উল্লেখিত) "মুসলিমদের দুআ"-এই কথাটিকে ঈদের নামাযের পর দুআ করার দলীল মনে করা হয়; যেমন দুআ (মুনাজাত) করা হয় পাঁচ অক্ত্ নামাযের পর। কিন্তু এটি (দ্বিধামুক্ত নয়; বরং) যুক্তি সাপেক্ষ। কারণ, উভয় ঈদের নামাযের দুআ নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত নয় এবং উক্ত নামাযের পরে দুআর কথাও কেউ বর্ণনা করেন নি। বরং তাঁর তরফ থেকে যা প্রমাণিত তা এই যে, তিনি নামাযের পর খুতবা দিতেন এবং উভয়ের মাঝে কোন অন্য বিষয় দিয়ে পৃথক করতেন না। সুতরাং তাঁর সাধারণ ও ব্যাপক উক্তি "মুসলিমদের দুআ"কে দলীলরূপে ধরে থাকা সঠিক নয়। প্রকাশতঃ ঐ দুআ বলতে খুতবার মাঝে যিক্র-আযকার ও ওয়ায-নসীহতকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু 'দাওয়াহ' শব্দটি ব্যাপক। আর আল্লাহই অধিক জানেন। *(মিমাঃ ৫/৩১)*

অনুরূপভাবে নামাযের ভিতরেও বহু দুআ আছে, যাতে মহিলারা শরীক হতে পারবে; যেমন নামাযীরা তাতে শরীক হবে। এ ছাড়া খুতবাতেও দুআ হয়, যাতে তারা 'আমীন-আমীন' বলে শরীক হবে। অপর দিকে নামায বা খুতবার পর হাত তুলে জামাআতী মুনাজাত দলীল সাপেক্ষ। আর তার কোন দলীল পাওয়া যায় না।

❖ রাস্তা পরিবর্তন করা ঃ

মসজিদে নববী থেকে মদীনার ঈদগাহ ১০০০ হাত দূরে অবস্থিত ছিল। (ফবাঃ ২/৫২১ দ্রঃ) মহানবী ﷺ ঐ ঈদগাহে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হতেন। কিন্তু ফিরার পথে রাস্তা পরিবর্তন করতেন। অর্থাৎ, যাবার সময় যে পথে যেতেন, সে পথে বাড়ি না ফিরে অন্য পথ ধরে বাড়ি ফিরতেন। জাবের ﷺ বলেন, 'ঈদের দিন হলে তিনি রাস্তা পরিবর্তন করতেন।' *(বুঃ ৯৮৬নং)*

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ যখন ঈদের দিনে এক পথে বের হতেন, তখন অন্য পথে বাড়ি ফিরতেন।' *(তিঃ, হাঃ, দাঃ ১৫৭৪, সজাঃ ৪৭১০নং)* অনুরূপ বর্ণিত আছে আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কর্তৃকও। *(সআদাঃ ১০২৫নং)*

তাঁর এই রাস্তা পরিবর্তনের পশ্চাতে ছিল একাধিক যুক্তি ও হিকমত। যেমন; এতে রয়েছে ইসলামী প্রতীকের সম্যক্ বহিঃপ্রকাশ হবে। উভয় রাস্তা তাঁর জন্য সাক্ষ্য দেবে। উভয় পথের মুনাফিক বা ইয়াহুদীদেরকে ক্ষুব্ধ হবে। উভয় পথের লোকেদেরকে সালাম দেওয়া হবে। অথবা তাদেরকে কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্য অথবা তাদেরকে কিছু দান করার জন্য অথবা সাক্ষাৎ করে নিজ আত্মীয়তার বন্ধন বজায় করার জন্য। *(ফবাঃ ২/৫৪৮, যামাঃ ১/৪৪৯, মুমঃ ১৭১-১৭২)*

❖ ঈদের মুবারকবাদ ঃ

ঈদে একে অপরকে মুবারকবাদ দেওয়া ঈদের অন্যতম আদব ও বৈশিষ্ট্য। এই মুবারকবাদ সাহাবা ﷺ-দের যুগে প্রচলিত ও পরিচিত ছিল। জুবাইর বিন নুফাইর বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবাগণ ঈদের দিন একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ হলে বলতেন, 'তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না অমিন্ক।' *(ফবাঃ ২/৫১৭, তামিঃ ৩৫৪-৩৫৫পৃঃ)*

মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ আলহানী বলেন, আমি আবু উমামা বাহেলী ﷺ ও নবী ﷺ-এর অন্যান্য সাহাবাগণের সাথে ছিলাম। তাঁরা যখনই (ঈদের নামায পড়ে) ফিরে আসতেন, তখনই একে অপরকে বলতেন, 'তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না অমিন্‌ক।' *(যাইল বাঃ ৩/৩২০)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আমি আবূ উমামাকে ঈদে তাঁর সাথীদের জন্য বলতে শুনেছি, 'তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না অমিন্‌কুম।' *(তামিঃ ৩৫৫পৃঃ)*

অবশ্য ঈদী মুবারকবাদের শব্দাবলী দেশের প্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ী হবে; তবে তাতে এমন শব্দ হলে চলবে না, যা শরীয়তে হারাম। অথবা তা বিজাতীর কাছ থেকে ধার করা বা অনুকরণ করা; অর্থাৎ, তাদের পাল-পর্বনে পরস্পরকে অভিনন্দন জানানোর শব্দ যেন না হয়। *(আআসাঈঃ ৭পৃঃ, মাবাঃ ১৩৬/২৬)*

প্রকাশ যে, ঈদের নামাযের পর খাস ঈদী মুআনাকা বা কোলাকুলি শরীয়তে বিধেয় নয়। যেমন ঈদের নামাযের পর কবরস্থানে গিয়ে খাস কবর-যিয়ারত বিদআত। *(আজাঃ আলবানী ২৫৮পৃঃ, মুবিঃ ১৫৪পৃঃ)*

❖ ঈদের খুশী প্রকাশঃ

ঈদের দিনে আনন্দ ও খুশীর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো দ্বীনের অন্যতম প্রতীক। এ দিনে পরিবার-পরিজনের প্রতি বিভিন্ন প্রকার খরচ ও প্রশস্ততা প্রদর্শন করা উচিত, যাতে তাদের মন-প্রাণ আনন্দিত হয় এবং ইবাদতের কষ্ট থেকে দেহ স্বস্তি, বিরতি ও প্রশান্তি লাভ করতে পারে। *(ফবাঃ ২/৫১৪ দ্রঃ)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঈদের দিন আল্লাহর রসূল ﷺ আমার নিকট এলেন। সেই সময় আমার কাছে দুটি কিশোরী 'দুফ' (৪) বাজিয়ে বুআয (যুদ্ধের বীরত্বের) গীত গাচ্ছিল। অবশ্য তারা গায়িকা ছিল না। তা দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি কাপড় ঢাকা দিয়ে বিছানায় শুয়ে গেলেন। ইত্যবসরে আবূ বাক্‌র ﷺ প্রবেশ করলেন এবং আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'শয়তানের সুর আল্লাহর রসূলের কাছে?'

(এ কথা শুনে) আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ চেহারা খুলে আবূ বাক্‌রের দিকে ঘুরে বললেন, "ওদেরকে ছেড়ে দাও, হে আবূ বাক্‌র। আজ তো ঈদের দিন। প্রত্যেক জাতির ঈদ আছে। আর আজ হল আমাদের ঈদ।" অতঃপর তিনি একটু অন্যমনস্ক হলে আমি তাদেরকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলাম। তখন তারা বেরিয়ে গেল।

মা আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন, হাবশীগণ ঈদের দিন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মসজিদে যুদ্ধাস্ত্র (বর্শা) নিয়ে খেলা করত। কখনো বা আমি তাঁর কাছে ঐ খেলা দেখতে চাইতাম, আর কখনো বা তিনি নিজে বলতেন, "তুমি কি দেখতে চাও?" আমি বলতাম, 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি আমাকে আমার হুজরার দরজায় তাঁর পিছনে দাঁড় করাতেন। আমি (তাঁর আড়াল থেকে) তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে ঐ খেলা দেখতাম। তিনি তাঁর কাঁধকে নিচু করে দিতেন। আর আমার গাল তাঁর গালের সাথে লেগে যেত। নিজ চাদর দিয়ে আমাকে পর্দা করতেন।

---

(৪) ঢপঢপে আওয়াজবিশিষ্ট একমুখো ঢোলক বিশেষ।

আর খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে তিনি বলতেন, "শাবাশ! হে বানী আরফিদাহ!" আর ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের খেলা দেখতাম, যতক্ষণ না আমি নিজে তা দেখা বন্ধ করতাম এবং দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। তখন তিনি প্রশ্ন করতেন, "যথেষ্ট হয়েছে?" আমি বলতাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বলতেন, "অতএব চলে যাও।" সুতরাং তোমরা আন্দাজ কর খেলা-প্রিয়া উদীয়মানা নব কিশোরীর খেলার প্রতি আগ্রহ কত! *(আঃ, বুঃ ৯৫০, ৫২৩৬, মুঃ ৮৯২, নাঃ)* আর সেদিন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছিলেন, "মদীনার ইয়াহুদ জেনে নিক যে, আমাদের দ্বীনে উদারতা আছে (এবং সংকীর্ণতা নেই)। নিশ্চয় আমি সুদৃঢ় উদার দ্বীনসহ প্রেরিত হয়েছি।" *(আঃ ৬/১১৬, ২৩৩, সিসঃ ৬/২/১০২৩, আযিঃ ২৭৪পৃঃ)*

বলা বাহুল্য, মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, তারা তাদের ঈদ পালন করে খুশী করবে এবং সেই খুশী প্রকাশের ফলে তারা সওয়াব-প্রাপ্তও হবে! কেননা, আনন্দের এই বহিঃপ্রকাশ দ্বীনের একটি প্রতীক।

কিন্তু জ্ঞাতব্যের বিষয় যে, ঐ খুশী প্রকাশ হতে হবে শরীয়তের গন্ডীর ভিতরে সীমাবদ্ধ উপকরণের মাধ্যমে; আর তা হল কেবল দুফ বাজিয়ে ছোট ছোট মেয়েদের এমন গীত গেয়ে, যা অসার বা অশ্লীল নয়, শির্কী বা বিদআতী তথা শরীয়ত-বিরোধী নয়। আর তা শোনার মাধ্যমেও আনন্দ উপভোগ করায় দোষ নেই। বলা বাহুল্য, এ ছাড়া গান-বাজনা করা ও শোনা হারাম।

ঈদের এই পবিত্র খুশীতে অবৈধ খেলা ও ফিল্ম্ দর্শন-প্রদর্শন, যুবক-যুবতীর খেলা ও অবাধ-ভ্রমণ, ছবি তোলা এবং হারাম গান-বাদ্য ব্যবহার করার মাধ্যমে অবশ্যই বিধেয় খুশীর বহিঃপ্রকাশ হয় না। আসলে খুশীর নামে তা হয় শয়তানী কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী বিলাস-কর্ম। *(মাবাঃ ১৩৬/২৭)* সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে পানাহ দিন। আমীন।

প্রকাশ থাকে যে, আতশ বা ফটকাবাজি করে খুশী প্রকাশ করা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। যেহেতু এ খেলাতে রয়েছে অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বন, এতে অহেতুক অর্থ অপচয় হয়, এতে আগুন নিয়ে খেলা করা হয় এবং বিপদের আশঙ্কা থাকে অনেক বেশী।

কোন কোন আল্লাহ-ওয়ালা লোক বলেছেন, মানুষ আল্লাহ থেকে গাফেল হয় বলেই গায়রুল্লাহ নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। অতএব গাফেল নিজ খেল-তামাশা ও কুপ্রবৃত্তি নিয়ে আনন্দিত হয়। আর জ্ঞানী নিজ মাওলাকে নিয়ে আনন্দিত হয়। *(ইআইআসিঃ ৮৪পৃঃ)*

জ্ঞাতব্য যে, কিছু লোক আছে যারা ঈদ নিয়ে এই জন্য আনন্দিত হয় যে, রমযান শেষ হয়ে গেছে এবং রোযা আর রাখতে হবে না। অনেকের মাথা থেকে রমযান ও রোযার যেন বোঝ নেমে যায়। অথচ এমন আচরণ বড় ভ্রান্ত। আসলে মুমিনগণ ঈদ নিয়ে খুশী হয় এই জন্য যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে রোযার মাস পূর্ণ করার এবং সম্পূর্ণ মাস রোযা রাখার তওফীক দান করেছেন। যেহেতু তারা এরই মাধ্যমে তাদের মহান প্রভুকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস লাভ করেছে। পক্ষান্তরে তারা এই জন্য আনন্দিত হয় না যে, রোযা শেষ করে ফেলেছে, যে রোযাকে বহু লোকে একটি বড় বোঝা মনে করে থাকে। *(দুরূঃ ১০০পৃঃ)*

দ্বীন-দরদী ভাই মুসলিম! এই খুশীর মুহূর্তে সম্ভব হলে পার্শ্ববর্তী গরীবদেরকে ভুলে যাবেন না। কত গরীব শুধু এই জন্য খুশী করতে পারে না যে, তার ছোট ছেলে-মেয়ের নতুন

জামা নেই, কারো বা গোসল করার জন্য সাবান নেই অথবা শখের একদিন মাখার মত আতর নেই। এগুলি ছোট হলেও যদি ঐ দিন তাদেরকে দান করা হয়, তাহলে সেই দিনে খুশী হয় তারা, সেই সাথে খুশী হয় তাদের মা-বাপরা। অতএব আল্লাহ আপনাকে সামর্থ্য দিলে আপনি তাদের সেই শ্রেণীর খুশীর উপকরণ করে দিতে ভুল করবেন না। আল্লাহ আপনাকে নেক বদলা দিন। আমীন।

ঈদ হল একটি অপূর্ব সুযোগ, যে সুযোগে মুমিন তার অন্তর-মন থেকে সেই সকল বিদ্বেষ ও ঈর্ষা থেকে মুক্ত করতে পারে, যা সে ইতিপূর্বে তার কোন মুসলিম ভায়ের প্রতি পোষণ করেছিল। সুতরাং ঈদ হল, মুসলমানদের আপোসে সম্প্রীতি ও একে অন্যের জন্য মন-প্রাণ পরিষ্কার ও উদার করে দেওয়ার এক পরম অবকাশ।

❖ জুমআর দিনে ঈদ হলে ঃ

জুমআর দিন ঈদ হলে যে ব্যক্তি ঈদের নামায পড়বে, সে ব্যক্তির জন্য জুমআহ আর ওয়াজেব থাকবে না। যায়দ বিন আরকাম ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ ঈদের নামায পড়লেন এবং জুমআহ না পড়ার অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি জুমআহ পড়তে চায় সে পড়বে।” *(সআদাঃ ৯৪৫, নাঃ ১৫৯২, ইমাঃ ১৩১০, ইখুঃ ১৪৬৪নং)*

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমাদের আজকের এই দিনে দুটি ঈদ সমবেত হয়েছে। সুতরাং যার ইচ্ছা তার জন্য জুমআহ থেকে ঈদের নামায যথেষ্ট। অবশ্য আমরা জুমআহ পড়ব।” *(সআদাঃ ৯৪৮, ইমাঃ ১৩১১নং)*

এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম সাহেবের জন্য মুস্তাহাব জুমআহ কায়েম করা। যাতে তারা জুমআহ পড়তে পারে যারা তা পড়তে চায় এবং তারাও পড়তে পারে যারা ইদের নামায পড়তে পারে নি। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন, “অবশ্য আমরা জুমআহ পড়ব।”

জানা জরুরী যে, যে ব্যক্তি (ঈদের নামায পড়ে) অনুমতি পেয়ে জুমআহ পড়বে না, সে ব্যক্তির জন্য যোহরের নামায মাফ নয়। কারণ, যোহর হল ওয়াক্তী ফরয নামায। আর তা ত্যাগ করা সম্ভব নয়। *(আআসাঈঃ ৬-৭পৃঃ, ফাসিঃ মুসনিদ ১১৫পৃঃ)*

পক্ষান্তরে ইবনে যুবাইর ﷺ-এর আমল বর্ণিত যে, তিনি ঈদের দিন আসর পর্যন্ত ঈদের নামায ছাড়া অন্য কিছু পড়েন নি এবং জুমআর জন্যও বের হন নি। *(সআদাঃ ৯৪৬-৯৪৭নং)* কিন্তু হতে পারে যে, তিনি যোহরের নামায ঘরেই পড়ে নিয়েছিলেন। অথবা তিনি ঈদের সময় জুমআর নিয়তে ২ রাকআত নামায পড়েছিলেন এবং ঈদের নামাযকে তারই অনুসারী করে নিয়েছেন। *(আমাঃ ৩/২৮৭-২৮৯)* (যেমন তাওয়াফে ইফাযাহ ও বিদায়ী তওয়াফ একই সময়ে ইফাযার নিয়তে করলে একটি তওয়াফই যথেষ্ট।) ইবনে খুযাইমার বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি (জুমআহ ও) ঈদের দিন ঈদের নামায পড়ার জন্য বের হতে দেরী করলেন। পরিশেষে সূর্য যখন উঁচুতে এল তখন তিনি বের হয়ে মিম্বরে চড়ে দীর্ঘ খুতবাহ দিলেন। অতঃপর ২ রাকআত নামায পড়লেন এবং আর জুমআহ পড়লেন না। *(ইখুঃ ১৪৬৫নং)*

ঈদ সংক্রান্ত আরো কিছু মাসায়েল

❖ ঈদের চাঁদ ঃ

এ কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, মেঘ বা অন্য কোন কারণে চাঁদ যথাসময়ে না দেখা গেলে মাসের তারীখ ৩০ পূর্ণ করে নিতে হবে। অবশ্য ঈদের চাঁদ প্রমাণ করার জন্য ২ জন মুসলিমের সাক্ষ্য প্রয়োজন। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখে রোযা ছাড়। যদি চাঁদ না দেখা যায়, তাহলে মাস ৩০ পূর্ণ করে নাও। কিন্তু যদি দুই জন মুসলিম সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তোমরা রোযা রাখ ও রোযা ছাড়।" *(আঃ ৪/৩২১, নাঃ, দারাঃ, সনাঃ ১৯৯৭, ইগঃ ৯০৯নং)*

পক্ষান্তরে রোযার মাসের শুরু হওয়ার কথা প্রমাণ করার জন্য এ কথা প্রমাণিত যে, আল্লাহর রসূল ﷺ একজন লোকের সাক্ষি নিয়ে রোযা রেখেছেন। *(আদাঃ ২৩৪২, দাঃ, দারাঃ, বাঃ ৪/২১২, ইগঃ ৯০৮নং)*

❖ কেউ একা চাঁদ দেখলে ঃ

ঈদের চাঁদ কেউ একা দেখলে সে কিন্তু একা একা ঈদ করতে পারে না। বরং চাঁদ দেখা সত্ত্বেও তার জন্য রোযা রাখা ওয়াজেব। কেননা, শওয়ালের চাঁদ দুই জন মুসলিম দেখার সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রমাণ হয় না। তা ছাড়া মহানবী ﷺ বলেন, "ঈদ সেদিন, যেদিন লোকেরা ঈদ করে। কুরবানী সেদিন, যেদিন লোকেরা কুরবানী করে।" *(সতিঃ ৬৪৩, ইগঃ ৯০৫নং)* যেহেতু শরীয়তে জামাআতের বড় মর্যাদা আছে।

মতান্তরে যে ব্যক্তি একা চাঁদ দেখবে সে পরের দিন রোযা রাখবে না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখে রোযা ছাড়।" তবে প্রকাশ্যে নয়, বরং গোপনে ইফতার করবে সে। যাতে সে জামাআত-বিরোধী না হয়ে যায়। অথবা তাকে কেউ অসঙ্গত অপবাদ না দিয়ে বসে। আর আল্লাহই অধিক জানেন। *(মুমঃ ৬/৩২৯, আআসাঈ ২৫পৃঃ, আসাইঃ ৪২পৃঃ)*

❖ রোযা ২৮টি হলে ঃ

২৮ দিন রোযা রাখার পর শওয়ালের চাঁদ শরয়ী সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হলে জানতে হবে যে, রমযান মাসের প্রথম দিন অবশ্যই ছুটে গেছে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে ঐ দিন ঈদের পরে কাযা করতে হবে। কারণ, চান্দ্র মাস ২৮ দিনের হতেই পারে না। হয় ৩০ দিনে মাস হবে, নচেৎ ২৯ দিনে। *(ফাসিঃ মুসনিদ ১৫পৃঃ)*

❖ রোযা ৩১টি কখন হয়?

পূর্ব দিককার (প্রাচ্যের) দেশগুলিতে চাঁদ ১ অথবা ২ দিন পরে দেখা দেয়। এখন ২৯শে রমযান চাঁদ দেখার পর অথবা ৩০শে রমযান ঐ দিককার কোন দেশে সফর করলে সেখানে গিয়ে দেখবে তার পরের দিনও রোযা। সে ক্ষেত্রে তাকে ঐ দেশের মুসলিমদের সাথে রোযা রাখতে হবে। অতঃপর তারা ঈদ করলে তাদের সাথে সেও ঈদ করবে; যদিও তার রোযা ৩১টি হয়ে যায়। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, ([illegible])

অর্থাৎ, অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে। *(কুঃ ২/১৮৫)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "রোযা সেদিন, যেদিন লোকেরা রোযা রাখে। ঈদ সেদিন, যেদিন লোকেরা ঈদ করে।" *(তিঃ, ইগঃ ৯০৫, সিসঃ ২২৪নং)*

কিন্তু যদি কেউ পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ২৮শে রমযান সফর করে, অতঃপর তার পর দিনই সেখানে ঈদ হয়, তাহলে সেও রোযা ভেঙ্গে লোকদের সাথে ঈদ করবে। অবশ্য তার পরে সে একটি রোযা কাযা রাখবে। কারণ, মাস ২৯ দিনের কম হয় না। পক্ষান্তরে যদি ২৯শে রমযান সফর করে তার পরের দিন ঈদ হয়, তাহলে তাদের সাথে ঈদ করার পর তাকে আর কোন রোযা কাযা করতে হবে না। কারণ, তার ২৯টি রোযা হয়ে গেছে এবং মাস ২৯ দিনেও হয়। *(ইবনে বায, ফাসিঃ মুসনিদ ১৬পৃঃ)*

পরন্তু যদি কেউ ঈদের দিনে ঈদ করে প্রাচ্যের দেশে সফর করে এবং সেখানে গিয়ে দেখে সেখানকার লোকেদের রোযা চলছে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাকে পানাহার বন্ধ করতে হবে না এবং রোযা কাযা করতেও হবে না। কেননা, সে শরয়ী নিয়ম মতে রোযা ভেঙ্গেছে। অতএব এ দিন তার জন্য পানাহার বৈধ হওয়ার দিন। *(আআসাঈঃ ২৮পৃঃ)*

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রমযান পরে কি?

রমযান বিদায় নিল। ফিরে আসবে আবার প্রায় এক বছর পর। রমযান চলে গেল। কিন্তু রমযান পরে মুসলিমের অবস্থা কি, কর্তব্য কি? রমযানের আমল ভরা দিনগুলি শেষ হয়ে গেল, কিন্তু মুমিনের আমল তো কোন দিনকার জন্য শেষ হওয়ার নয়। যেহেতু যিনি রমযানের প্রভু, তিনিই শা'বান ও শওয়াল তথা বাকী মাসসমূহ ও সারা বছরের প্রভু।

মুসলিমের কর্তব্য হল, রমযান মাসে যে সব নেক আমলে অভ্যাসী হয়েছে সেই সব আমল বন্ধ না করে একটানা নিয়মিত করে যাওয়া। মহান আল্লাহ বলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, মৃত্যু আসা অবধি তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাক। *(কুঃ ১৫/৯৯)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সেই আমল অধিক পছন্দনীয়, যা লাগাতার করে যাওয়া হয়; যদিও বা তা পরিমাণে কম হয়।" *(বুঃ ৬৪৬৫, মুঃ ৭৮৩নং প্রমুখ)*

শেষ হয়ে গেল সবুরের মাস। আর সবুর হল পরহেযগার মানুষদের সম্বল। বলা বাহুল্য, যেমন সে এ মাসে বড় প্রচেষ্টা ও শ্রম দিয়ে আমল-ইবাদত করেছে, তেমনি পরের

মাসগুলিতেও যেন সেই প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম বাকী থাকে। তার সমস্ত আমল এমন হওয়া উচিত, যেন সে তা রমযানেই করছে।

রোযার মাস বিদায় নিয়ে চলে গেল। কিন্তু রোযা বিদায় নেয় নি। যেহেতু রমযানের রোযা ছাড়াও অন্যান্য সুন্নত ও নফল রোযা রয়েছে; তা যেন তার আমলের খাতা থেকে বাদ না পড়ে।

নামায ও কিয়ামের মাস ফুরিয়ে গেল। কিন্তু নফল নামায ও কিয়াম কেবল রোযার মাসেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রত্যেক রাতের একটি অংশ তাহাজ্জুদের জন্য মুসলিমের খাস হওয়া উচিত।

এই মাসে সকল মসজিদের ইমাম ও মুসল্লীগণ তাঁদের অন্যান্য (বেনামাযী) ভাইদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে মসজিদে দেখে শত খুশী হয়েছেন, যারা রমযানভর পাঁচ অক্ত ফরয নামায যথা নিয়মে আদায় করেছে, বরং তারা নিয়মিতভাবে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযও পড়েছে। পরন্তু তাঁদের আনন্দ আরো বৃদ্ধি হতে থাকে; যদি ঐ ভায়েরা উক্ত অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠিত থেকে যায়। (অর্থাৎ বার মাসই নামায পড়ে।) নচেৎ "কিয়ামতে বান্দার নিকট থেকে অন্যান্য আমলের পূর্বে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। সুতরাং নামায সঠিক হলে তার অন্যান্য আমলও সঠিক বিবেচিত হবে। (নচেৎ না।)" *(আঃ, সুআঃ, ত্বাবঃ, প্রমুখ, সিসঃ ১৩৫৮-নং)*

নেক আমল বা কোনও সৎকর্ম আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ এই যে, আমলকারী ঐ কর্মের পরে পুনরায় অন্যান্য সৎকর্ম করে থাকে। সুতরাং রমযানের পর আপনার অন্যান্য নেক আমল করতে থাকা এই কথারই লক্ষণ যে, আপনার রোযা ও তারাবীহ মহান আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। আর হ্যাঁ, খবরদার পুনরায় আপনি আপনার সেই অবস্থায় ফিরে যাবেন না, যে অবস্থা ছিল রমযানের পূর্বে। মহান আল্লাহ বলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার সুতা মজবুত করে পাকাবার পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়।" *(কুঃ ১৬/৯২)*

ভাই মুসলিম! আপনি আপনার ঔদাস্য বর্জন করুন। আরামের নিদ্রা থেকে জেগে উঠুন। আপনার সফরের জন্য কিছু পথের সম্বল সংগ্রহ করে নিন। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন ও রুজু করুন। হয়তো বা আপনি তাঁর সাড়া পাবেন। তাঁর রহমত ও করুণা অর্জন করে আপনি সৌভাগ্যবান হবেন। আল্লাহর অলীদের পথের পথিক হয়ে তাঁদের সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারবেন।

আল্লাহ ও তাঁর জাহান্নামের ভয়ে নয়নাশ্রু বিগলিত করে রমযান মাসকে বিদায় জানান। যে ছিল প্রিয়তম, সে বিদায় নিল। তাতে তো আপনার চোখে পানির স্রোত নামারই কথা। কি জানি আবার আগামী বছরে সেই প্রিয়তমের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হবে কি না? আবার আপনি ঐ ফরয রোযা পালন করার তওফীক লাভ করবেন কি না? পুনরায় ঐ উদ্দীপনার সাথে জামাআতে ঐ তারাবীহর নামায পড়তে সুযোগ পাবেন কি না?

কাজ শেষে মজুরকে তার মজুরী দিয়ে দেওয়া হয়। আমরা আমাদের কাজ তো শেষ করলাম। কিন্তু হায়! যদি আমরা আমাদের মধ্যে কার কাজ মহান আল্লাহর দরবারে গৃহীত

Contents

হয়েছে তা জানতে পারতাম, তাহলে তাকে তার উপর মোবারকবাদ জানাতাম। আর কার কাজ গৃহীত নয়, তা জানতে পারলে তার সাথে বসে সমবেদনা ও শোক প্রকাশ করতাম। *(তাফাসাসাঃ ১০১- ১০৬পৃঃ থেকে সংক্ষেপিত)*

চতুর্দশ অধ্যায়

রমযানের রোযা কাযা করার বিবরণ

কারো রমযান মাসের রোযা ছুটে গেলে তা সত্বর কাযা করা ওয়াজেব নয়। বরং এ ব্যাপারে প্রশস্ততা আছে; সুযোগ ও সময় মত তা কাযা করতে পারা যায়। তদনুরূপ কাফ্‌ফারাও সত্বর আদায় করা ওয়াজেব নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ বা মুসাফির হলে সে অপর কোন দিন গণনা করবে। *(কুঃ ২/১৮৪)*

অর্থাৎ, সে অপর কোন দিনে রোযা রেখে নেবে। এখানে মহান আল্লাহ লাগাতার বা সাথে সাথে রাখার শর্ত আরোপ করেন নি। সে শর্তের কথা উল্লেখ থাকলে অবশ্যই তা সত্বর পালনীয় হত। অতএব বুঝা গেল যে, এ ব্যাপারে প্রশস্ততা আছে। *(মুমঃ ৬/৪৪৯)* বলা বাহুল্য, যদি কেউ তার ছুটে যাওয়া রোযা পিছিয়ে দিয়ে শীতের ছোট ছোট দিনে রাখে, তাহলে তাও তার জন্য বৈধ এবং যথেষ্ট। তাতেও মহান আল্লাহর ঐ ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। *(ফাসিঃ মুসনিদ ৮১পৃঃ)*

তবে ঈদের পরে ওজর দূর হয়ে গেলে সুযোগ হওয়ার সাথে সাথে সত্বর কাযা রেখে নেওয়াই উচিত। কারণ, তাতে সত্বর দায়িত্ব পালন হয়ে যায় এবং পূর্বসতর্কতামূলক কর্ম সম্পাদন করা হয়। *(মুমঃ ৬/৪৪৬)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমার রমযানের রোযা কাযা থাকত। কিন্তু সে রোযা শা'বান ছাড়া তার আগে কাযা করতে সক্ষম হতাম না।' এই কথার এক বর্ণনাকারী ইয়াহয়্যা বিন সাঈদ বলেন, 'এর কারণ এই যে, নবী ﷺ-এর খিদমত তাঁকে ব্যস্ত করে রাখত। আর তাঁর কাছে তাঁর পৃথক মর্যাদাও ছিল।' *(বুঃ ১৯৫০, মুঃ ১১৪৬, আদাঃ ২৩৯৯, ইমাঃ ১৬৬৯, ইখুঃ ২০৪৬-২০৪৮নং, বাঃ ৪/২৫২)*

এখানে মা আয়েশার বাহ্যিক উক্তি এই কথাই দাবী করে যে, তাঁর ব্যস্ততা না থাকলে ছুটে যাওয়া রোযা সত্বরই কাযা করতেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, যার কোন ওজর-অসুবিধা নেই, তার জন্য দেরী না করে সত্বর কাযা রেখে নেওয়াই উচিত। *(তামিঃ ৪২২পৃঃ দ্রঃ)*

কাযা রোযা ছুটে যাওয়া রোযার মতই। অর্থাৎ, যত দিনকার রোযা ছুটে গেছে, ঠিক তত দিনকারই কাযা করবে; তার বেশী নয়। অবশ্য উভয়ের মাঝে পার্থক্য এই যে, কাযা রোযা লাগাতার রাখা জরুরী নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, "কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ বা মুসাফির হলে সে অপর কোন দিন গণনা করবে।" *(কুঃ ২/১৮৪)* অর্থাৎ, যে দিনের রোযা সে ছেড়ে দিয়েছে, সেই দিনগুলোই যেন অন্য দিনে কাযা করে নেয়; নিরবচ্ছিন্নভাবে অথবা বিচ্ছিন্নভাবে। যেহেতু মহান আল্লাহ এখানে রোযা কাযা করার কথাই বলেছেন এবং তার

সাথে কোন ধরনের শর্ত আরোপ করেন নি। *(ফিসুঃ ১/৪১৬)*

পক্ষান্তরে কাযা রোযাসমূহকে ছেড়ে ছেড়ে অথবা লাগাতার রাখার ব্যাপারে কোন মরফূ' হাদীস বিশুদ্ধরূপে বর্ণিত হয় নি। সঠিক হল, উভয় প্রকার বৈধ। যেমন আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, 'ইচ্ছা করলে একটানা রাখবে।' *(ইগঃ ৪/৯৪-৯৭, তামিঃ ৪২৪পৃঃ)*

অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনটি কারণে কাযা রোযাগুলিকে একটানা -অর্থাৎ মাঝে এক দিনও বাদ না দিয়ে- রেখে নেওয়াই উত্তম ঃ-

প্রথমতঃ একটানা রোযা কাযা রাখাটা আসল রোযার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, আসল রোযা একটানাই রাখতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ লাগাতার রাখলে অতি সত্বর দায়িত্ব পালন হয়ে যায়। যেহেতু একদিন রোযা রেখে মাঝে ২/১ দিন বাদ দিয়ে আবার রাখলে কাযা পূর্ণ করতে বিলম্ব হয়ে যায়। অথচ লাগাতার রেখে নিলে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ একটানা রোযা রেখে নেওয়াটাই পূর্বসতর্কতামূলক কর্ম। কারণ, মানুষ জানে না যে, আগামীতে তার কি ঘটবে। আজ সুস্থ আছে, কিন্তু কাল হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়বে। আজ জীবিত আছে, কিন্তু কাল হয়তো মরণের আহবানে সাড়া দিতে হবে। *(মুমঃ ৬/৪৪৬)*

অনুরূপভাবে আসল রোযা থেকে কাযা রোযার একটি পার্থক্য এই যে, কাযা রোযা রাখা অবস্থায় দিনের বেলায় সঙ্গম করে ফেললে কোন কাফ্ফারা লাগে না। যেহেতু সেটা রমযান মাসের বাইরে ঘটে তাই। *(ঐ ৬/৪১৩)*

❖ আগামী রমযান পর্যন্ত কাযা রোযা রাখতে না পারলে ঃ

কোন ওযর ব্যতীত রমযানের কাযা রোযা না রেখে পরবর্তী রমযান পার করে দেওয়া বৈধ নয়। কার্যক্ষেত্রে কাযা পালন না করতে পারা অবস্থায় দ্বিতীয় রমযান এসে উপস্থিত হলে বর্তমান রমযানের রোযা পালন করতে হবে। তারপর (প্রথম সুযোগে) ঐ কাযা রোযা রেখে নিতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে কোন ফিদ্য়্যাহ বা দন্ড-জরিমানা নেই। *(ফিসুঃ ১/৪১৬)*

পক্ষান্তরে বিনা ওযরে কাযা না তুলে পরবর্তী রমযান পার করে দিলে গোনাহগার হতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে কাযা করার সাথে সাথে প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একটি করে মিসকীনকে খানা দান করতে হবে। এই মত হল কিছু উলামার। *(ফাসিঃ মুসনিদ, ৮২পৃঃ, আসাইঃ ৯৯পৃঃ)* যেহেতু এই মত পোষণ করতেন সাহাবী আবূ হুরাইরা ও ইবনে আব্বাস ﷺ। *(দারাঃ ২৩১৮, ২৩১৯, ২৩২২নং, বাঃ ৪/২৫৩)*

অন্য দিকে অন্য কিছু উলামা বলেন যে, কেবল কাযাই করতে হবে; মিসকীনকে খাদ্য দান করতে হবে না। আর উভয় সাহাবী থেকে যে আসার বর্ণনা করা হয়েছে, তা উক্ত দাবীর দলীল নয়। কারণ, অকাট্য দলীল কেবল কিতাব ও সুন্নাহ থেকেই গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে সাহাবাগণের উক্তি দলীল হওয়ার ব্যাপারটা বিবেচনাধীন; বিশেষ করে যখন তাঁদের কথা কুরআনের বাহ্যিক উক্তির প্রতিকূল হয়। আর এখানে কাযা রাখার সাথে মিসকীনকে খানা দান করা ওয়াজেব করার বিধান কুরআনের বাহ্যিক উক্তির বিরোধী। যেহেতু মহান আল্লাহ ভিন্ন দিনে কাযা করা ছাড়া অন্য কিছু ওয়াজেব করেন নি। অতএব এই যুক্তিতে আমরা

আল্লাহর বান্দাদেরকে সেই জিনিস পালন করতে বাধ্য করতে পারি না, যে জিনিস পালন করতে তিনি তাদেরকে বাধ্য করেন নি। অবশ্য এ বিষয়ে যদি কোন দায়মুক্তকারী দলীল থাকত, তাহলে সে কথা ভিন্ন ছিল।

পক্ষান্তরে আবূ হুরাইরা ও ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক যে উক্তি বর্ণিত হয়েছে, সে ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, কাযা রাখার সাথে সাথে একটি করে মিসকীন খাইয়ে দেওয়া উত্তম; ওয়াজেব নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে সঠিক মত এই যে, পরবর্তী রমযান অতিবাহিত করে কাযা রাখলে রোযা ছাড়া অন্য কিছু ওয়াজেব নয়। তবে এ কথা ঠিক যে, এই দেরী করার জন্য সে গোনাহগার হবে। *(মুমঃ ৬/৪৫১)*

গত কয়েক বছরের হলেও রমযানের রোযা কাযা করা ওয়াজেব। সুতরাং কেউ যদি ২০ বছর বয়সে রোযা রাখতে শুরু করে, তাহলে তাকে সাবালক হওয়ার পর থেকে ৫ বছরের ছাড়া রোযা কাযা করতে হবে। আর সেই সাথে তাকে লজ্জিত হয়ে তওবাও করতে হবে এবং এই সংকল্পবদ্ধ হতে হবে যে, জীবনে পুনঃ কোন দিন রোযা ছাড়বে না। *(মবঃ ৩০/১০৯)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমরা রোযা কাযা করতে আদিষ্ট হতাম এবং নামায কাযা করতে আদিষ্ট হতাম না।' *(মুঃ ৩৩৫নং)*

❖ ইচ্ছাকৃত ছাড়া রোযার কাযাঃ

কিছু সংখ্যক উলামার মত এই যে, যে ব্যক্তি বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃত রমযানের রোযা ত্যাগ করবে, সে ব্যক্তির পাপ হবে মহাপাপ (কাবীরা)। তাকে সে রোযা কাযা করতে হবে এবং ঐ অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে। বেশী বেশী করে নফল রোযা ও অন্যান্য ইবাদত করতে হবে, যাতে ফরয ইবাদতের ঐ ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়। আর সম্ভবতঃ আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। *(৭০ঃ ৪৩নং)*

উক্ত অভিমত সেই রমযানের দিনের বেলায় স্ত্রী-সঙ্গমকারীর হাদীসকে ভিত্তি করে প্রকাশ করা হয়েছে; যাতে মহানবী ﷺ তাকে ঐ দিনকে কাযা করতে আদেশ করে বলেছিলেন, "একদিন রোযা রাখ এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।" *(আদাঃ ২৩৯৩, ইখুঃ ১৯৫৪, দারাঃ, বাঃ ৪/২২৬-২২৭, ইগঃ ৯৪০নং)* এ ছাড়া তিনি বলেছেন, "রোযা অবস্থায় যে ব্যক্তি বমনকে দমন করতে সক্ষম হয় না, তার জন্য কাযা নেই। পক্ষান্তরে যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে, সে যেন ঐ রোযা কাযা করে।" *(আঃ ২/৪৯৮, আদাঃ ২৩৮০, তিঃ ৭১৬, ইমাঃ ১৬৭৬, দাঃ ১৬৮০, ইখুঃ ১৯৬০, ইহিঃ মাওয়ারিদ ৯০৭নং, হাঃ ১/৪২৭, দারাঃ, বাঃ ৪/২১৯ প্রমুখ, ইগঃ ৯৩০, সজাঃ ৬২৪৩নং)*

অন্য কিছু সংখ্যক উলামা বলেন যে, বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃত নামায-রোযা ত্যাগকারীর কোন কাযা নেই। আর না-ই তার তা শুদ্ধ হবে। অবশ্য যা কাযা করার ব্যাপারে দলীল আছে তার কথা স্বতন্ত্র। যেমন রোযা রেখে ইচ্ছাকৃত স্ত্রী-সঙ্গমকারী এবং বমনকারী ব্যক্তি দলীলের ভিত্তিতে রোযা কাযা করবে। *(তামিঃ ৪২৫-৪২৬পৃঃ)*

পক্ষান্তরে যে ইচ্ছাকৃতভাবে মোটেই রোযা রাখে না সে ব্যক্তি কিছু উলামার মতে কাফের ও মুর্তাদ হয়ে যাবে। তার জন্য তওবা জরুরী এবং বেশী বেশী নফল ইবাদত করা উচিত। যেমন জরুরী দ্বীনের সকল বিধানকে ঘাড় পেতে মান্য করা। আর উলামাদের সঠিক

Contents

মতানুসারে তার জন্য কাযা নেই। যেহেতু তার অপরাধ বড় যে, কাযা করে তার খন্ডন হবে না। *(ফইঃ ২/ ১৫৪, ফাসিঃ মুসনিদ ৮৪পৃঃ)*

❖ চিররোগা খাদ্যদানের পর সুস্থ হলেঃ

কোন চিররোগা লোক প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে মিসকীনকে খাদ্য দান করার পর আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করলে তার জন্য ঐ দিনগুলিকে কাযা রাখা জরুরী নয়। যেহেতু রোযার বদলে খাদ্য দান করার ফলে তার দায়িত্ব যথাসময়ে পালন হয়ে গেছে। *(৪৮ঃ ৪১পৃঃ)*

কোন রোগী রোগের কারণে রোযা ছেড়ে দিল। তারপর কাযা করার জন্য আরোগ্য লাভের আশায় ছিল। কিন্তু তার রোগ ভালো হল না। বরং জানতে পারল যে, তার রোগ চিরস্থায়ী। এমন লোকের জন্য রোযা কাযা করার বদলে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে এক একটি মিসকীনকে খাদ্য দান করা জরুরী। *(৭০ঃ ২৭নং)*

একজন রোগী চিররোগ থাকার ফলে রোযা রাখে নি। কিন্তু মিসকীনকে খাদ্যও দান করে নি। অতঃপর কয়েক বছর পার হওয়ার পর সে সুস্থ হয়ে উঠল। এমন রোগীর জন্যও গত রমযানসমূহের রোযা কাযা করতে বাধ্য নয়। বরং সে প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একটি করে মিসকীন খাওয়াতে বাধ্য। অবশ্য আগামী রমযানে তার জন্য রোযা রাখা অবশ্যই ফরয। *(ইবনে বায, মবঃ ৩০/ ১১২, মুমঃ ৬/৪৫৩)*

❖ কাযা রাখার পূর্বে কি নফল রাখা চলবে?

রমযানের কাযা রোযা রাখার জন্য সময় সংকীর্ণ না হলে তার পূর্বে নফল রোযা রাখা বৈধ ও শুদ্ধ। অতএব সময় যথেষ্ট থাকলে ফরয রোযা কাযা করার আগে মুসলিম নফল রোযা রাখতে পারে। যেমন ফরয নামায আদায় করার আগে নফল নামায পড়তে পারে। আর এতে কোন গোনাহ নেই। উভয়ের মধ্যে অনুমিতির কথা সুস্পষ্ট। তবে উত্তম হল প্রথমে ফরয রোযা কাযা রেখে নেওয়া। এমন কি যুলহজ্জের প্রথম ৮ দিন, আরাফার দিন, আশূরার দিন এসে উপস্থিত হলে সে দিনগুলিতেও কাযা রোযা রাখবে। সম্ভবতঃ তাতে কাযা রাখার সওয়াব ও ঐ দিনগুলির ফযীলত উভয়ই লাভ করবে। আর যদি ধরে নেওয়াই যায় যে, কাযা রাখলে ঐ দিনগুলির ফযীলত পাবে না, তাহলেও নফল রাখা থেকে ফরয কাযা করার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অধিক। *(মুমঃ ৬/৪৪৮)* তা ছাড়া কিছু সংখ্যক উলামা রমযানের রোযা কাযা রাখার পূর্বে নফল রোযা রাখা মকরূহ মনে করেছেন। *(ইআশাঃ ২/৩০৬ দ্রঃ)*

পক্ষান্তরে শওয়ালের ছয় রোযা রমযানের রোযা কাযা করার আগে রাখা যাবে না। রাখলে তা সাধারণ নফলের মান পাবে; শওয়ালের রোযার ফযীলত পাওয়া যাবে না। কেননা, মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার পর পর শওয়ালের ছয়টি রোযা রাখে, সে ব্যক্তির সারা বছর রোযা রাখা হয়।" *(মুঃ ১১৬৪, আদাঃ ২৪৩৩, তিঃ, ইমাঃ ১৭১৬নং, দাঃ, প্রমুখ)* কিন্তু যার রমযানের রোযা অবশিষ্ট থাকবে, তার ব্যাপারে এ কথা যথাযথ হবে না যে, সে রমযানের রোযা রেখেছে। *(মুমঃ ৬/৪৪৯, ফইঃ ২/ ১৬৬)*

❖ রোযা কাযা রেখে মারা গেলেঃ

যে ব্যক্তি নামায কাযা রেখে মারা যায়, সে ব্যক্তির অভিভাবক বা অন্য কেউ তার পক্ষ থেকে সে নামায আদায় করে দিতে পারে না। আর তার জন্য কোন কাফ্ফারা বা কোন ফিদ্য়্যাহ-জরিমানা নেই। তদনুরূপ যে ব্যক্তি রোযা রাখতে অক্ষম, সে ব্যক্তির তরফ থেকে তার জীবনে কেউ তার সেই রোযা রেখে দিতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, আর এই যে, মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পেয়ে থাকে। *(কুঃ ৫৩/৩৯)*

যদি কোন ব্যক্তি রমযান মাস চলা অবস্থায় মারা যায়, তাহলে মাসের অবশিষ্ট দিনগুলির ব্যাপারে তার উপরে অথবা তার অভিভাবকের উপরে কোন কিছু ওয়াজেব নয়। *(৭০ঃ ১৪নং, তাইরাঃ ৪৯পৃঃ)*

কিন্তু কোন রোগী রোগে থাকা অবস্থায় (কিছু বা সম্পূর্ণ) রমযান পার হয়ে মারা গেলে তার ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ আছে ঃ-

১। যে রোগীর আরোগ্যের আশা আছে, আরোগ্য পর্যন্ত তার উপর রোযা ওয়াজেব থাকবে। কিন্তু রোগ যদি থেকেই যায় এবং কাযা করার সুযোগ হওয়ার আগেই সে মারা যায়, তাহলে তার উপর কিছুই ওয়াজেব নয়। কারণ, তার উপর ওয়াজেব ছিল কাযা, আর তা করতে সে সুযোগই পায় নি।

২। এমন রোগী যার আরোগ্যের কোন আশা নেই। তার তরফ থেকে শুরু থেকেই মিসকীন খাওয়ানো ওয়াজেব; রোযা কাযার পরিবর্তে নয়। সে মারা গেলে তার তরফ থেকে প্রত্যেক রোযার বিনিময়ে একটি করে মিসকীন খাইয়ে দিলেই ওয়াজেব আদায় হয়ে যাবে। যেহেতু যার ওযর দূর হওয়ার মত নয় -যেমন, অথর্ব বৃদ্ধ এবং চিররোগা, তার তরফ থেকে ১টি রোযার বদলে ১টি মিসকীন খাওয়ানোই ওয়াজেব।

৩। এমন রোগী যার আরোগ্যের আশা ছিল, অতঃপর রমযান পরে সে সুস্থও হয়েছে এবং কাযা করার সুযোগও পেয়েছে। কিন্তু কাযা করার আগেই সে মারা গেছে। এমন রোগীর তরফ থেকে তার নিকটাত্মীয় প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একটি করে মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। *(মুমঃ ৬/৪৫২-৪৫৩)*

অবশ্য যদি ঐ মৃতব্যক্তির কোন আত্মীয় তার তরফ থেকে রোযাগুলি কাযা রেখে দিতে চায়, তাহলে তাও কিছু উলামার নিকট শুদ্ধ হয়ে যাবে। *(মুমঃ ৬/৪৫৫-৪৫৬, ৭০ঃ ২৯নং)* যেহেতু মা আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের দায়িত্বে রোযা থাকা অবস্থায় মারা যাবে, তার তরফ থেকে তার অভিভাবক (ওয়ারেস) রোযা রাখবে।" *(বুঃ ১৯৫২, মুঃ ১১৪৭নং, প্রমুখ)*

অন্য কিছু উলামা এই মতকে প্রাধান্য দেন যে, উক্ত হাদীস নযরের রোযার ব্যাপারে বিবৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে রমযানের ফরয রোযা বাকী রাখা অবস্থায় মারা গেলে, তার তরফ থেকে কারো রোযা রাখা চলবে না। বরং তার অভিভাবক বা ওয়ারেস তার তরফ থেকে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে ১টি করে মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। *(আজাঃ ১৭০পৃঃ, তামিঃ ৪২৭-৪২৮পৃঃ দ্রঃ)* যেহেতু আমরাহ কর্তৃক বর্ণিত, তাঁর আম্মা রমযানের রোযা বাকী রাখা অবস্থায় মারা যান। তিনি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কি তাঁর তরফ থেকে কাযা রেখে দেব?'

উত্তরে তিনি বললেন, ‘না। বরং তাঁর তরফ থেকে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে ১টি করে মিসকীনকে অর্ধ সা’ (মোটামুটি সওয়া ১ কিলো) খাদ্য দান কর।’ *(ত্বাহাবী, ইবনে হায্‌ম, আজাঃ ১৭০পৃঃ দ্রঃ)*

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত যে, এক মহিলা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমার মা মারা গেছেন। কিন্তু তাঁর যিম্মায় নযরের রোযা বাকী আছে। এখন আমি কি তাঁর তরফ থেকে রোযা রেখে দোব?’ উত্তরে তিনি বললেন, “তোমার মায়ের যিম্মায় কোন ঋণ বাকী থাকলে তা কি তুমি পরিশোধ করতে? তা কি তার তরফ থেকে আদায় করা হত?” মহিলাটি বলল, ‘জী হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, “অতএব তুমি তোমার মায়ের তরফ থেকে রোযা রেখে দাও।” *(আঃ ২/২১৬, বুঃ ১৯৫৩, মুঃ ১১৪৮, আদাঃ ৩৩০৮-নং প্রমুখ)*

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, ‘যদি কোন লোক রমযানে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, অতঃপর সে মারা যায় এবং রোযা (কাযা করার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও) রোযা না রেখে থাকে, তাহলে তার তরফ থেকে মিসকীন খাইয়ে দিতে হবে; তার জন্য রোযা কাযা নেই। কিন্তু যদি সে নযরের রোযা না রেখে মারা যায়, তাহলে তার অভিভাবক (বা ওয়ারেস) তার তরফ থেকে সেই রোযা কাযা করে দেবে।’ *(সআদাঃ ২১০১নং প্রমুখ)*

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি নযরের রোযা না রেখে মারা যাবে, তার তরফ থেকে তার ওয়ারেস রোযা রেখে দেবে। আর এই রোযা রেখে দেওয়ার মান হল মুস্তাহাব। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, কেউ অপরের ভার বহন করবে না। *(কুঃ ৬/১৬৪)*

মৃতব্যক্তির তরফ থেকে রোযা রাখার সময় একাধিক রোযা হলে ওয়ারেসরা যদি আপোসে ভাগ করে রাখে, তাহলে তা বৈধ। কিন্তু এই ভাগাভাগি ‘যিহার’ কিংবা রমযানের দিনে সঙ্গম করার কাফ্‌ফারার রোযায় চলবে না। কারণ, তাতে লাগাতার রোযা হওয়ার শর্ত আছে। আর ভাগাভাগি করে রাখলে নিরবচ্ছিন্নতা থাকে না। অতএব হয় মাত্র একজনই লাগাতার ৬০ রোযা রেখে দেবে। নতুবা ৬০টি মিসকীন খাইয়ে দেবে। *(মুমঃ ৬/৪৫৭-৪৫৮)*

পঞ্চদশ অধ্যায়

রোযা ও রমযান সম্পর্কিত কিছু যয়ীফ ও জাল হাদীস

রোযা ও রমযানকে কেন্দ্র করে বহু যয়ীফ ও জাল হাদীস লোকমুখে তথা বহু বই-পুস্তকে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এ স্থলে সেই শ্রেণীরই কিছু হাদীস সংক্ষেপে উল্লেখ করব। যাতে পাঠক তা পাঠ করে সতর্ক হতে পারেন এবং তদ্দ্বারা আমল ও তাতে উল্লেখিত কথার উপর বিশ্বাস না করে বসেন। আর এ কথা বিদিত যে, কোন জাল তো দূরের কথা, কোন যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা বৈধ নয়; চাহে সে হাদীস আহকাম সম্পর্কিত হোক অথবা ফাযায়েলে আ'মাল সম্পর্কিত। বরং সহীহ ও শুদ্ধভাবে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাই আমলের জন্য যথেষ্ট; যদি আমরা সত্যপক্ষে আমল করতে চাই। *(সজাঃ ভূমিকা ৪৯-৫৬পৃঃ দ্রঃ)* উক্ত প্রকার কিছু হাদীস নিম্নরূপ ঃ-

১। সালমান ফারেসীর লম্বা হাদীস। যাতে আছে; "যে ব্যক্তি তাতে কেউ একটি নফল ইবাদত করবে, সে ব্যক্তি অন্য মাসে একটি ফরয আদায়ের সমান সওয়াব লাভ করবে এবং যে কেউ তাতে একটি ফরয আদায় করবে, তার অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায় করার সমান লাভ করবে। (এ মাসের ১টি নফল ১টি ফরয এবং ১টি ফরয ৭০টি ফরযের সমতুল্য) ---এ মাসে মুমিনের রুযী বৃদ্ধি করা হয়। --- এ মাসের প্রথম ভাগ রহমত, মধ্য ভাগ মাগফিরাত এবং শেষ ভাগ জাহান্নাম থেকে মুক্তি।---" *(মুনকার অথবা যয়ীফ, সিযঃ ৮৭১নং দ্রঃ)*

২। "রমযানের প্রত্যেক রাত্রে মহান আল্লাহ ১০লক্ষ *(যতাঃ ৫৯১নং)* ৬ লক্ষ মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন। এর শেষ রাতে মুক্ত করেন পূর্বে বিগত সকল সংখ্যা পরিমাণ।" *(ঐ ৫৯৮-নং)* অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "প্রত্যহ ৬০ হাজার মানুষকে মুক্ত করা হয়।" *(ঐ ৫৯৯নং)*

৩। "রমযান মাসের জন্য বেহেশ্তকে সুসজ্জিত করা হয়। প্রথম রাত্রে আরশের নিচে এক প্রকার হাওয়া চলে। --- হুরীগণ বেহেশ্তের উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে বলতে থাকে, 'আল্লাহর কাছে আমাদের কোন পয়গামদাতা আছে কি? যার সাথে তিনি আমাদের বিবাহ দেবেন---।' প্রত্যহ ইফতারের সময় আল্লাহ দশ লাখ জাহান্নামীকে মুক্ত করেন। মাসের শেষ দিনে বিগত সকল সংখ্যক মানুষ মুক্ত করেন। শবেকদরের রাতে কাবার পিঠে সবুজ পতাকা গাড়া হয়।--- ফিরিশ্তাগণ ইবাদতকারীদের সাথে মুসাফাহা করেন---।" *(ঐ ৫৯৪নং)*

৪। "রমযান মাসের জন্য বেহেশ্তকে সুসজ্জিত করা হয়। প্রথম রাত্রে আরশের নিচে বেহেশ্তের গাছ-পাতা থেকে হুরীদের উপর এক প্রকার হাওয়া চলে। তখন হুরীগণ বলে, 'হে রব্ব! তোমার বান্দাগণের মধ্য হতে আমাদের স্বামী নির্বাচন কর; যাদেরকে দেখে আমাদের এবং আমাদেরকে দেখে তাদের চক্ষু শীতল হয়।" *(সিযঃ ১৩২৫নং)*

৫। "আল্লাহ রমযান মাসের প্রথম সকালে কোন মুসলমানকে মাফ না করে ছাড়েন না।"

(ঐ ২৯৬নং)

৬। রমযানের পর শ্রেষ্ঠ রোযা, রমযানের তা'যীমে শা'বানের রোযা এবং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সদকা হল রমযানের সদকা।" *(যজাঃ ১০২৩নং)*

৭। "শ্রেষ্ঠ দান হল, রমযান মাসে দান।" *(ঐ ১০১৯, ইগঃ ৮৮৯নং)*

৮। "আমার উম্মতকে রমযানে পাঁচটি জিনিস দান করা হয়েছে; যা ইতিপূর্বে কোন উম্মতকে দান করা হয় নি। ইফতার করা পর্যন্ত পানির মাছ অথবা ফিরিশ্তারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ প্রত্যেক দিন বেহেশ্তকে সুসজ্জিত করে থাকেন।--" *(মাযাঃ ৩/১৪০, আঃ ৭৯০৪নং টীকা, যতাঃ ৫৮৬নং)*

৯। "রজব মাস আগত হলে নবী ﷺ দুআ করতেন, 'হে আল্লাহ আমাদের রজব ও শা'বানে বর্কত দাও এবং রমযান পৌঁছাও।" *(যয়ীফুল জামে' ৪৩৯৫নং)*

১০। "রমযান প্রবেশ করলে নবী ﷺ প্রত্যেক বন্দীকে মুক্তি দিতেন এবং প্রত্যেক যাচ্ঞাকারীকে দান করতেন।" *(সিযঃ ৩০১৫, যজাঃ ৪৩৯৬নং)*

১১। "রমযান প্রবেশ করলে নবী ﷺ-এর রঙ বদলে যেত, তাঁর নামায বেড়ে যেত, দুআয় আকুল হতেন---" *(যজাঃ ৪৩৯৭নং)*

১২। "তোমাদের কাছে বর্কতের মাস রমযান এসে উপস্থিত হয়েছে। --- আল্লাহ এ মাসে তোমাদের আপোসে প্রতিযোগিতা দেখবেন এবং তোমাদেরকে নিয়ে ফিরিশ্তাদের কাছে গর্ব করবেন।---" *(মাযাঃ ৩/১৪২, যতাঃ ৫৯২নং)*

১৩। "রমযান মাসের একটি তসবীহ অন্য মাসের হাজার তসবীহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" *(যতিঃ ৬৮৬নং)*

১৪। "রমযান কি জিনিস তা যদি আমার উম্মত জানত, তাহলে আশা করত যে, সারা বছরটাই যেন রমযান হোক। যে কেউ রমযানের একটি রোযা রাখবে, তার সঙ্গে মুক্তার তাঁবুতে আয়তলোচনা একটি হুরীর সাথে বিবাহ দেওয়া হবে। ---প্রত্যেক স্ত্রীর হবে ৭০টি করে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদ। তাকে ৭০ রঙের খোশবু দান করা হবে। --" *(হাদীসটি জাল, সিযঃ ৩/৪৯৪, যতাঃ ৫৯৬নং)*

১৫। "রমযানের প্রথম রাত্রি এলে আল্লাহ রোযাদার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। আর যে বান্দার প্রতি আল্লাহ দৃষ্টিপাত করেন, তিনি তাকে আযাব দেন না। রমযানের প্রত্যেক রাত্রে তিনি ১০ লাখ জাহান্নামীকে মুক্তি দেন।---" *(হাদীসটি জাল, সিযঃ ২৯৯নং)*

১৬। "যে ব্যক্তি মক্কায় রমযান পেয়ে সেখানে রোযা রাখে এবং যথাসাধ্য রাতের নামায পড়ে, আল্লাহ তার জন্য অন্য জায়গার ১ লাখ মাস রমযানের সওয়াব লিখে দেন---।" *(যজাঃ ৫৩৭৫নং)*

১৭। "মক্কার একটি রমযান অন্য জায়গার হাজার রমযান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" *(সিযঃ ২/২৩১)*

১৮। "মদীনার একটি রমযান অন্য জায়গার হাজার রমযান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" *(সিযঃ ৮৩১নং)*

১৯। "তিন ব্যক্তিকে পানাহারের নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না; ইফতারকারী, সেহরী খানে-ওয়ালা----।" *(হাদীসটি জাল, সিযঃ ১৯৮০নং)*

২০। "আল্লাহ কিরামান কাতেবীনকে অহী করেছেন যে, আমার রোযাদার বান্দাদের

আসরের পর কৃত কোন পাপ লিপিবদ্ধ করো না।" *(ফামাআমাঃ, কিসিঃ ৯৫পৃঃ)*

২১। "---আল্লাহর একটি খাদ্য পরিপূর্ণ সুসজ্জিত খাঞ্চা আছে, যাতে এমন সব খাদ্য আছে যা কোন চক্ষু দর্শন করে নি, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নি এবং কারো মানুষের মনেও তা কল্পিত হয় নি। যে খাঞ্চাতে রোযাদাররা ছাড়া অন্য কেউ বসবে না।" *(যজাঃ ৩৫৫৯নং)*

২২। "যে বান্দা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য রোযা রাখবে, আমি তার দেহকে সুস্থ রাখব এবং তাকে বৃহৎ সওয়াব দান করব।" *(যজাঃ ১৫৭১নং)*

২৩। "রোযা রাখ সুস্থ থাকবে।" *(ঐ ৩৫০৪, সিযঃ ২৫৩নং)*

২৪। "রোযা হল অর্ধেক ধৈর্য।" *(যইমাঃ ৩৮-২নং)*

২৫। "প্রত্যেক জিনিসের যাকাত আছে, আর দেহের যাকাত হল রোযা।" *(ঐ ৩৮-২নং)*

২৬। "রোযাদারের নিকট কেউ খাবার খেলে, খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ফিরিশ্তাবর্গ দুআ করতে থাকেন।" *(সিযঃ ১৩৩২, যইমাঃ ৩৮-৪নং)*

২৭। "রোযাদারের অস্থিসমূহ তসবীহ পাঠ করে, এবং যতক্ষণ তার সামনে খাওয়া হয়, ততক্ষণ ফিরিশ্তাগণ তার জন্য দুআ করতে থাকেন।" *(জাল হাদীস, সিযঃ ১৩৩১, যইমাঃ ৩৮৫নং)*

২৮। "রোযাদারের ঘুম ইবাদত, তার নীরবতা তসবীহ এবং আমলের সওয়াব বহুগুণ।" *(যজাঃ ৫৯৭২, সিযঃ ৫৯৮-৪নং)*

২৯। "রোযাদার ইবাদতে থাকে; যদিও সে বিছানায় শুয়ে থাকে।" *(সিযঃ ৬৫৩নং)*

৩০। "রোযা রাখলে সকালে দাঁতন করো এবং বিকালে করো না। কারণ, যে রোযাদারের ঠোঁট দুটি বিকালে শুকিয়ে যায়, কিয়ামতে সেই রোযাদারের চোখের সামনে জ্যোতি হবে।" *(যজাঃ ৫৭৯নং)*

৩১। "যে কেউ রোযা নষ্ট করবে, সে যেন একটি উঁটনী কুরবানী করে। তা করতে না পারলে সে যেন মিসকীনদেরকে ৭৫ কেজি খেজুর দান করে।" *(জাল হাদীস, সিযঃ ৬২৩, যজাঃ ৫৪৬১নং)*

৩২। "যে ব্যক্তি রমযানের একটি মাত্র রোযা কোন ওযর ও রোগ বিনা নষ্ট করে দেয় সে ব্যক্তি সারা জীবন রোযা রাখলেও তা পূরণ করতে পারবে না।" *(যআদাঃ ৪১৩, যজাঃ ৫৪৬২নং)*

৩৩। "পাঁচটি কাজে রোযা ও ওযূ নষ্ট হয়; মিথ্যা বলা, গীবত করা, চুগলী করা, (মহিলার প্রতি) কামদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।" *(জাল হাদীস, সিযঃ ১৭০৮, যজাঃ ২৮-৪৯নং)*

৩৪। "(যে দুজন মহিলা রক্ত অথবা মাংস ও পুঁজ বমি করেছিল) তারা হালাল জিনিস ব্যবহার না করে রোযা রেখেছিল, কিন্তু আল্লাহ কর্তৃক হারাম জিনিস দ্বারা ইফতার করেছিল। উভয়ে বসে (গীবত করার মাধ্যমে) লোকের গোশ্ত্ খেয়েছিল।" *(সিযঃ ৫১৯নং)*

৩৫। "সফরে রমযানের রোযা রাখা, ঘরে থাকা অবস্থায় রোযা নষ্টকারীর মত।" *(ঐ ৪৯৮, যইমাঃ ৩৬৫নং)*

৩৬। "যে ব্যক্তি হালাল খেজুর দ্বারা ইফতার করবে, তার নামাযকে ৪ শত গুণ বর্ধিত করা হবে।" *(হাদীসটি জাল, কিসিঃ ৯৫পৃঃ, ফামাআমাঃ)*

৩৭। "যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে রমযান মাসে একটি রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে ব্যক্তির জন্য রমযানের সমস্ত রাত্রে ফিরিশ্তাবর্গ দুআ করবেন এবং শবেকদরে জিবরাঈল

তার সাথে মুসাফাহা করবেন---।” *(সিযঃ ১৩৩৩নং)*

৩৮। “ইফতারের সময় রোযাদারের দুআ রদ্ করা হয় না।” *(যইমাঃ ৩৮৭, সিযঃ ৪৩২৫, ইগঃ ৯২ ১নং)*

৩৯। “প্রত্যেক রোযাদার বান্দার জন্য ইফতারের সময় কবুলযোগ্য দুআ রয়েছে। তা তাকে দুনিয়ায় দান করা হয় অথবা আখেরাতের জন্য জমা রাখা হয়।” *(যজাঃ ৪৭৩৩নং)*

৪০। ইফতারের সময় তিনি বলতেন, “আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু অ আলা রিযক্বিকা আফত্বারতু।” *(যজাঃ৪৩৪৯নং)*

৪১। ইফতারের সময় তিনি বলতেন, “আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু অ আলা রিযক্বিকা আফত্বারতু। ফাতাক্বাব্বাল মিন্নী, ইন্নাকা আন্তাস সামীউল আলীম।” *(যজাঃ ৪৩৫০নং)*

৪২। ইফতারের সময় তিনি বলতেন, “আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আআ’নানী ফাসুমতু অরাযাক্বানী ফাআফত্বারতু।” *(যজাঃ ৪৩৪৮-নং)*

৪৩। “রমযানের রাতে মুমিন নামায পড়লে আল্লাহ তার প্রত্যেক সিজদার বিনিময়ে ১৫০০ সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন এবং বেহেশ্তে তার জন্য লাল রঙের প্রবালের একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়; তার আছে ৬০০০০ দরজা, প্রত্যেক দরজায় আছে একটি করে স্বর্ণের মহল---। রমযানের প্রথম রোযা রাখলে পশ্চাতের সকল পাপ মাফ হয়ে যায়---। প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ৭০০০০ ফিরিশ্তা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে---। রমযান মাসের দিনে অথবা রাতে প্রত্যেক সিজদার বিনিময়ে একটি করে (জান্নাতে) বৃক্ষ লাভ হবে; যার ছায়াতলে সওয়ারী ৫০০ বছরের পথ চলবে।” *(যতাঃ ৫৮৮-নং)*

৪৪। “ঈদের দিন এসে উপস্থিত হলে ফিরিশ্তাবর্গ রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আহবান করেন---। অতঃপর যখন নামায হয়ে যায় তখন আহবানকারী আহবান করে, শোন! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন---।’ আর আসমানে এই দিনের নাম হল পুরস্কারের দিন।” *(মাযাঃ ২/২০১, যতাঃ ৫৯৪নং)*

৪৫। “রমযানের রোযা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে লটকানো থাকে। ফিতরা দিলে তবেই তা উত্থিত করা হয়।” *(সিযঃ ৪৩নং)*

৪৬। “যে ব্যক্তি রোযার (শেষ) দশকে ই’তিকাফ করবে, তার দুটি হজ্জ ও দুটি উমরাহ করার সমান সওয়াব লাভ হবে।” *(হাদীসটি জাল, সিযঃ ৫১৮-নং)*

৪৭। “রমযান বলো না। কারণ, ‘রমযান’ হল আল্লাহর অন্যতম নাম। বরং তোমরা রমযান মাস বলো।” *(মুখালাফাতু রামাযান, শায়খ আব্দুল আযীয সাদহান)*

৪৮। “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একদিন রোযা রাখবে, তার কাছ থেকে জাহান্নামকে এত দূরের পথ করে দেবেন; যে পথ একটি কাক ছানা অবস্থা থেকে বুড়ো হয়ে মরা পর্যন্ত উড়ে অতিক্রম করতে পারে। *(যতাঃ ৫৭৪নং)*

৪৯। “মুসলিম রোযা রাখলে ---- পাপ থেকে সেই রকম বেরিয়ে আসে, যেমন সাপ বেরিয়ে আসে তার খোলস থেকে।” *(যতাঃ ৫৯৫নং)*

৫০। “মুসলিম রোযা রাখলে ---- পাপ থেকে সেই রকম বেরিয়ে আসে, যেমন বেরিয়ে আসে মায়ের পেট থেকে নিষ্পাপ হয়ে।” *(যতাঃ ৬০২নং)*

৫১। “আল্লাহ নিজের জন্য এই ফায়সালা ও স্থির করে রেখেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন গরমের দিনে আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেকে (রোযা রেখে) পিপাসিত করবে, আল্লাহ তাকে এই

অধিকার দেবেন যে, তিনি কিয়ামতের দিন তার পিপাসা দূর করে দেবেন।" *(যতাঃ ৫৭৮-নং)*

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

রমযানের কিছু বিদআতের নমুনা

কোন কোন অঞ্চলে বা সমাজে রমযান মাসে এক এক প্রকার বিদআত প্রচলিত হয়ে পড়েছে। সে সকল বিদআত থেকে সাবধান করার জন্য এখানে কিছু বিদআত উল্লেখ করা সঙ্গত বলে মনে করছি।

১। রোযার নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা।

২। "নাওয়াইতু আন আসূমা গাদাম মিন শাহরি রামাযান" বলে বাঁধা নিয়ত বলা।

৩। রমযানের রাত্রে কুরআন পড়ার জন্য ভাড়াটিয়া কারী ভাড়া করা। *(মুবিঃ ২৬৮পৃঃ, দুরাঃ ৪০পৃঃ)*

৪। মাইকে এক রাত্রে কুরআন খতম (শবীনা পাঠ) করা।

৫। মীলাদ বা মওলূদ পাঠ করা এবং তার শেষে নবী ﷺ-এর শানে দরূদ পাঠ করার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে মনগড়া দরূদ পড়া। সেই সাথে মুনাজাতে আমলের সওয়াব আম্বিয়া ও আওলিয়া বা কোন আত্মীয়র রূহের জন্য বখশে দেওয়া। *(আজাঃ ২৬০-২৬১পৃঃ)*

৬। পূর্বসতর্কতামূলক কর্ম ভেবে ফজর হওয়ার ৫/ ১০ মিনিট আগে খাওয়া বন্ধ করা এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার ৩/৫ মিনিট পরে ইফতার করা। *(ফবাঃ ৪/ ১৯৯, তামিঃ ৪১৫পৃঃ, মুবিঃ ২৬৮, ৩৬১পৃঃ)*

৭। সেহরী ও ইফতারের সময় জানানোর উদ্দেশ্যে তোপ দাগা। *(মুবিঃ ২৬৮-পৃঃ)*

৮। সেহরী খেতে জাগানোর উদ্দেশ্যে আযানের পরিবর্তে কুরআন ও গজল পাঠ করা।

৯। মসজিদের মিনারে সেহরী ও ইফতারের জন্য নির্দিষ্ট লাইট ব্যবহার করা। যেমন, সেহরীর সময় শেষ হলে লাল বাতি এবং ইফতারীর সময় শুরু হলে সবুজ বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া। *(ফবাঃ ৪/ ১৯৯, মুবিঃ ৩৬১পৃঃ)*

১০। সেহরী না খেয়ে অধিক সওয়াবের আশা করা। *(মুবিঃ ৩৬১পৃঃ)*

১১। কুরআন খতম হওয়ার পর বাকী রাতে তারাবীহ না পড়া। *(ঐ ২৬৮-পৃঃ)*

১২। প্রথমে পানি না খেয়ে আদা ও লবণ দিয়ে ইফতারী করাকে ভালো মনে করা।

১৩। ইফতারের আগে হাত তুলে জামাআতী মুনাজাত করা।

১৪। ইফতারের সময় "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিরাহমাতিকাল্লাতী অসিআত কুল্লা শাইইন আন তাগফিরা লী" বলে দুআ করা। *(এ ব্যাপারে আসারটি যয়ীফ। দ্রঃ যইমাঃ ৩৮-৭, ইগঃ ৯২১নং, আর ইফতারীর বিবরণে আলোচিত হয়েছে যে, "যাহাবায যামাউ---" ছাড়া ইফতারীর জন্য অন্য কোন দুআ বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়।)*

১৫। ইফতারের সময় "আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু, অবিকা আ-মানতু, অআলাইকা তাওয়াক্কালতু, অআলা রিযক্বিকা আফতারতু, বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামুর রা-হিমীন" বলে দুআ করা।

১৬। বিশেষ করে রজব, শাবান ও রমযানে মৃতদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা। *(আজাঃ ২৫৭নং বিদআত, মুবিঃ ২৬১পৃঃ)*

১৭। সারা বছর নামায না পড়ে এবং তার সংকল্প না নিয়ে কেবল রমযান মাসে রোযা

রেখে (ফরয, সুন্নত ও নফল) নামায পড়া ও তসবীহ আওড়ানো। *(মুবিঃ ২৭০পৃঃ)*

১৮। শবেকদরের ১০০ বা ১০০০ রাকআত নামায পড়া।

১৯। শবেকদরে বিশেষ করে 'সালাতুত তাসবীহ' নামায পড়া।

২০। কেবল ২৭শের রাতকে শবেকদর মনে করা এবং কেবল সেই রাত জাগরণ করা ও বাকী রাত না জাগা।

২১। বিশেষ করে শবেকদরের রাতে উমরাহ করা। *(মুমঃ ৬/৪৯৬, ৪৯৭)*

২২। বিশেষ করে ২৭শের রাত্রি জাগরণ করে জামাআতী যিক্র করা, নানা রকমের পানাহার সামগ্রী তৈরী বা ক্রয় করে পান-ভোজন করা, মিষ্টি বিতরণ করা ও ওয়ায-মাহফিল করা। *(মাদাঃ ১৬৭৪/১৪ রমযান ১৪১৯হিঃ)*

২৩। নির্দিষ্ট কোন রাতে একাকী বা জামাআতী নির্দিষ্ট যিক্র পড়া। *(ঐ)*

২৪। সাতাশের রাত্রে লোকেদের মিষ্টি কিনতে ভিঁড় করা, (তা খাওয়া ও দান করা)। *(মুবিঃ ২৬৯পৃঃ)*

২৫। ঈদের রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করা। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি জাল। *(দ্রঃ সিযঃ ৫২০, ৫২১, ৫২২নং, মুবিঃ ৩৩২পৃঃ, দুরাঃ ১০০পৃঃ)*

২৬। রমযানের শেষ জুমআহ (বিদায়ী জুমআহ) বিশেষ উদ্দীপনার সাথে পালন করা।

২৭। মা-বাপের নামে বিশেষ ভোজ-অনুষ্ঠান করা। *(ফাসিঃ মুসনিদ ১০৪পৃঃ, তাইরাঃ ৫০পৃঃ)*

২৮। শাবানের ১৫ তারীখের রাতে নামায ও দিনে রোযা রাখা। *(মুবিঃ ৩৬২পৃঃ)* বলা বাহুল্য এ ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই।

সবশেষে এ কথা সকল মুসলিমের জেনে রাখা উচিত যে, নিশ্চয় উত্তম বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং উত্তম পথ-নির্দেশ মুহাম্মাদ ﷺ -এর পথ-নির্দেশ। সব চেয়ে মন্দ কর্ম দ্বীনের অভিনব রচিত কর্মসমূহ। এবং প্রত্যেক নব কর্মই বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" "এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার স্থান দোযখে।" *(মুঃ, নাঃ)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন এমন কাজ করে যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" *(মুঃ)* তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) বিষয়ে কিছু এমন কর্ম উদ্ভাবন করবে যা ওর পর্যায়ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুঃ, মুঃ)*
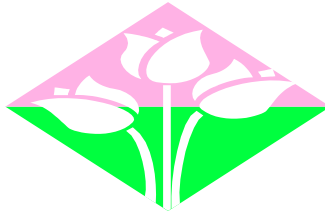
সপ্তদশ অধ্যায়

সুন্নত ও নফল রোযা

রোযার দ্বিতীয় প্রকার হল সুন্নত, নফল (অতিরিক্ত) রোযা; যা পালন করা মুসলিমের জন্য ওয়াজেব নয়। কিন্তু পালন করলে ফযীলত ও সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়।

মহান আল্লাহর একটি হিকমত ও অনুগ্রহ এই যে, তিনি ফরয ইবাদতের মতই নফল ইবাদতও বিধিবদ্ধ করেছেন। তিনি যে আমল ফরয করেছেন, অনুরূপ সেই আমল নফলও করেছেন বান্দার জন্য। ফরয ইবাদতের মাঝে একদিকে যেমন ঘটিত ত্রুটি নফল ইবাদত দ্বারা পূরণ হয়ে যায়। তেমনি অপর দিকে তারই মাধ্যমে আমলকারীর নেকী ও সওয়াব বৃদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে তা বিধিবদ্ধ না হলে তা পালন করা ভ্রষ্টকারী বিদআত বলে গণ্য হত। আর হাদীসে বলা হয়েছে যে, "কিয়ামতের দিন নফল ইবাদত দ্বারা ফরয ইবাদতের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করা হবে।" *(আঃ ২/৪২৫, আদাঃ ৮৬৪নং, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ, হাঃ ১/২৬২, সআদাঃ ৭৭০নং)*

নফল রোযার জন্য নিয়ত ঃ

নফল রোযার নিয়ত ফজরের আগে থেকে হওয়া জরুরী নয়। বরং দিনের বেলায় সূর্য ঢলার আগে বা পরে নিয়ত করলেই রোযা শুদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য ফরয রোযার বেলায় তা হয় না - যেমন পূর্বেই এ কথা আলোচিত হয়েছে। তবে নফল রোযার ক্ষেত্রেও শর্ত হল, যেন নিয়ত করার আগে ফজর উদয় হওয়ার পর কোন রোযা নষ্টকারী জিনিস ব্যবহার না করা হয়। বলা বাহুল্য, যদি তা (পানাহার বা অন্য কিছু) ব্যবহার করে থাকে তাহলে রোযা হবে না।

এ কথার দলীল মা আয়েশার হাদীস; তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের কাছে (খাবার) কিছু আছে কি?" বললেন, 'জী না।' মহানবী ﷺ তখন বললেন, "তাহলে আজকে আমি রোযা থাকলাম।" *(মুঃ ১১৫৪নং, প্রমুখ)*

আর এই আমল ছিল সাহাবা ﷺ-দের। *(দ্রঃ বুঃ ৩৭৯পৃঃ)*

কিন্তু জানার কথা যে, দিনের বেলায় নিয়ত করলে, কেবল নিয়ত করার পর থেকেই সওয়াবের অধিকারী হবে। সুতরাং কেউ সূর্য ঢলার সময় নিয়ত করলে সে কেবল অর্ধেক রোযার সওয়াব প্রাপ্ত হবে; তার বেশী নয়। *(মুমঃ ৬/৩৭২-৩৭৪)* যেহেতু প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির তা-ই প্রাপ্য হয়, যার সে নিয়ত করে থাকে।" *(বুঃ ১নং, মুঃ ১৯০৭নং)*

নফল রোযার প্রকারভেদ

নফল রোযা দুই প্রকার; সাধারণ নফল এবং নির্দিষ্ট নফল। এখানে নির্দিষ্ট রোযাসমূহের কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

১। শওয়ালের ছয় রোযা

যে ব্যক্তির রমযানের রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে, তার জন্য শওয়াল মাসের ৬টি রোযা রাখা মুস্তাহাব। আর এতে তার জন্য রয়েছে বৃহৎ সওয়াব। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার পরে-পরেই শওয়াল মাসে ছয়টি রোযা পালন করে সে ব্যক্তির পূর্ণ বৎসরের রোযা রাখার সমতুল্য সওয়াব লাভ হয়।" *(মুঃ ১১৬৪নং, সুআঃ)*

এই সওয়াব এই জন্য হবে যে, আল্লাহর অনুগ্রহে ১টি কাজের সওয়াব ১০টি করে পাওয়া যায়। অতএব সেই ভিত্তিতে ১ মাসের (৩০ দিনের) রোযা ১০ মাসের (৩০০ দিনের) সমান এবং ৬ দিনের রোযা ২ মাসের (৬০ দিনের) সমান; সর্বমোট ১২ মাস (৩৬০ দিন) বা এক বছরের সওয়াব লাভ হয়ে থাকে। আর এই ভাবে সেই রোযাদারের জীবনের প্রত্যেকটি দিন রোযা রাখা হয়! দয়াময় আল্লাহ বলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, কেউ কোন ভাল কাজ করলে, সে তার ১০ গুণ প্রতিদান পাবে। *(কুঃ ৬/১৬০)*

এই রোযা বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ -আর আল্লাহই ভাল জানেন - তা হল ফরয নামাযের পর সুন্নাতে মুআক্কাদার মত। যা ফরয নামাযের উপকারিতা ও তার অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ করে। অনুরূপ এই ছয় রোযা রমযানের ফরয রোযার অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ করে এবং তাতে কোন ত্রুটি ঘটে থাকলে তা দূর করে থাকে। সে অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটির কথা রোযাদার জানতে পারুক অথবা না পারুক। *(ফারারাঃ ৭৬পৃঃ)*

তা ছাড়া রমযানের ফরয রোযা রাখার পর পুনরায় রোযা রাখা রমযানের রোযা কবুল হওয়ার একটি লক্ষণ। যেহেতু মহান আল্লাহ যখন কোন বান্দার নেক আমল কবুল করেন, তখন তার পরেই তাকে আরো নেক আমল করার তওফীক দান করে থাকেন। যেমন উলামাগণ বলে থাকেন, 'নেক কাজের সওয়াব হল, তার পরে পুনঃ নেক কাজ করা।' *(ইআইঃ ৯২পৃঃ)*

এই রোযার উত্তম সময় হল, ঈদের সরাসরি পরের ৬ দিন। কারণ, তাতেই রয়েছে নেক আমলের দিকে সত্বর ধাবমান হওয়ার দলীল। আর এ কথা মহানবী ﷺ-এর এই উক্তি "যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার পরে-পরেই শওয়াল মাসে ছয়টি রোযা পালন করে---" থেকে বুঝা যায়।

তদনুরূপ উত্তম হল, উক্ত ছয় রোযাকে লাগাতার রাখা। কেননা, এমনটি করা রমযানের

অভ্যাস অনুযায়ী সহজসাধ্য। আর তাতে হবে বিধিবদ্ধ নেক আমল করার প্রতি সাগ্রহে ধাবমান হওয়ার পরিচয়।

অবশ্য তা লাগাতার না রেখে বিচ্ছিন্নভাবেও রাখা চলে। যেহেতু হাদীসের অর্থ ব্যাপক। কিন্তু শওয়াল মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে তা কাযা করা বিধেয় নয়। যেহেতু তা সুন্নত এবং তার যথাসময় পার হয়ে গেছে। তাতে তা কোন ওযরের ফলে পার হোক অথবা বিনা ওযরে। *(ইবনে বাযঃ ফইঃ ২/১৬৫-১৬৬)*

রমযানের রোযা কাযা না করে শওয়ালের রোযা রাখা বিধেয় নয়। যেমন কাফ্‌ফারার রোযা থাকলে তা না রেখে শওয়ালের রোযা রাখা চলে না। আর শওয়াল মাসে রমযানের কাযা রাখলে তাই শওয়ালের রোযা বলে যথেষ্ট হবে না। *(ইবনে জিবরীন, ফাসিঃ ১০৭পৃঃ)*

২। আরাফার রোযা

যুল-হজ্জ মাসের ৯ তারীখ হল আরাফার দিন। এই দিনে হাজীগণ আরাফার ময়দানে উপস্থিত হন বলে এই নামকরণ হয়েছে। এই দিনের রোযা রাখার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে মহানবী ﷺ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেছিলেন, "(উক্ত রোযা) গত এক বছরের এবং আগামী এক বছরের কৃত পাপরাশিকে মোচন করে দেয়।" *(আঃ ৫/২৯৭, মুঃ ১১৬২নং, আদাঃ ২৪২৫নং, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ, বাঃ ৪/২৮৬)*

হযরত সাহল বিন সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আরাফার দিন রোযা রাখে তার উপর্যুপরি দুই বৎসরের পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।" *(আবু য়্যা'লা, সতাঃ৯৯৮নং)*

অবশ্য এই রোযা গৃহবাসীর জন্য বিধেয়; আরাফাতে অবস্থানরত হাজীর জন্য তা বিধেয় নয়। কেননা, ঐ দিনে মহানবী ﷺ রোযা রেখেছেন কি না লোকেরা তা নিয়ে সন্দেহ করলে, তাঁর নিকট এক পাত্র দুধ পাঠানো হল। তিনি ঐ দিনের চাশ্তের সময় তা পান করলেন। সে সময় লোকেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। *(বুঃ ১৯৮৮, মুঃ ১১২৩নং)*

আরাফার ময়দানে ঐ রোযা বিধেয় না হওয়ার কারণ এই যে, ঐ দিন হল দুআ ও যিক্‌রের দিন। আর রোযা রাখলে তাতে দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। তা ছাড়া সেটা হল সফর। আর সফরে রোযা না রাখাটাই উত্তম। *(দ্রঃ যামাঃ ২/৭৭, মুমঃ ৬/৪৭৩)*

পক্ষান্তরে অহাজীদের জন্য ঐ রোযা বিধেয় হওয়ার পশ্চাতে হিকমত হল, ঐ রোযা রেখে রোযাদার হাজীদের সাদৃশ্য বরণ করতে পারে, তাঁদের কর্মের প্রতি আকাঙ্ক্ষী হয় এবং তাঁদের উপর আল্লাহর যে রহমত অবতীর্ণ হয় তাতে শামিল হতে ও সেই রহমতের দরিয়ায় আপ্লুত হতে পারে। *(ফারারাঃ ৭৬পৃঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, রমযানের কাযা রোযার নিয়তে কেউ আরাফা অথবা আশূরার দিন রোযা রাখলে তার উভয় সওয়াব লাভ হবে ইন শাআল্লাহ।

৩। মুহার্রাম মাসের রোযা

সুন্নত রোযাসমূহের মধ্যে মুহার্রাম মাসের (অধিকাংশ দিনের) রোযা অন্যতম। রমযানের পর পর রয়েছে এই রোযার মান। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "রমযানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোযা হল আল্লাহর মাস মুহার্রামের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হল রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায।" *(মুঃ ১১৬৩নং, সুআঃ, ইখুঃ)*

৪। আশূরার রোযা

মুহার্রাম মাসের রোযার মধ্যে সবচেয়ে বেশী তাকীদপ্রাপ্ত হল ঐ মাসের ১০ তারীখ আশূরার দিনের রোযা। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার আগে এই রোযা ওয়াজেব ছিল। রুবাইয়ে' বিন্তে মুআউবিয বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আশূরার সকালে মদীনার আশেপাশে আনসারদের বস্তিতে বস্তিতে খবর পাঠিয়ে দিলেন যে, "যে রোযা অবস্থায় সকাল করেছে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে নেয়। আর যে ব্যক্তি রোযা না রাখা অবস্থায় সকাল করেছে সেও যেন তার বাকী দিন পূর্ণ করে নেয়।"

রুবাইয়ে' বলেন, 'আমরা তার পর হতে ঐ রোযা রাখতাম এবং আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও রাখাতাম। তাদের জন্য তুলোর খেলনা তৈরী করতাম এবং তাদেরকে মসজিদে নিয়ে যেতাম। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ খাবারের জন্য কাঁদতে শুরু করলে তাকে ঐ খেলনা দিতাম। আর এইভাবে ইফতারের সময় এসে পৌঁছত।' *(আঃ ৬/৩৫৯, বুঃ ১৯৬০, মুঃ ১১৩৬, ইখুঃ ২০৮৮নং, বাঃ ৪/২৮৮)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'কুরাইশরা জাহেলিয়াতের যুগে আশূরার রোযা পালন করত। আর আল্লাহর রসূল ﷺ-ও জাহেলিয়াতে ঐ রোযা রাখতেন। (ঐ দিন ছিল কাবায় গিলাফ চড়াবার দিন।) অতঃপর তিনি যখন মদীনায় এলেন, তখনও তিনি ঐ রোযা রাখলেন এবং সকলকে রাখতে আদেশ দিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন রমযানের রোযা ফরয হল, তখন আশূরার রোযা ছেড়ে দিলেন। তখন অবস্থা এই হল যে, যার ইচ্ছা হবে সে রাখবে এবং যার ইচ্ছা হবে সে রাখবে না।' *(বুঃ ১৯৫২, ২০০২, মুঃ ১১২৫নং প্রমুখ)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, মহানবী ﷺ যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন দেখলেন, ইয়াহুদীরা আশূরার দিনে রোযা পালন করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি এমন দিন যে, তোমরা এ দিনে রোযা রাখছ?" ইয়াহুদীরা বলল, 'এ এক উত্তম দিন। এ দিনে আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে তাদের শত্রু থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। তাই মূসা এরই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই দিনে রোযা পালন করেছিলেন। (আর সেই জন্যই আমরাও এ দিনে রোযা রেখে থাকি।)'

এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, "মূসার স্মৃতি পালন করার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে আমি অধিক হকদার।" সুতরাং তিনি ঐ দিনে রোযা রাখলেন এবং সকলকে রোযা রাখতে আদেশ দিলেন। *(বুঃ ২০০৪, মুঃ ১১৩০নং)*

বলাই বাহুল্য যে, উক্ত আদেশ ছিল মুস্তাহাব। যেমন মা আয়েশার উক্তিতে তা স্পষ্ট। তা ছাড়া মহানবী ﷺ বলেন, "আজকে আশূরার দিন; এর রোযা আল্লাহ তোমাদের উপর ফরয করেন নি। তবে আমি রোযা রেখেছি। সুতরাং যার ইচ্ছা সে রোযা রাখবে, যার ইচ্ছা সে রাখবে

না।" *(বুঃ ২০০৩, মুঃ ১১২৯নং)*

আবু কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লার রসূল ﷺ আশূরার দিন রোযা রাখা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "আমি আশা করি যে, (উক্ত রোযা) বিগত এক বছরের পাপরাশি মোচন করে দেবে।" *(আঃ ৫/২৯৭, মুঃ ১১৬২, আদাঃ ২৪২৫, বাঃ ৪/২৮৬)*

ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ রমযানের রোযার পর আশূরার দিন ছাড়া কোন দিনকে অন্য দিন অপেক্ষা মাহাত্ম্যপূর্ণ মনে করতেন না।' *(ত্বাবঃ আওসাত্ব, সতাঃ ১০০৬ নং)* অনুরূপ বর্ণিত আছে বুখারী ও মুসলিম শরীফে। *(বুঃ ২০০৬, মুঃ ১১৩২নং)*

অবশ্য যে ব্যক্তি আশূরার রোযা রাখবে তার জন্য তার একদিন আগে (৯ তারীখে)ও একটি রোযা রাখা সুন্নত। যেহেতু ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন আশূরার রোযা রাখলেন এবং সকলকে রাখার আদেশ দিলেন, তখন লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ দিনটিকে তো ইয়াহুদ ও নাসারারা তা'যীম করে থাকে।' তিনি বললেন, "তাহলে আমরা আগামী বছরে ৯ তারীখেও রোযা রাখব ইনশাআল্লাহ।" কিন্তু আগামী বছর আসার আগেই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল হয়ে গেল। *(মুঃ ১১৩৪, আদাঃ ২৪৪৫নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'তোমরা ৯ ও ১০ তারীখে রোযা রাখ।' *(বাঃ ৪/২৮৭, আরাঃ ৭৮৩৯নং)*

পক্ষান্তরে "তোমরা এর একদিন আগে বা একদিন পরে একটি রোযা রাখ" -এই হাদীস সহীহ নয়। *(ইখুঃ ২০৯৫নং, আলবানীর টীকা দ্রঃ)* তদনুরূপ সহীহ নয় "তোমরা এর একদিন আগে একটি এবং একদিন পরেও একটি রোযা রাখ" -এই হাদীস। *(যামাঃ ২/৭৬ টীকা দ্রঃ)*

বলা বাহুল্য, ৯ ও ১০ তারীখেই রোযা রাখা সুন্নত। পক্ষান্তরে কেবল ১০ তারীখে রোযা রাখা মকরূহ। *(ইবনে বায, ফইঃ ২/১৭০)* যেহেতু তাতে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য সাধন হয় এবং তা মহানবী ﷺ-এর আশার প্রতিকূল। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, 'মকরূহ নয়। তবে কেউ একদিন (কেবল আশূরার দিন) রোযা রাখলে পূর্ণ সওয়াবের অধিকারী হবে না।'

জ্ঞাতব্য যে, হুসাইন ﷺ-এর এই দিনে শহীদ হওয়ার সাথে এ রোযার কোন নিকট অথবা দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, তার পূর্বে মহানবী ﷺ; বরং তাঁর পূর্বে মূসা নবী ﷺ এই দিনে রোযা রেখে গেছেন। আর এই দিনে শিয়া সম্প্রদায় যে মাতম ও শোক পালন, মুখ ও বুক চিরে, গালে থাপর মেরে, চুল-জামা ছিঁড়ে, পিঠে চাবুক মেরে আত্মপ্রহার ইত্যাদি করে থাকে, তা জঘন্যতম বিদআত। সুন্নাহতে এ সবের কোন ভিত্তি নেই।

তদনুরূপ এই দিনে নিজ পরিবার-পরিজনের উপর খরচ বৃদ্ধি করা, বিশেষ কোন নামায পড়া, দান-খয়রাত করা, বিশেষ করে শরবত-পানি দান করা, কলফ ব্যবহার করা, তেল মাখা, সুরমা ব্যবহার করা প্রভৃতি বিদআত। এ সকল বিদআত হযরত হুসাইন ﷺ-এর খুনীরাই আবিষ্কার করে গেছে। *(তামিঃ ৪১২পৃঃ দ্রঃ)*

৫। যুলহজ্জের প্রথম নয় দিনের রোযা

যুলহজ্জ মাসের প্রথম নয় দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। যেহেতু আল্লাহ আয্যা অজাল্ল

যুলহজ্জের প্রথম দশ দিনকে অন্যান্য দিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন। “এই দশদিনের মধ্যে কৃত নেক আমলের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আর কোন আমল নেই।” (সাহাবাগণ) বললেন, ‘আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে এমন কোন ব্যক্তি (এর আমল) যে নিজের জান-মাল সহ বের হয় এবং তারপর কিছুও সঙ্গে নিয়ে আর ফিরে আসে না। *(আঃ ৩/২৯৮, বুঃ ৯৬৯, আদাঃ ২৪৩৮, তিঃ ৭৫৭, ইমাঃ ১৭২৭নং)*

আর রোযা হল একটি নেক আমল। সুতরাং তা পালন করাও এ দিনগুলিতে মুস্তাহাব। *(মুমঃ ৬/৪৭১)*

প্রিয় নবী ﷺ ও এই নয় দিনে রোযা পালন করতেন। তাঁর পত্নী (হযরত হাফসাহ রাঃ) বলেন, “নবী ﷺ যুল হজ্জের নয় দিন, আশূরার দিন এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিন; মাসের প্রথম সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।” *(আদাঃ ২৪৩৭, সআদাঃ ২১২৯নং, নাঃ)*

বাইহাকী ‘ফাযায়েলুল আওকাত’ এ বলেন, এই হাদীসটি হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ঐ হাদীস অপেক্ষা উত্তম যাতে তিনি বলেন, ‘রসূল ﷺ কে (যুলহজ্জের) দশ দিনে কখনো রোযা রাখতে দেখিনি।’ *(মুঃ ১১৭৬, আদাঃ ২৪৩৯, তিঃ ৭৫৬, ইমাঃ ১৭২৯নং)* কারণ, এ হাদীসটি ঘটনসূচক এবং তা হযরত আয়েশার ঐ অঘটনসূচক হাদীস হতে উত্তম। আর মুহাদ্দেসীনদের একটি নীতি এই যে, যখন ঘটনসূচক ও অঘটনসূচক দু’টি হাদীস পরস্পর-বিরোধী হয় তখন সমন্বয় সাধনের অন্যান্য উপায় না থাকলে ঘটনসূচক হাদীসটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কারণ কেউ যদি কিছু ঘটতে না দেখে তবে তার অর্থ এই নয় যে, তা ঘটেই নি। তাই যে ঘটতে দেখেছে তার কথাটিকে ঘটার প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা হয়।

মোট কথা, যুলহজ্জ মাসের এই নয় দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব। ইমাম নওবী বলেন, ‘ঐ দিনগুলিতে রোযা রাখা পাকা মুস্তাহাব।’ *(শরহুন নওবী ৮/৩২০)*

৬। শা’বান মাসের অধিকাংশ দিনের রোযা

আল্লাহর রসূল ﷺ শা’বান মাসের অধিকাংশ দিনগুলিতে রোযা রাখতেন। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে রমযান ছাড়া অন্য কোন মাস সম্পূর্ণ রোযা রাখতে দেখি নি। আর শা’বান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসের অধিকাংশ দিনগুলিতে তাঁকে রোযা রাখতে দেখি নি।’ *(আঃ, বুঃ ১৯৬৯, মুঃ ১১৫৬নং, তিঃ, ইমাঃ)*

হযরত উসামাহ বিন যায়দ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে শা’বান মাসে যত রোযা রাখতে দেখি তত অন্য কোন মাসে তো রাখতে দেখি না, (এর রহস্য কি)?’ উত্তরে তিনি বললেন, “এটা তো সেই মাস, যে মাস সম্বন্ধে মানুষ উদাসীন, যা হল রজব ও রমযানের মাঝে। আর এটা তো সেই মাস; যাতে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট আমলসমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার রোযা রাখা অবস্থায় আমার আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হোক। *(নাঃ, সতাঃ ১০০৮নং, তামিঃ ৪১২পৃঃ)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট রোযা রাখার জন্য পছন্দনীয় মাস

ছিল শা'বান। তিনি সে মাসের রোযাকে রমযানের সাথে মিলিত করতেন।' *(সআদাঃ ২১২৪নং)*

এখানে তাঁর শা'বানের অধিকাংশ দিনগুলিতে রোযা এবং এই মাসের রোযার সাথে রমযানের রোযাকে মিলিত করার হাদীসের সাথে রমযানের ২/১ দিন আগে রোযা রাখতে নিষেধকারী হাদীসের *(বুঃ ১৯১৪, মুঃ ১০৮২নং)* অথবা তার কৃষ্ণপক্ষের দিনগুলিতে রোযা রাখতে নিষেধকারী হাদীসের *(সআদাঃ ২০৪৯, সতিঃ ৫৯০নং)* কোন সংঘর্ষ বা পরস্পর-বিরোধিতা নেই। কেননা, উভয় শ্রেণীর হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব। আর তা এইভাবে যে, ঐ দিনগুলিতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ; যদি অভ্যাসগতভাবে কোন রোযা না পড়ে তাহলে। পক্ষান্তরে অভ্যাসগতভাবে ঐ দিনগুলিতে রোযা পড়লে রাখা বৈধ। আর সেটাই ছিল মহানবী ﷺ-এর আমল। *(আসাইঃ ১৭৪পৃঃ)* অর্থাৎ, তিনি অভ্যাসগতভাবে ঐ দিনগুলিতে রোযা রাখতেন। এখতিয়ার করে নয়।

অন্য দিকে এই মাসের ১৫ তারীখের রোযা রাখা এবং তাতে পৃথক কোন বৈশিষ্ট্য বা মাহাত্ম্য আছে মনে করা বিদআত; যেমন এ কথা পূর্বেও আলোচিত হয়েছে। কেননা, এ ব্যাপারে বর্ণিত কোন হাদীস সহীহ নয়।

৭। সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযা

প্রত্যেক সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সুন্নত ও মুস্তাহাব। যেহেতু তা ছিল মহানবী ﷺ-এর আমল। আর দিন দুটিতে বিশ্বাধিপতি আল্লাহর নিকট বান্দার আমল পেশ করা হয়।

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ সোম ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখাকে প্রাধান্য দিতেন।' *(আঃ ৬/৮০, ৮৯, ১০৬, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ ১৭৩৯নং, ইগঃ ৪/১০৫-১০৬)*

আবু হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সোম ও বৃহস্পতিবার (মানুষের) সকল আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। তাই আমি এটা পছন্দ করি যে, আমার রোযা রাখা অবস্থায় আমার আমল (তাঁর নিকট) পেশ করা হোক।" *(তিঃ, সতাঃ ১০২৭নং)*

উক্ত আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারে (মানুষের) সকল আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হয়। (এবং বেহেশ্তের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হয়।) আর (ঐ উভয় দিনে) আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে মার্জনা করে দেন যে কোন কিছুকে তাঁর অংশী স্থাপন করে না। তবে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না যার নিজ ভায়ের সহিত বিদ্বেষ থাকে; এই দুই ব্যক্তির জন্য (ফিরিশ্তার উদ্দেশ্যে) তিনি বলেন, উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে অবকাশ দাও। উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে অবকাশ দাও।" *(আঃ ২/৩২৯, মুঃ ২৫৬৫ নং, প্রমুখ)*

আবূ কাতাদাহ رضي الله عنه বলেন, 'সোমবার রোযা রাখার ব্যাপারে নবী ﷺ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "এটা হল সেই দিন, যেদিনে আমার জন্ম হয়েছে এবং আমার উপর সর্বপ্রথম কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "ঐ দিনে আমি (নবীরূপে) প্রেরিত

হয়েছি।" *(আঃ ৫/২৯৭, ২৯৯, মুঃ ১১৬২, আদাঃ ২৪২৫নং)*

৮। প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা

প্রত্যেক (চান্দ্র) মাসে ৩টি করে রোযা রাখা মুস্তাহাব। আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﵁ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য।" *(বুঃ ১৯৭৯নং, মুঃ ১১৫৯ নং)*

আবূ যার্র ﵁ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে ৩টি করে রোযা রাখবে, তার সারা বছর রোযা রাখা হবে। আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ এর সত্যায়ন অবতীর্ণ করে বলেন, কেউ কোন ভাল কাজ করলে, সে তার ১০ গুণ প্রতিদান পাবে। *(কুঃ ৬/১৬০)* এক দিন ১০ দিনের সমান।" *(তিঃ, ইমাঃ ১৭০৮-নং, ইগঃ ৪/১০২)*

ইবনে আব্বাস ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "ধৈর্যের (রমযান) মাসে রোযা আর প্রত্যেক মাসের তিনটি রোযা অন্তরের বিদ্বেষ ও খট্‌কা দূর করে দেয়।" *(বাযঃ, সতাঃ ১০১৮-নং)*

পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ তাঁর একান্ত ভক্ত আবূ হুরাইরা ﵁-কে এই রোযা রাখতে অসিয়ত (বিশেষ উপদেশ) করেছেন। *(দ্রঃ আঃ ২/৪৫৯, বুঃ ১১৭৮, মুঃ ৭২১, দাঃ, বাঃ ৪/২৯৩ প্রমুখ)*

অবশ্য এই তিন রোযা প্রত্যেক চান্দ্র মাসের শুক্লপক্ষের শেষ দিনগুলিতে; অর্থাৎ, ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখে হওয়া মুস্তাহাব। যেহেতু আবূ যার্র ﵁ বলেন, আল্লাহর রসূল তাঁকে বলেছেন, "হে আবূ যার্র! মাসে ৩টি রোযা রাখলে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখে রাখ।" *(আঃ ৫/১৬২, ১৭৭, তিঃ, নাঃ, বাঃ ৪/২৯৪, ইগঃ ৯৪৭নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ রাখতেন প্রত্যেক মাসের প্রথম সোমবার, অতঃপর তার পরের বৃহস্পতিবার, অতঃপর তার পরবর্তী বৃহস্পতিবার। *(আঃ, আদাঃ, নাঃ, তামিঃ ৪১৫পৃঃ দ্রঃ)* কোন কোন বর্ণনা মতে মাসের শুক্লপক্ষের শেষ তিনদিন রোযা রাখতেন। *(সআদাঃ ২১৪০নং)* আর কোন কোন বর্ণনা মতে তিনি কোন নির্দিষ্ট দিনের খেয়াল না করেই যে কোন দিনে ৩টি রোযা রাখতেন। *(মুঃ ১১৬০, সআদাঃ ২১৪২নং)*

৯। দাঊদী রোযা

যার সামর্থ্য আছে তার জন্য একদিন রোযা থাকা ও তার পরের দিন রোযা না থাকা; ভিন্ন কথায় একদিন পরপর রোযা রাখা মুস্তাহাব। আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় রোযা হল দাঊদ ﵇-এর রোযা। আর আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় নামায হল দাঊদ ﵇-এর নামায। তিনি অর্ধ রাত্রি ঘুমাতেন। অতঃপর তৃতীয় প্রহরে নামায পড়ে পুনরায় ষষ্ঠভাগে ঘুমাতেন, আর তিনি একদিন পানাহার করতেন ও পরদিন রোযা

রাখতেন।” *(বুঃ ১১৩১, মুঃ ১১৫৯নং, আদাঃ, নাঃ, ইমাঃ)*

পরন্তু মহানবী ﷺ ইবনে আম্‌রকে বলেছেন, “তুমি একদিন রোযা থাক এবং একদিন পানাহার কর। এটাই হল দাউদ ﷺ-এর রোযা; যা সর্বশ্রেষ্ঠ রোযা।” ইবনে আম্‌র বললেন, ‘কিন্তু আমি তার থেকেও উত্তম (প্রত্যেক দিন রোযা রাখতে) পারি।’ তা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, “(আমি যা বললাম) তার চাইতে উত্তম কিছুই নেই।” *(বুঃ ১৯৭৬নং)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন, “দাউদ ﷺ-এর রোযার উপর কোন রোযা নেই। অর্ধ বছর রোযা; একদিন রোযা রাখ এবং তার পরের দিন পানাহার কর।” *(ঐ ১৯৮০নং)*

বলা বাহুল্য, এ রোযা সামর্থ্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। অতএব শর্ত হল, যেন এ রোযা রাখতে গিয়ে স্বাস্থ্য এমন দুর্বল না হয়ে যায়, যাতে নফল রোযা থেকে উত্তম বা গুরুত্বপূর্ণ আমল পালনে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, আল্লাহর অন্যান্য হক এবং বান্দার যাবতীয় অধিকার আদায়ে যেন কোন প্রকার ত্রুটি প্রকাশ না পায়। নচেৎ, তা বর্জন করাই উত্তম। *(দ্রঃ মুমঃ ৬/৪৭৪, আসাইঃ ১৭৬পৃঃ)*

১০। যৌন-পীড়িত যুবকদের রোযা

যৌন-পীড়িত যে যুবক ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা করে অথচ ভরণ-পোষণ বহন করার সামর্থ্য না থাকার ফলে বিবাহ করতে পারে না, সে যুবকের জন্য রোযা রাখা বিধেয়।

এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ যুবকদেরকে পথনির্দেশ করে বলেন, “হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (বিবাহের অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রতিক্রিয়ার) সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ চক্ষুকে দস্তুরমত সংযত করে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যে ব্যক্তি ঐ সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোযা রাখে। কারণ, তা যৌনেন্দ্রিয় দমনকারী।” *(আঃ ১/৫৭, বুঃ ১৯০৫, মুঃ ১৪০০, আদাঃ ২০৪৬, তিঃ ১০৮১, নাঃ, ইমাঃ প্রমুখ, মিঃ ৩০৮০নং)*

তিনি খাসী হওয়ার কথা অবৈধ ঘোষণা করে বলেন, “আমার উম্মতের খাসী করা হল, রোযা রাখা।” *(আঃ ২/১৭৩ প্রমুখ, সিসঃ ১৮৩০নং)*

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই হল সেই যৌন-পীড়িত ও যৌবনের অগ্নিদাহে দগ্ধ এবং বিবাহে অসমর্থ যুবকদের জন্য নবী করীম ﷺ-এর অব্যর্থ চিকিৎসা। আর তা হল রোযা। সুতরাং তাদের জন্য গুপ্ত অভ্যাস হস্তমৈথুন ব্যবহার করা বৈধ নয়। নচেৎ, তারা তাদের দলভুক্ত হয়ে পড়বে, যাদের জন্য বলা হয়েছিল, “তোমরা কি যা উৎকৃষ্ট তার বিনিময়ে নিকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করতে চাও?” *(কুঃ ২/৬১)* আর যেহেতু হস্তমৈথুন অভ্যাসটাই সেই মুমিনদের গুণ নয়, যাদের কথা মহান আল্লাহ নিজ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَـٰفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ۝ ﴾

অর্থাৎ, যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না। আর যারা এদের ছাড়া অন্যকে

কামনা করে তারাই সীমালংঘনকারী।” *(কুঃ ২৩/৫-৭)*

মা আয়েশা (রাঃ) উক্ত আয়াতের তফসীরে বলেন, ‘যে ব্যক্তি নিজের বিবাহিত স্ত্রী অথবা ক্রীতদাসী ছাড়া (যৌনক্ষুধা নিবারণের জন্য) অন্য পথ অবলম্বন করবে সেই সীমালংঘনকারী।’ *(হাঃ ২/৩৯৩, সিসঃ ৪/৪৪৬)*

১১। সাধারণ নফল রোযা

সাধারণ নফল রোযা; যা কোন নির্দিষ্ট কারণ বা দিনের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। এমন রোযা নিষিদ্ধ দিন ছাড়া যে কোনও দিনে অনির্দিষ্টভাবে রাখা যাবে। মহানবী ﷺ বলেন, “শীতকালের রোযা ঠান্ডা গনীমত (যুদ্ধজয়ে লব্ধ সম্পদ)।”

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, “শীতকাল মুমিনের বসন্তকাল। তার রাত্রি লম্বা হওয়ার ফলে সে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং তার দিন ছোট হওয়ার ফলে সে রোযা রাখে।” *(আঃ প্রমুখ, সিসঃ ১৯২২নং)*

বলা বাহুল্য, এমন রোযা দ্বীনের সহজ-সরল নিয়ম-নীতির ভিত্তিতেই বিধিবদ্ধ।

নফল রোযা ভাঙ্গা বৈধ

যে ব্যক্তি নফল রোযা রাখে, তার জন্য তা ভাঙ্গা বা দিনের যে কোন অংশে তা ছেড়ে দেওয়া বৈধ। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, “নফল রোযাদার নিজের আমীর। ইচ্ছা হলে সে রোযা থাকতে পারে, আবার ইচ্ছা না হলে সে তা ভাঙ্গতেও পারে।” *(আঃ ৬/৩৪১, তিঃ, হাঃ ১/৪৩৯, বাঃ ৪/২৭৬ প্রমুখ, সহীহুল জামে’ ৩৮৫৪নং)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা নবী ﷺ তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের কাছে (খাবার) কিছু আছে কি?” বললেন, ‘জী না।’ মহানবী ﷺ তখন বললেন, “তাহলে আজকে আমি রোযা থাকলাম।” অতঃপর আর একদিন আমাদেরকে হাইস (খেজুর, পনীর ও ঘি একত্রিত করে প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ) উপহার দেওয়া হয়েছিল। আমি তার থেকে কিছু অংশ তাঁর জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। আর তিনি হাইস ভালোবাসতেন। আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আজ আমাদেরকে হাইস উপহার দেওয়া হয়েছে। আর আমি আপনার জন্য কিছুটা লুকিয়ে রেখেছি।’ তিনি বললেন, “আমার কাছে নিয়ে এস। আমি সকাল থেকে রোযা অবস্থায় ছিলাম।” এ কথা বলে তিনি তা খেলেন এবং বললেন, “নফল রোযাদারের উদাহরণ ঐ লোকের মত যে নিজ মাল থেকে (নফল) সাদকাহ বের করে। অতঃপর সে চাইলে তা দান করে, না চাইলে রেখে নেয়।” *(আঃ ৬/৪৯, ২০৭, মুঃ ১১৫৪, আদাঃ ২৪৫৫, নাঃ ২৩২১, ইমাঃ ১৭০১, ইখুঃ ২১৪১নং, দারাঃ, বাঃ ৪/২৭৫)*

রোযা ভেঙ্গে ফেললে তা কাযা করা ওয়াজেব নয়। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর জন্য খাবার তৈরী করলাম। তিনি তাঁর অন্যান্য সহচর সহ আমার বাড়িতে এলেন। অতঃপর যখন খাবার সামনে রাখা হল, তখন দলের মধ্যে একজন বলল, ‘আমার রোযা আছে।’ তা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “তোমাদের ভাই

তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়ে খরচ (বা কষ্ট) করেছে।” অতঃপর তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, “রোযা ভেঙ্গে দাও। আর চাইলে তার বিনিময়ে অন্য একদিন রোযা রাখ।” *(বাঃ ৪/২৭৯, ত্বাবঃ, ইগঃ ১৯৫২নং)*

অষ্টদশ অধ্যায়

যে দিনগুলিতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ

মহানবী ﷺ কোন হিকমত ও যুক্তির ফলে মুসলিমকে কতকগুলি দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। সেই দিনগুলি পরবর্তীতে আলোচিত হল।

১। দুই ঈদের দিন

সমস্ত উলামা এ ব্যাপারে একমত যে, উভয় ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। তাতে সে রোযা ফরয হোক; যেমন রমযানের কাযা বা নযরের রোযা, অথবা নফল হোক। যেহেতু মহানবী ﷺ ঐ দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। *(দ্রঃ বুঃ ১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯৩, ১৯৯৫, মুঃ ৮২৭, ১১৩৭, ১১৩৮, ১১৪০)*

২। তাশরীকের তিন দিন

ঈদুল আযহার পরবর্তী ৩ দিন রোযা রাখা বৈধ নয়। কেননা, মহানবী ﷺ বলেন, “তাশরীকের দিনগুলো পানাহার ও আল্লাহর যিক্র করার দিন।” *(আঃ ৪/১৫২, ৫/৭৫, ৭৬, ২২৪, মুঃ ১১৪১, ১১৪২, সুআঃ)*

যে ব্যক্তির প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা অভ্যাস আছে এবং তা যদি তাশরীকের কোন দিন পড়ে, তাহলে তার জন্যও ঐ রোযা রাখা বৈধ নয়। কারণ, সুন্নত কাজ করে হারাম-বিধান লংঘন করা যাবে না। *(আআসাঈঃ ২৩পৃঃ)*

অবশ্য যে (অমক্কাবাসী) হাজী মিনায় হজ্জের হাদ্ই (কুরবানী) দিতে সক্ষম হয় না, তার জন্য ঐ দিনগুলিতে বিনিময়ে রোযা রাখা বৈধ। মহান আল্লাহ বলেন,

[illegible]

অর্থাৎ, সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের আগে উমরাহ করে হালাল হয়ে লাভবান হতে (তামাত্তু হজ্জ করতে) চায় সে সহজলভ্য কুরবানী পেশ করবে। কিন্তু যদি কেউ কুরবানী না পায়, তাহলে তাকে হজ্জের সময় ৩দিন এবং ঘরে ফিরে ৭দিন এই পূর্ণ ১০দিন রোযা পালন করতে হবে। *(কুঃ ২/১৯৬)*

আয়েশা ও ইবনে উমার ؓ বলেন, ‘যে হাজী হাদ্ই দিতে অপারগ সে ছাড়া আর কারো জন্য তাশরীকের দিনগুলিতে রোযা রাখার অনুমতি নেই।’ *(বুঃ ১৯৯৭, ১৯৯৮নং)*

৩। কেবল জুমআর দিন রোযা

জুমআর দিন হল মুসলিমদের সাপ্তাহিক ঈদ। তা ছাড়া এ দিন হল যিক্র ও ইবাদতের দিন। তাই তাতে সাহায্য নিতে এ দিনে রোযা না রাখা মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে যদি কেউ জুমআর আগে একদিন অথবা পরে একদিন রোযা রাখে, অথবা তার অভ্যাসের কোন রোযা (যেমন শুক্লপক্ষের শেষ দিন) পড়ে, অথবা ঐ দিনে আরাফা বা আশূরার রোযা পড়ে, তাহলে তার জন্য সেদিনকার রোযা রাখা মকরূহ নয়।

এক জুমআর দিনে জুয়াইরিয়াহ বিন্তে হারেষ রোযা রেখেছিলেন। মহানবী ﷺ তাঁর নিকট এসে বললেন, "তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছ?" তিনি বললেন, 'জী না।' নবী ﷺ বললেন, "আগামী কাল রোযা রাখার ইচ্ছা আছে কি?" তিনি বললেন, 'জী না।' নবী ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি রোযা ভেঙ্গে ফেল।" *(আঃ, বুঃ ১৯৮৬, আদাঃ ২৪২২, নাঃ)*

আবূ হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন জুমআর দিন রোযা না রাখে। অবশ্য যদি তার একদিন আগে অথবা পরে একটি রোযা রাখে, তাহলে তা রাখতে পারে।" *(আঃ ২/৪৯৫, বুঃ ১৯৮৫, মুঃ ১১৪৪, আদাঃ ২৪২০, তিঃ, ইমাঃ ১৭১৩, ইআশাঃ ৯২৪০নং, ইখুঃ, বাঃ)*

অন্য এক বর্ণনায় বলেন, "অন্যান্য রাত ছেড়ে জুমআর রাতকে কিয়ামের জন্য খাস করো না এবং অন্যান্য দিন ছেড়ে জুমআর দিনকে রোযার জন্য খাস করো না। অবশ্য কেউ তার অভ্যাসগত রোযা রাখলে ভিন্ন কথা।" *(মুঃ ১১৪৪নং)*

কাইস বিন সাকান বলেন, 'আব্দুল্লাহর কিছু সঙ্গী-সাথী জুমআর দিনে রোযা রেখে আবূ যার্র رضي الله عنه-এর নিকট গেলে তিনি তাদেরকে বললেন, 'তোমাদের উপর কসম রইল! তোমরা অবশ্যই রোযা ভেঙ্গে ফেল। কারণ, জুমআহ হল ঈদের দিন।' *(ইআশাঃ ৯২৪৪নং)*

৪। কেবল শনিবার রোযা রাখা

ফরয বা নির্দিষ্ট নফল (যেমনঃ অভ্যাসগত শুক্লপক্ষের দিন, আরাফা বা আশূরার) রোযা ছাড়া কেবল শনিবার সাধারণ অনির্দিষ্ট নফল রোযা রাখা বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা ফরয ছাড়া শনিবার রোযা রেখো না। তোমাদের কেউ যদি ঐ দিন আঙ্গুরের লতা বা গাছের ডাল ছাড়া অন্য কোন খাবার নাও পায়, তাহলে সে যেন তাই চিবিয়ে খায়।" *(আঃ ৪/১৮৯, ৬/৩৬৮, সআদাঃ ২১১৬, তিঃ ৫৯৪, সইমাঃ ১৪০৩, ইখুঃ ২১৬৪, দাঃ ১৬৯৮নং)*

ত্বীবী বলেন, 'ফরয' বলতে রমযানের ফরয রোযা, নযর মানা রোযা, কাযা রোযা, কাফ্ফারার রোযা এবং একই অর্থে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ রোযা, যেমনঃ আরাফা, আশূরা এবং অভ্যাসগত (শুক্লপক্ষের দিনের) রোযা শামিল। *(তুআঃ ৩/৩৭২)* অর্থাৎ ঐসব রোযা অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে শনিবারে রাখতে নিষেধ নয়। যেহেতু তারীখের সাথে নির্দিষ্ট সুন্নত রোযাসমূহ যে কোন দিনেই রাখা যাবে।

যেমন তার আগে বা পরে একদিন রোযা রাখলে শনিবার রাখা বৈধ। যেহেতু মহানবী ﷺ জুয়াইরিয়াকে বললেন, "তুমি কি আগামী দিন (অর্থাৎ, শনিবার) রোযা রাখবে?" আর তার

মানেই হল, শুক্র ও শনিবার রোযা রাখলে মকরূহ হবে না। *(মুমঃ ৬/৪৬৬)*

এই দিনে রোযা রাখা নিষেধ হওয়ার পশ্চাতে যুক্তি ও হিকমত এই যে, ইয়াহুদীরা এই দিনের তা'যীম করত, এই দিন উপবাস করত এবং কাজ-কর্ম ছেড়ে ছুটি পালন করত। সুতরাং সেদিন রোযা রাখলে তাদের সাদৃশ্য প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে আগে বা পরে একদিন মিলিয়ে অথবা নযর বা কাযা রোযা রাখলে সেদিন রোযা রাখা মকরূহ হবে না। *(ফারারাঃ ৭৯পৃঃ)*

কিন্তু উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন যে, 'নবী ﷺ শনিবার রোযা রাখতেন।' *(আঃ ৬/৩২৩, ৩২৪, ইখুঃ ২১৬৭, ইহিঃ ৯৪১নং, হাঃ ১/৪৩৬, বাঃ ৪/৩১৩)* বাহ্যতঃ এই হাদীসটি পূর্ববর্ণিত আমলের বিরোধী। তবুও সামঞ্জস্য সাধনের জন্য বলা যায় যে, যখন অবৈধকারী ও বৈধকারী দুটি হাদীস পরস্পর-বিরোধী হয়, তখন অবৈধকারী হাদীসকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। তদনুরূপ মহানবী ﷺ-এর কথা ও আমল পরস্পর-বিরোধী হলে তাঁর কথাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অতএব এই নীতির ভিত্তিতে কেবল শনিবার রোযা রাখা মকরূহ হবে। *(তামিঃ ৪০৭পৃঃ)*

অথবা উম্মে সালামাহ (রাঃ) তাঁকে কোন অভ্যাসগত রোযা রাখতে দেখেছেন।

৫। কেবল রবিবার রোযা রাখা

কিছু উলামা কেবল রবিবার রোযা রাখাকে মকরূহ মনে করেছেন। কারণ, রবিবার হল খৃষ্টানদের ঈদ। যেহেতু রোযা রাখাতে এক ধরনের দিনের তা'যীম প্রকাশ পায়। আর কাফেররা তাদের প্রতীক হিসাবে যার তা'যীম করে তার তা'যীম কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। পক্ষান্তরে তার সাথে তার পরের দিন একটি রোযা রাখলে আর মকরূহ থাকে না। *(মুমঃ ৬/৪৬৭)* যেমন ঐ দিনে কোন নযর, কাযা, আরাফা বা আশূরার রোযা রাখা নিষেধ নয়।

৬। সন্দেহের দিন রোযা

সন্দেহের দিন হল ৩০শে শা'বান; যখন ২৯ তারীখে আকাশ ধূম্র বা মেঘাচ্ছন্ন থাকার ফলে চাঁদ দেখা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে ২৯ তারীখে আকাশ পরিষ্কার থাকলে ৩০ তারীখ সন্দেহের দিন থাকে না।

বলা বাহুল্য, ১লা রমযান কি না তা সন্দেহ করে পূর্বসতর্কতামূলক কাজ ভেবে ঐ দিন রোযা রাখা হারাম। এ কথার দলীল হল আম্মার বিন ইয়াসের رضي الله عنه-এর উক্তি, 'যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন রোযা রাখল, সে আসলে আবুল কাসেম ﷺ-এর নাফরমানী করল।' *(বুঃ বিনা সনদে ৩৭৬পৃঃ, আদাঃ ২৩৩৪নং, তিঃ, নাঃ, দাঃ, ইহিঃ, দাঃ, হাঃ ১/৪২৪, বাঃ ৪/২০৮, ইগঃ ৯৬১নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা রমযানের আগে আগে এক অথবা দুই দিনের রোযা রেখো না। অবশ্য তার অভ্যাসগত কোন রোযা হলে সে রাখতে পারে।" *(বুঃ ১৯১৪, মুঃ ১০৮২নং)*

আর যেহেতু সন্দেহের দিন রোযা রাখা মহান আল্লাহর শরীয়ত-গন্ডীর এক প্রকার সীমালংঘন। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে। *(কুঃ ২/১৮৫)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর। কিন্তু আকাশে মেঘ থাকলে শা'বানের গুনতি ৩০ পূর্ণ করে নাও।" *(বুঃ ১৯০০, মুঃ ১০৮০নং)*

যে ব্যক্তি সন্দেহের সাথে ৩০শে শা'বান রোযা রাখে, অতঃপর বুঝতে পারে যে, সেদিন সত্য সত্যই ১লা রমযান ছিল, সে ব্যক্তি এতদ্‌সত্ত্বেও ঐ দিনকার রোযা কাযা করবে। কারণ, সে আসলে ভিত্তিহীন রোযা রেখেছে। আর যে ব্যক্তি ভিত্তিহীন রোযা রাখে, তার রোযা যথেষ্ট নয়। সে তো আসলে চাঁদ না দেখে, চাঁদের অস্তিত্বের প্রমাণ না নিয়ে রোযা রেখেছে; যদিও প্রকৃতপক্ষে চাঁদ মেঘের আড়ালে বিদ্যমান ছিল। *(ফিসুঃ ১/৩৯৬, তাইরাঃ ৩৯পৃঃ)*

অবশ্য ঐ সন্দেহের দিন ৩০শে শা'বান যদি কেউ তার অভ্যাসগত রোযা (যেমন সোম অথবা বৃহস্পতিবার বলে) রাখে, তাহলে তা দূষণীয় নয়; যেমন সে কথা হাদীসেও স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

৭। বছরের সমস্ত দিন রোযা রাখা

নিষিদ্ধ দিনগুলি ছাড়া বছরের সমস্ত দিনগুলি রোযা রাখা মকরূহ অথবা হারাম। কারণ, মহানবী ﷺ বলেন, "সে রোযা রাখল না, যে সমস্ত দিনগুলিতে রোযা রাখল।" *(বুঃ ১৯৭৭, মুঃ ১১৫৯নং প্রমুখ)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি সমস্ত দিনগুলিতে রোযা রাখে, তার রোযা হয় না এবং সে পানাহারও করে না।" *(আঃ ৪/২৪, নাঃ, ইমাঃ ১৭০৫, ইখুঃ ২১৫০নং, হাঃ ১/৪৩৫, সজাঃ ৬৩২৩নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি সমস্ত দিনগুলি রোযা রাখে, তার প্রতি জাহান্নামকে এত সংকীর্ণ করা হয়, পরিশেষে তা এতটুকু হয়ে যায়।" আর এ কথা বলার সাথে সাথে তিনি তাঁর হাতের মুঠোকে বন্ধ করলেন। *(আঃ ৪/৪১৪, বাঃ ৪/৩০০, ইখুঃ ২১৫৪, ২১৫৫নং)*

এখানে জাহান্নাম সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই যে, জাহান্নামে তার বাসস্থান সংকীর্ণ হবে। যেহেতু সে নিজের জন্য কাঠিন্য পছন্দ করে, কষ্ট সত্ত্বেও তাতে নিজের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করে, মহানবী ﷺ-এর আদর্শ থেকে বিমুখতা প্রকাশ করে এবং এই মনে করে যে, সে যা করছে তা তাঁর আদর্শ থেকে উত্তম! *(দ্রঃ ফবাঃ ৪/১৯৩, যামাঃ ২/৮৩)*

পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ বলেন, "শোন! আমি তোমাদের সবার চাইতে বেশী আল্লাহকে ভয় করে থাকি, তোমাদের সবার চাইতে আমার তাকওয়া বেশী। কিন্তু আমি রোযা রাখি, আবার তা ত্যাগও করি। রাতে নামায পড়ি, আবার ঘুমিয়েও থাকি। বিবাহ করে স্ত্রী-মিলনও করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নত-বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুঃ ৫০৬৩, মুঃ ১৪০১নং, প্রমুখ)*

৮। সওমে বিসাল

মাঝে ইফতারী না করে এবং সেহরীও না খেয়ে একটানা দুই অথবা ততোধিক দিন রোযা রাখাকে 'সওমে বিসাল' বলা হয়। এই শ্রেণীর রোযা রাখতে আল্লাহর রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। যেহেতু তাতে রয়েছে অতিরঞ্জন এবং আত্মপীড়ন।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা 'সওমে বিসাল' থেকে দূরে থাক।" এ কথা তিনি ৩ বার পুনরাবৃত্তি করলেন। সাহাবাগণ বললেন, 'কিন্তু হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো বিসাল করে থাকেন?' তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে তোমরা আমার মত নও। কারণ, আমি রাত্রি যাপন করি, আর আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা সেই আমল করতে উদ্বুদ্ধ হও, যা করতে তোমরা সক্ষম।" *(বুঃ ১৯৬৬, মুঃ ১১০৩নং, প্রমুখ)*

অবশ্য ইফতারী না করে সেহরী খাওয়া পর্যন্ত 'বিসাল' করা চলে; যদি তাতে রোযাদারের কোন কষ্ট না হয়। যেহেতু আবূ সাঈদ খুদরী ؓ কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা 'বিসাল' করো না। কিন্তু যদি তোমাদের মধ্যে কেউ তা করতেই চায়, তাহলে সে সেহরী পর্যন্ত করুক।" *(বুঃ ১৯৬৭নং)*

৯। স্বামীর বর্তমানে স্ত্রীর রোযা রাখা

স্বামী-স্ত্রীর জীবন বড় মধুর, বড় যৌনসুখময় রোমাঞ্চকর। স্ত্রীর তুলনায় স্বামীই এ সুখ বেশী উপভোগ করে থাকে। তাই মহানবী ﷺ মহিলাকে নিষেধ করলেন, যাতে স্বামী ঘরে থাকলে তার বিনা অনুমতিতে স্ত্রী রোযা না রাখে।

আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী ﷺ বলেন, "মহিলা যেন স্বামীর বর্তমানে তার বিনা অনুমতিতে রমযানের রোযা ছাড়া একটি দিনও রোযা না রাখে।" *(আঃ ২/২৪৫, ৩১৬, বুঃ ৫১৯৫, মুঃ ১০২৬, আদাঃ ২৪৫৮, তিঃ ৭৮২, ইমাঃ ১৭৬১, দাঃ ১৬৭১নং, ইহিঃ ৯৫৪নং, হাঃ ৪/১৭৩ প্রমুখ)*

উলামাগণ উক্ত নিষেধকে হারামের অর্থে ব্যবহার করেন। আর সে জন্যই বিনা অনুমতিতে স্ত্রী নফল রোযা রাখলে স্বামীর জন্য তা নষ্ট করে দেওয়া বৈধ মনে করেন। যেহেতু এটা স্বামীর প্রাপ্য হক এবং স্ত্রীর তরফ থেকে তার অধিকার হরণ। অবশ্য এ অধিকার কেবল নফল রোযায়, রমযানের ফরয রোযার ক্ষেত্রে স্বামীর সে অধিকার থাকবে না। আর ফরয রোযা রাখতে স্ত্রীও স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা করবে না।

পক্ষান্তরে স্বামী ঘরে না থাকলে তার বিনা অনুমতিতে স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারে। রোযা রাখার পর দিনের বেলায় স্বামী ঘরে ফিরলে, তার অধিকার আছে, সে স্ত্রীর রোযা নষ্ট করতে পারে।

অনুরূপভাবে স্বামী অসুস্থ অথবা সঙ্গমে অক্ষম হলেও স্ত্রী তার বিনা অনুমতিতে রোযা রাখতে পারে। *(ফিসুঃ ১/৩৯৭)*

১০। রজব মাসের রোযা

খাস রজব মাসে রোযা রাখা মকরূহ। কারণ, তা জাহেলিয়াতের এক প্রতীক। জাহেলী যুগের লোকেরাই এ মাসের তা'যীম করত। পক্ষান্তরে সুন্নাহতে এর তা'যীমের ব্যাপারে কিছু

বর্ণিত হয় নি। আর এ মাসের নামায ও রোযার ব্যাপারে যা কিছু বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তার সবটাই মিথ্যা। *(মুমঃ ৬/৪৭৬)*

১১। শবেবরাতের রোযা

১৫ই শা'বানকে শবেবরাত বলা ভুল। যেমন তার রোযাও বিদআত। কারণ, এ ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। অবশ্য অভ্যাসগতভাবে মাসের ৩টি রোযার ১টি ঐ দিনে হলে দোষাবহ নয়।

সমাপ্ত

আলহামদু লিল্লাহ। আরবীতে এর লিখা শেষ হল ১/৪/১৪২০হিঃ তারীখে।

অনুবাদ ও সরাসরি কম্পোজ শেষ হল ৯/১/১৪২৪হিঃ তারীখে।

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.